শিল্পভাবনা

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, অক্টোবর, ১৯৬০

প্রকাশক
সি. আর. সেনগুপ্ত
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্‌
৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬৯

মুদ্রাকর
শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিঃ
১, গদাধর বাবু লেন
কলিকাতা-১২

শিল্পভাবনা

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স
কলিকাতা

উৎসর্গ

যে গ্রন্থের অভিনব পরিকল্পনা, সুমিত বিন্যাস, সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ, অনুমান নিপুণতা, উদার ও কল্পনাসমৃদ্ধ প্রেক্ষিতবোধ, তথ্যনিষ্ঠা ও উপাদান সমৃদ্ধি, যুক্তি শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য, মাত্রাজ্ঞান, প্রাঞ্জল অথচ দৃঢ়বদ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী—সেই চিরায়ত কীর্তি "বাঙালীর ইতিহাস" (আদিপর্ব)

ও

যে গ্রন্থ লোকায়ত শিল্প-সংস্কৃতি আচার-রীতি, পাল-পার্বণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সজীব ও ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছে, যে গ্রন্থ বাঙলার সমাজজীবনের এক ভাবময় ও তথ্যনিষ্ঠ দর্পণ, এককথায় যে গ্রন্থ বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও মানচিত্রস্বরূপ—সেই অক্ষয় কীর্তি "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"

দুই মহান্ গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধানত স্মারকস্বরূপ শিল্পভাবনা উৎসর্গীকৃত ॥

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

শিল্পভাবনা শিরোনামের সাধারণ ও ব্যাপক দ্যোতনা যে প্রত্যাশার উদ্রেক করে তা অনুমান করে প্রারম্ভেই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য, পটভূমিকা ও পরিধির পরিচয় জ্ঞাপন করা সমীচীন হবে। কোনরূপ অনুমান বা কল্পনার অবকাশ না দিয়ে বর্তমান লেখক প্রথম সুযোগেই একথা স্পষ্ট করে দিতে চান যে, এই গ্রন্থে ব্যক্ত বা আলোচিত তত্ত্ব, তথ্য, অভিমত বা অনুমানাদি একান্তরূপে ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা, ভাবনা, পঠন ও অন্বীক্ষালব্ধ এবং স্বভাবতই ব্যক্তিচেতনার সীমায়িত প্রেক্ষিতে বিবেচ্য। অতএব সুধী পাঠক যেন পুস্তকটিতে শিল্পবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বা প্রামাণ্য ও সুষম আলোচনা এবং বিশ্লেষণের দাবি না করেন।

অবশ্য গ্রন্থবিধৃত বক্তব্যের পরিবেশনায় যে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য, শৃঙ্খলা বা কেন্দ্রীয় ভাব নেই, তা নয়। বরং এটিকে কোন এক নাতিবিদগ্ধ জিজ্ঞাসুর বিকাশোন্মুখ চিন্তা, শিল্পপরিক্রমার এক স্বতঃগঠিত ও শিথিল-বিন্যাস পরিকল্পনা বলে গ্রহণ করা চলে। বর্তমান লেখক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্বাদি সারস্বত অনুশীলনের কোন শাখাতেই সংযোজন বা সংশ্লেষণের উপযুক্ত মানসসম্পদের অধিকারী বলে নিজেকে মনে করেন না, তথাকথিত বুধমণ্ডলীর পঙ্‌ক্তি হতে তাঁর ভিন্নচারা ব্যবহিত অবস্থান সম্পর্কেও তিনি সবিনয় সচেতন। কিন্তু আপন সংস্কৃতি ও তার ধারাবাহিক বিবর্তন সম্বন্ধে অপার কৌতূহল ও অনুরাগে বোধকরি বৃত্তি ও যোগ্যতা নির্বিশেষে সকলেরই সহজাত অধিকার আছে। বাঙালী জাতটি ইদানীন্তন বা ভুঁইফোড় নয়; নিছক উদরপূর্তি ছাড়া জীবনকে সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে মণ্ডিত করার জন্য এবং অন্তর্নিহিত শিল্পচেতনাকে বহুধা বিকশিত করে তোলার জন্য যুগ যুগ ধরে সামাজিক স্তরে তার এক ব্যাপক ও নিগূঢ় প্রয়াস ও সাধনা চলে এসেছে। সেই বিস্তীর্ণ শিল্পচর্চা যা বাঙালীর প্রাণবত্তারই সমষ্টিগত প্রকাশ, তা যুগে যুগে কীভাবে এবং কেন কোন্ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার আঁকাবাঁকা স্রোতে কোথা থেকে কোন্ জলরাশি এসে তাকে পুষ্ট করেছে, তার নিজের বহুমুখী অবয়বের পরস্পরের মধ্যে কোন্ মিথস্ক্রিয়া তার

অগ্রগতিতে কীভাবে সহায়তা করেছে—এইসব প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত কথঞ্চিৎ স্বচ্ছ হলে বোধহয় বাঙলার শিল্পের অন্ততম রূপটির সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। এই লেখকের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আপন সাধ্যের দীনতা সত্ত্বেও তিনি এতাদৃশ উপলব্ধির অভীপ্সায় চঞ্চল হয়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ এই দুরূহ সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। স্বভাবতই প্রাংশুলভ্য ফলের প্রতি খর্বহস্ত প্রসারিত করার পরিণামে উপহাস বা ভৎ'সনা লাভ করলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

বর্তমান লেখকের অন্বীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল বাঙলার সংস্কৃতি বাঙালীর জীবনচর্যা, বঙ্গীয় শিল্প ও কারুকলা ও প্রসঙ্গক্রমে বাঙলার সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি অতিবৃহৎ ব্যাপক ও জটিল ব্যাপারের একটি মোটামুটি অর্থবহ সমন্বিত বোধের পক্ষে, লেখকের বিবেচনায়, অপরিহার্য কোন কোন প্রশ্ন, প্রসঙ্গ বা প্রক্রিয়ার রহস্যোদ্ধার। একথা হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন যে, বাঙলার সংস্কৃতি ও শিল্পপ্রসঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিচারে এইসব প্রসঙ্গের মর্মোদ্ধার উপাদানের অপ্রতুলতাহেতু বর্তমানে দুঃসাধ্য, হয়ত বা বহুলাংশে অসম্ভব। কিন্তু লেখকের বিশ্বাস অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ ও উত্তম এ বিষয়ে যে আলোকপাত করতে পারে তারও মূল্য কম নয়।

বঙ্গীয় সারস্বতচর্চার এমন এক যুগ ছিল যখন ইতিহাস পুনরুদ্ধার বা নির্মাণের কাজে একদিকে যেমন দেশী-বিদেশী শাস্ত্র ও রচনার পুনর্মূল্যায়ন করা হত, তেমনি অন্যদিকে 'পাথুরে প্রমাণ'-এর ওপরে খুব জোর দেওয়া হত। গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে দূর বা নিকট আত্মীয়তাযুক্ত বিষয় বা সহযোগী বিদ্যার প্রাসঙ্গিক আলোকপাতে আলোচ্য বিষয়কে বহুদিক থেকে ও সামগ্রিকভাবে দেখে তার মর্মোপলব্ধির আধুনিক প্রবণতার অভাব অবশ্য আগের যুগে ছিল এবং সেটাই ছিল তখন স্বাভাবিক।

বর্তমান লেখকের এমন দাবি করার স্পর্ধা নেই যে, তিনি বঙ্গীয় শিল্পকলা বা সংস্কৃতির বিষয়বিশেষের আলোচনায় একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নিটোল মূর্তির সন্ধান দিতে পেরেছেন বা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার অন্যতম লক্ষণ যে মুক্তমন ও উদার সমন্বয়প্রচেষ্টা সেই আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন এবং তার অনুসরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর দৃঢ় সংস্কার যে একটি জাতির শিল্প-সংস্কৃতি বা সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি কোন বিষয়ের ধারণাই অসম্পূর্ণ

না হয়ে পারে না যদি না তা প্রত্যক্ষ দর্শন ও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের আলোকে স্বচ্ছ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। অর্থাৎ প্রকৃত সাংস্কৃতিক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষক হতে গেলে পর্যটক হতেই হবে ; অবশ্য সেই পর্যটনের করণ হবে শুধু চরণযুগল বা যানবাহন নয়, পরন্তু মুক্ত, গ্রহিষ্ণু ও বিচারশীল ইন্দ্রিয় ও মন। যদি অন্য কিছু নাও সম্ভব হয়, অভিজ্ঞতার দিবালোকে অন্তত কিছু কিছু মূঢ় সংস্কার বা অস্পষ্ট অনুমানের তমসা দূর হবে। যেমন বর্তমান আলোচক পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে সরেজমিনে সফর করে একদা কৌতুকাবিষ্ট ও বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, তথাকথিত নগরবন্দী পণ্ডিতদের ঘোষণানুযায়ী কোন এক শিল্পিসম্প্রদায় আদৌ অবলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং গ্রামবাঙলায় উপেক্ষা, প্রতিকূলতা ও গোত্রান্তর সত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বপুরুষের পেশায় বহাল আছে।

এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তরফে লোকশিল্পীর সন্ধানে গ্রামবাঙলার বহু স্থানে সফর করার সময় থেকেই বর্তমান আলোচক পল্লীসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ অনুভব করে এসেছেন। যাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসা যায় তাকে আবার বুদ্ধি দিয়েও উপলব্ধির ইচ্ছা জাগে। কালক্রমে লোকশিল্প সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের জটলা হয়, সেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থে মেলে না। অতএব পঠনাতিরিক্ত সন্ধিৎসারূপে যুক্ত হয় সাক্ষাৎকার, ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, কাছ থেকে দেখা ও পর্যালোচনার অভ্যাস। বলাবাহুল্য, পর্যটন এর অপরিহার্য সাধন।

লোকশিল্পের নিরালা জগৎকে চিনতে গিয়ে লেখক আরো অনুভব করেছেন যে, এই দেশে লোকশিল্পের সঙ্গে একদিকে রাজসভাশ্রিত বা অভিজাত বিদগ্ধ শিল্পের ও অন্যদিকে দেবায়তন শিল্পের কোন মৌলিক বিরোধ বা বিচ্ছেদ নেই, সকলে একই অন্তঃসলিলা প্রাণপ্রবাহের ভিন্ন-স্তরীয় বহিঃপ্রকাশ ; অসবর্ণ মেলবন্ধন ও প্রীতিভোজের অজস্র নিদর্শন সেখানে বর্তমান। অতএব শিল্প-সংস্কৃতিকে জলনিরোধক দৃঢ়-কক্ষভেদে খণ্ড খণ্ড গোত্রসীমার মধ্যে আবদ্ধ করে না দেখে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে একটি সামগ্রিক ও সার্বভৌম ঐক্যের প্রেক্ষাপটে উপলব্ধির চেষ্টাই সঙ্গত। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সেবক জনগোষ্ঠীর মানসিকতা, রুচি, বিশ্বাস এককথায় জীবনচর্যার বিভিন্নতার দরুণ শিল্পের চারিত্র্য বহুলাংশে স্বাতন্ত্র্যলাভ করে, অতএব

ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠপোষণার পরিণামে শিল্পের গোত্রপার্থক্যও ঈষৎ কাঠিন্য লাভ করতে বাধ্য। কিন্তু এই বাহ্য কাঠিন্যের অন্তরালে যে এক নমনীয় আদান-প্রদান চলে, সেকথা বিস্মৃত হলে চলবে না। লোকশিল্পের নিজস্ব যে একটি জগৎ আছে তাকে বুঝতে গেলে লোকান্তরের প্রতিফলন অনুশীলনে যে আলোছায়া ও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় তার প্রসঙ্গ বাদ দিলে আলোচনা একপেশে হয়ে যায়।

শুধু আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় শিল্পকলার আভ্যন্তরীণ মেলবন্ধন নয়, এদেশের লোকশিল্পের যথার্থ উপলব্ধির জন্য বোধহয় বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের প্রাসঙ্গিক অবতারণার প্রয়োজন। যেমন, আমাদের লৌকিক অলঙ্কারকে বুঝতে শুধু ভারতীয় অলঙ্কারের বিভিন্ন দিকই নয়, অলঙ্কারের নিখিল বিশ্বগত সাধারণ ইতিহাসও জানা দরকার। সারা বিশ্বজুড়ে লৌকিক ভাবনার মধ্যে এক অদৃশ্য আত্মীয়তা অনুভবগম্য। এই আত্মীয়তা বা নৈকট্যপ্রদর্শন রসোপলব্ধির যে অন্যতম সহায়ক তা বলাই বাহুল্য।

শিল্প ও কারুকলা সম্পর্কিত আপাত বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা সময়ে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। সহৃদয় প্রকাশক যখন সেগুলি এক করে একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করতে বললেন তখন মনে হয়েছিল কাজটি বোধহয় সহজ। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে অর্থাৎ নিজের মুদ্রিত লেখার পাঠক হয়ে বুঝলাম ব্যাপারটি অত অনায়াস নয়। নিজের পুরনো লেখা নির্মমভাবে বাতিল করে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন সংযোজন করে শেষপর্যন্ত একটা ক্রমরক্ষার প্রয়াস পেতে হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থকারকে দীর্ঘদিন ধরে যিনি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দ্বারা উৎসাহিত করেছেন তিনি হলেন বন্ধুবর শঙ্কর সেনগুপ্ত। পরমাত্মীয় বন্ধু হিরণ্ময় চক্রবর্তী পদেপদে ত্রুটি নির্দেশ এবং যথাযথ উপদেশদানে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নি। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ও উপদেশ দানে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, অগ্রজপ্রতিম আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং অনুজ প্রভাতকুমার দাস, বিমলেন্দু চক্রবর্তী ও কনককান্তি বসু। এঁদের শুভেচ্ছা এই গ্রন্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

সমকালীন, অন্বিষ্ট, কৌশিকী, গ্রাম থেকে ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় গ্রন্থের মূল প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত হয়েছিল। এই সুযোগে পত্রিকা-গুলির কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

লোকশিল্পের জগৎ

লোকশিল্প ও কারুকলার উৎপত্তির সাধারণ ইতিহাসই তার চারিত্র্যের অন্যতম নির্দেশক। শ্রমবিভাগ ও বিনিময় প্রথা উদ্ভবের বহুপূর্বে, আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন বিকাশের নিতান্ত শৈশবে, মানুষ একদিকে জীবন-ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যদিকে তার আত্মিক বা নান্দনিক পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে অভিলষিত যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি বা বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণরূপে আপন শক্তি, কল্পনা, রুচি ও দক্ষতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল। প্রয়োজনের নিবৃত্তি ও সৌন্দর্যবিধান— এই দ্বিবিধ (এবং বহুক্ষেত্রে উভয়ের সম্মিলিত) উদ্দেশ্যের সাধনস্বরূপ সব গার্হস্থ্য রচনাই ফলত ছিল ব্যক্তিবিশে-ষের একক (ক্ষেত্রবিশেষে পারিবারিক) প্রচেষ্টার সন্তান। ব্যক্তি স্বভাবতই তার ব্যবহারের সামগ্রী ও পরিবেশকে যথাসাধ্য শ্রীমণ্ডিত ও নয়নাভিরাম করে তুলতে চাইত। কিন্তু এই ব্যাপারে সে যেমন অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশা করত না, তেমনি অপরের তুষ্টিসাধন অপেক্ষা আত্মতৃপ্তিলাভই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। আদিতম লোকশিল্প ও লোককারুকলার উৎপত্তি হয়েছিল এইভাবেই, ব্যক্তির উন্মেষোন্মুখ নান্দনিক ও ব্যবহারিক বোধের একক চর্চার প্রভাবে। অতএব সেই শিল্প ও কলা ছিল মূলত আত্ম-মুখোপেক্ষ, স্বনির্ভর ও স্বোদ্দিষ্ট।

লোকশিল্পের বিকাশ

কালক্রমে সমাজব্যবস্থার বিবর্তনে এই আত্মকেন্দ্রিক ও অন্যনিরপেক্ষ শিল্পচর্চা আর আবশ্যিক রইল না বটে, কিন্তু লোকশিল্পের মৌল চরিত্র ততদিনে রূপ পেয়ে গেছে। বিনিময়প্রথার প্রবর্তন সত্ত্বেও মানুষ তখনো শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হত প্রধানত বিনিময়ের জন্য নয় পরন্তু আত্মপ্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, আপন খেয়াল-খুশীতে, আত্মবিনোদনার্থে এবং আত্মপ্রেরণার বশে, অর্থাৎ আদিষ্ট না হয়েই। এককথায়, শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি হয়ে উঠেছিল সামগ্রিক জীবনচর্যার এক আত্মিক অঙ্গবিশেষ।

স্বাভিমুখী ও আত্মনিমগ্ন হওয়ার কল্যাণে শিল্পসৃষ্টির আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। প্রত্যেকটি সৃষ্টি হয়ে উঠল ব্যক্তির নিজস্ব স্পর্শচিহ্নিত বা প্রাতিস্বিক। শিল্পরুচির ক্ষেত্রে কোন রকম সার্বভৌম সামাজিক মনের উদ্ভব হওয়ার আগে শিল্পী তার আপন কল্পনা, রুচি, মেজাজ ও নৈপুণ্য অনুযায়ী রূপসৃষ্টি করত বলে প্রত্যেকটি শিল্পকর্ম হয়ে উঠত অনন্য। এই বৈশিষ্ট্য আজও লোকশিল্পের এক স্বতন্ত্র আবেদনের জনক। খাঁটি লোক-শিল্পে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির স্থান নেই, সেখানে প্রতিটি রচনাই সজীব, স্বতন্ত্র ও সাবলীল। ঐতিহ্যবাহী সনাতন নকশা ও মোটিফের প্রয়োগ সত্ত্বেও কোন নিদর্শনটি অপরের অবিকৃত প্রতিরূপ নয়। এমনকি একই নমুনার এক বা একাধিক নকল যখন করা হয় তখনো প্রত্যেকটি একই পিতামাতার বিভিন্ন বা যমজ সন্তানের মতো কোন না কোন বৈষম্যগুণে বিসদৃশ হয়ে ওঠে, যন্ত্রোৎপাদিত অভিন্ন শিল্পসামগ্রীর মতো পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হয় না। মূলগত ভাবাত্মক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বহিরঙ্গ রূপবৈচিত্র্য হল লোকশিল্পের অন্যতম মুখ্য লক্ষণ ও আকর্ষণ।

মুখ্যত আত্মতৃপ্তি ও ভোগের জন্য সৃষ্ট বলে এই শিল্পের নির্মাণে লোকশিল্পী সময় ও যত্ন বিনিয়োগ করতে কোন কার্পণ্য করে না। যত সময়ই লাগুক কিংবা যত পরিশ্রমই হক, যতক্ষণ না অভীপ্সিত রূপসৃষ্টি ও সৌন্দর্যবিধান সংসিদ্ধ হচ্ছে, শিল্পী ততক্ষণ ক্ষান্ত হয় না। ফলে অশেষ যত্ন, অসীম ধৈর্য ও পরম অনুরাগে যে শিল্পকর্মটি রচিত হয়, তার রূপনির্মাণে উৎকর্ষ, ত্রুটিমুক্তি ও সম্পূর্ণতাই মুখ্য বিবেচ্য হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, এই যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে উপকরণ ও সাজসরঞ্জামের বা কৌশলগত চাতুর্যের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। বরং বলা চলে, এটি ঐ শিল্পের এক প্রত্যকৃবৃত্ত বা মানসিক প্রক্রিয়ার নিবিড়তা সূচিত করে। বস্তুত, যত্নকৃত হলেও লোক-শিল্পের প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল ও অনাড়ম্বর হওয়ার দিকে।

লোকশিল্পের সামাজিক ভিত্তি

সমাজ বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মকালীন পরিস্থিতির সমূহ পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও লোকশিল্প যে বহুকাল ধরে তার আদি বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ এই যে ব্যষ্টির একক ও প্রাতিস্বিক নান্দনিক প্রয়াস ছিল যার প্রাথমিক উৎস কালক্রমে তা গোষ্ঠীগত বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা ও রীতির ভিত্তিভূমিতে দৃঢ় ও গভীর প্রতিষ্ঠা লাভ করে হয়ে

উঠল এমন এক সামাজিক ও সমবেত প্রয়াস যার মূলকথা হল ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে, ব্যষ্টিতে গোষ্ঠীতে ও শিল্পবিশেষের সঙ্গে শিল্পান্তরের নিবিড় সহধর্মিতা ও সহযোগিতা। লোকশিল্পের প্রেরণা প্রধানত আসে শিল্পীর আপন সামগ্রীসমেত পারিপার্শ্বিককে শ্রী ও ছন্দের সুষমায় মণ্ডিত করার সহজাত মানবিক অভীপ্সা থেকে। গার্হস্থ্য সৌন্দর্যবিধান অতএব লোকশিল্পের অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য ও পরিণাম। লোকশিল্পের এই ঘরোয়া স্বভাবেরই উল্টোপিঠ হল তার সামাজিক চরিত্র। কথাটা হয়ত সাধারণভাবে সর্বত্র না খাটতেও পারে, কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাঙলায়, লোকশিল্প যে ব্যক্তিনির্ভর হয়েও সর্বতোভাবে সমাজমুখী এবং ঐতিহ্যপ্রাণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বঙ্গীয় গ্রামীণ সমাজের কাঠামো এবং প্রথা ও রীতির বন্ধন ব্যক্তি ও পরিবারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে গভীরতম যাবতীয় ব্যাপারের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত যে, ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর কোন প্রয়াসকেই সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যাবে না যদি তার সামাজিক তাৎপর্য উপেক্ষা করা হয় অথবা তাকে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়। বাঙলার পল্লীসমাজের কোন এককই আপন প্রয়াসকে বিচ্ছিন্নভাবে চালিত না করে বরং সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অন্যান্য এককের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন একভাবে বিকাশলাভ করতে চেয়েছে যা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা তাদের কাম্য হয়েছে, প্রতিযোগিতা বা অসহিষ্ণু আত্মপ্রাধান্য স্থাপন নয়। তাই বাঙলায় যেকোন একটি লোকশিল্প অবলীলাক্রমে ও নির্দ্বিধায় অপরটির সাহায্য ও সেবা আত্মসাৎ করে বিকশিত হয়েছে ও তার সামাজিক লক্ষ্য পরিপূরণে এগিয়ে চলেছে। এইভাবে যুগ যুগ ধরে পট, কাঁথা, সরা, কুলো, উল্কি, আলপনা, মাদুর, তক্ষণ, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির শিল্প মিছিল করে যেন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে রূপসৃষ্টি ও সৌন্দর্যরচনার কাজে সমবেত প্রতিভা নিয়োগ করে এসেছে। একে অপরের মোটিফ, নকশা, কৌশল, ভাব এমনকি বিষয়বস্তু পর্যন্ত আত্মীকৃত করেছে। শিল্পমাধ্যমগুলির এই পারস্পরিক আদানপ্রদান ও পরিপূরকতার মূলে কাজ করেছে তাদের সমাজনির্ভরতা। সামাজিক —চার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, পালপার্বণ ও উপাসনা প্রভৃতি এদেশে াকশিল্পের স্ফুরণ ও প্রয়োগের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, তাদের ালম্বন করে সমাজমনস্ক পল্লীবাসী বিশেষত পল্লীরমণীকুল আপন আপন শিল্পকর্ম প্রণয়ন ও প্রদর্শনের উৎসাহে মেতে উঠেছে। আর এইসব

সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যেহেতু বহুবিধ শিল্পপ্রয়াসের সমবেত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত না হলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, অতএব শিল্পগুলি স্বতঃই পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে।

লোকশিল্পের বৃত্তিমূলকতা

বঙ্গায় লোকশিল্পের সামাজিক চারিত্র্যের আরেকটি দিক হল তার বৃত্তিমূলকতা। কাঁথা, আলপনা, পুতুল, ঘট-সরার লেখা ইত্যাদি কোন কোন শিল্পকে অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে একান্তভাবে গার্হস্থ্যধর্মী, অপেশাদার, অবসরমূলক ও সর্বব্যাপী বলা চলে। কিন্তু অধিকাংশ শিল্প ও কারুকলাই সামাজিক বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে, হয়তবা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একেকটি শিল্পীগোষ্ঠী একেক ধরণের শিল্পকর্মে নিয়োজিত, যদিচ তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীরই ভরণপোষণ অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণনের ভার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বর্তেছে সমগ্র সমাজেরই ওপর। বিভিন্ন গোষ্ঠী যে শিল্প রচনা করে তা সমাজের কোন সমষ্টিগত চাহিদা মেটাবার জন্য, হয়ত তা প্রত্যক্ষভাবে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে জড়িত, এমনকি তার পক্ষে অপরিহার্য। সেই গোষ্ঠীর প্রতিপালন ও বিকাশের বিষয়ে সমাজ স্বভাবতই উদাসীন থাকতে পারেনি। তাই সচেতন বিবেচনাতে হক অথবা কোন অবচেতন বা অস্পষ্ট কর্তব্য-বোধের তাড়নাতে হক, সমাজপতিগণ ও বিত্ত বা শক্তির অধিকারী সামাজিক অভিভাবকগণ ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র পূজাপার্বণ ও মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে শিল্পীর শিল্পকর্মের সামাজিক চাহিদা ও বিক্রয়ের প্রভূত সুযোগ করে দেওয়াটা নিজেদের দায় বলে মনে করেছেন। কালক্রমে সেইসব মেলা ও দ্রব্যবিশেষের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা গ্রামীণ ঐতিহ্যের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে, তার উৎপত্তি ইতিহাস আর প্রয়োজন হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে, অনেক অনুষ্ঠেয় শিল্পকলা বা পারফরমিং আর্ট সম্পর্কেও এই কথা খাটে।

বঙ্গীয় লোকশিল্পের বৃত্তিমূলকতা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। শিল্পের এই বৃত্তিগত বিভাজনকে আপাতদৃষ্টিতে শ্রমবিভাজনের এক সামাজিক প্রথাসিদ্ধ ও সাংগঠনিক কাঠিন্যপ্রাপ্ত নিদর্শন বলে মনে হতে পারে। বৃত্তিগুলি যে পুরুষানুক্রমে প্রায়ান্ধ আনুগত্য সহকারে যুগ যুগ ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে এবং শিল্পিকুল যে পরম্পরাগত পেশা বা শিল্পের নির্দিষ্ট কক্ষপথ ছাড়ার ব্যাপারে এমন কি কৌশল, প্রকরণ বা রূপকল্প

পরিবর্তন সম্পর্কে এক অনমনীয় অনীহা পোষণ করে থাকে, তা উক্ত ধারণা দৃঢ়তর করে তোলে। বস্তুতপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে পুরুষানুক্রমিক শিল্পধারার এই অনড়, অচল, বদ্ধ অবস্থা তাদের অবক্ষয়, অবনতি ও ধ্বংসের অন্যতম কারণও বটে আবার লক্ষণও বটে। লোকশিল্পের বর্তমান গতিপ্রকৃতি ও অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পরে এই অভিমতের যাথার্থ্য বিচারের সুযোগ পাব। বর্তমান প্রসঙ্গে এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আমাদের পল্লীপ্রসূত লোকশিল্পের সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে ১. একটি সুস্পষ্ট কঠোর বৃত্তি-বিভাজন, ২. সেই বৃত্তির অন্তর্গত পরম্পরার শিল্পভাবনা ও কৌশলের এক নির্বিচার ও অব্যভিচারী অনুবর্তন এবং ৩. পরিণামস্বরূপ বৃত্তিগত স্বাতন্ত্র্য ; অপরদিকে তেমনি ঐ বাহ্য বিভাজনের বন্ধনকাঠিন্যের অন্তরালে শৈল্পিক বিবর্তনের স্তরে নিরন্তর বিভিন্ন শিল্পসমূহের মধ্যে চলেছে ভাবের এক অকুণ্ঠ আদানপ্রদান। সামাজিক কল্যাণ সাধনের এক সার্বভৌম আদর্শের উচ্চতর প্রভাবে লোকশিল্পসমূহ আপন আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বেড়া ডিঙিয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে সহযোগিতা ও পরিপূরক সখ্যের হস্ত প্রসারিত করেছে ও এক সৌষমাময় পরিমণ্ডল রচনায় অভিনিবিষ্ট রয়েছে। এদেশে বিভিন্ন শিল্পকলার বিবর্তন বা বিকাশ স্বতন্ত্র বা সমান্তরালভাবে ঘটলেও তা কদাপি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কিংবা পরস্পরের বিরোধী হয়ে দেখা দেয়নি, বরঞ্চ বহুলাংশে পারস্পরিক ভাববিনিময় ও মেলবন্ধনের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। এর মূলে দুটি শক্তি বা অবস্থা কাজ করেছে। এক, তাদের মূলগত সমাজনির্ভরতা, দুই, তাদের সকলের উপর সমাজের সামঞ্জস্যবিধায়ক এক সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রভাব। গ্রামীণ সমাজে প্রত্যেকটি শিল্প বা বৃত্তির এক সুনির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকা ছিল, তাই তার সংরক্ষণ ও বিবর্ধনের দায়ও বেশ কিছু পরিমাণে ন্যস্ত হয়েছিল সমাজের ওপর। বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে দেখতে গেলে সবরকম শিল্প বা বৃত্তি একেবারে তুল্যমূল্য না হলেও কোন শিল্প আদৌ অবান্তর বা তুচ্ছ বলে গণ্য হত না। স্বক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্প তথা শিল্পীরই এক সমাদৃত ও সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাদের পারস্পরিক মূল্যবিচারের ভিত্তিতে তাদের সামাজিক স্থান নির্দেশিত হত না। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যাতে প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান ও সখ্যপূর্ণ আদানপ্রদানের ধারা অব্যাহত থাকে খানিকটা সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই সামাজিক আচারানুষ্ঠান, রীতি, প্রথা ও

সংস্কারগুলি গড়ে উঠেছিল। স্ব-স্ব প্রধান হয়ে কিংবা উগ্র প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে একে অপরকে দমিত, ম্লান বা বিধ্বস্ত করে দিয়ে বিকশিত কিংবা উদ্বর্তিত হওয়ার দিকে তাই কোন শিল্পেরই প্রবণতা দেখা দেয়নি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অনতিবর্তনীয় বৃত্তিবিভাজনের কঠিন নিগড়ের অচল স্থাবরত্ব বা নীরন্ধ্র বিচ্ছিন্নতা হল বঙ্গীয় লোকশিল্পের এক নিতান্ত বাহ্য ও বহুলাংশে বিভ্রান্তিকর বিভাব, অপরপক্ষে শিল্পসমূহের পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ-সচেতনতা ও সামাজিক পরিণামাভিমুখিতা হল বঙ্গীয় লোকশিল্পের সত্যতর ও মৌল পরিচয়।

বৃত্তিকেন্দ্রিকতার অন্তরালে লোকশিল্পের অবাধ সামাজিক প্রসার ও সার্বজনিক অংশ গ্রহণ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, লোকশিল্প যেহেতু বৃত্তিকেন্দ্রিক অতএব তার শাখা বিশেষের প্রসার বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এহ বাহ্য। এদেশের লোকশিল্পের প্রাঙ্গণে এমন একটি সতত প্রসারিত-হস্ত উদার আমন্ত্রণের আহ্বান আছে যে প্রকৃত লোকশিল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলের অংশগ্রহণ সহজ এমন কি অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্যবিধ শিল্পের মতো একদিকে নির্মাতা বা পরিবেশক ও অপরদিকে ভোক্তা এই দুই ব্যবহিত ও দ্বৈতচিহ্নিত সত্তার মধ্যবর্তী কোন নিছক সৃষ্টিকর্ম প্রদর্শনের আলগা ব্যাপারে তা পরিণত হয়নি, বরং শিল্পকর্মে সকলের অবাধ অংশগ্রহণের কল্যাণে স্রষ্টা ও ভোক্তার মধ্যে সেখানে এক আত্মিক সেতুবন্ধনের সাবলীল আয়োজন রচিত হয়েছে। প্রথাবদ্ধ, অভিজাত, বিদগ্ধ বা ধ্রুপদী শিল্প ও কলার ক্ষেত্রে স্রষ্টা নিঃসন্দেহে শিল্পকৃতির নিরঙ্কুশ অধিপতি ও নিবেদক। যার উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত, সেই ভোক্তা হয়ত মস্ত বড় সমঝদার ও কদরদান হতে পারেন এবং তাঁর দিক থেকে উক্ত শিল্পকর্মের আবেদনে তিনি গভীর ও যথার্থ সাড়া দিয়ে শিল্পকে ধন্য ও শিল্পীকে যোগ্য মর্যাদা দানে সার্থক করে তুলতে পারেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই শিল্পকৃতি একান্তভাবে শিল্পীরই নিজস্ব জিনিস থেকে যায়, ভোক্তা থাকেন সৃষ্টিকর্মের অপরপ্রান্তে, ভোগ ও সমাদরের এলাকায়। অভিজাত শিল্পে অংশগ্রহণ রীতিমতো শিক্ষাদীক্ষা, অনুশীলন ও প্রতিভাসাপেক্ষ। দরবারী বা দেবায়তনিক শিল্পে যে আত্যন্তিক নৈপুণ্য, যথার্থ পরিশীলিত

কারুকৌশল ও উর্ধ্বচারী প্রতিভার মার্জিত স্পর্শ নিশ্চিতভাবে এক অভিজাত মহিমা আরোপ করে, তার সম্ভ্রান্ত উপস্থিতি ঐ শিল্পসৃষ্টিতে অংশগ্রহণ বিষয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে এক দ্বিধা ও পরাঙ্মুখতার সঞ্চার করে। বিকাশ নির্বিশেষে পল্লীজনগণের সকলের অন্তর্নিহিত শিল্পিসত্তা যেমনভাবে ঘরোয়া লোকশিল্পের অনাড়ম্বর চর্চায় অকুণ্ঠচিত্তে মেতে উঠতে পারে ঠিক তেমনি করে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিক্রিয়ার প্রয়োজনে অভিজাত শিল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে ভরসা পেতে পারে না। অপরপক্ষে লোকশিল্পের প্রাঙ্গণ এমনি এক পঙক্তিভোজের মিলনতীর্থ যে সেখানে ছোটবড় সকলেরই অনায়াস স্থান সঙ্কুলান হয়। অথবা বলা উচিত, প্রকৃতিই এমন দাক্ষিণ্য-মেদুর ও অতিথিবৎসল যে তার মধ্য দিয়ে সরল পল্লীবাসীর সুস্থ সহজাত শিল্পিসত্তার অকুণ্ঠ ও অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ ঘটে। লোকশিল্পের রীতিপ্রকৃতিতে এমন একটি ঢিলেঢালা প্রশ্রয়, সর্বজনীন আমন্ত্রণ ও সহিষ্ণুতার হাওয়া বহমান যে তার আনুকূল্যে নিতান্ত অদীক্ষিত, অমার্জিত পল্লীবাসীও আপন অনাড়ম্বর যথাসাধ্য প্রয়াস নিবেদন করতে সঙ্কোচ বোধ করে না; কেননা লোকশিল্পের যেটি প্রকৃত আশ্রয়, যেখানে তার হৃৎস্পন্দন বিশ্বস্তভাবে শোনা যায়, সেই সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে মঙ্গলঘট ভরতে হয়।

লোকশিল্প যে মূলত সমাজনির্ভর তারই একটি পরিণাম বা লক্ষণ এই শিল্পে অংশগ্রহণে সমাজের সকল শ্রেণীর ও শিল্পযোগ্যতার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ প্রদর্শনের প্রবণতা। সামাজিক, পারিবারিক বা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, রীতি ও প্রথার দাবি মেটাতে গিয়ে সমাজ ও পরিবারের কমবেশি সকলকেই, বিশেষত ললনাকুলকে কোনরূপ ভূমিকা প্রস্তুতি বা আড়ম্বর ব্যতিরেকে বিবিধ শিল্পকর্মে আগ বাড়িয়ে অংশ নিতে হয়। বলাবাহুল্য, এই শিল্প-রচনার ব্যাপারটি কদাচ সচেতনভাবে ঘটে। অনুষ্ঠেয় কর্মই সেখানে প্রধান, শিল্পকৃতির ভূমিকা হল অনুষ্ঠানের উপকরণ বা সহায়কের। শিল্পকর্মটিকে অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উৎকর্ষ বা মান যাচাই করা হয় না। এই জাতীয় শিল্পসৃষ্টিতে গুণগত মূল্যায়ন বা নৈপুণ্যপ্রদর্শন যেহেতু মোটের ওপর অবান্তর, বরঞ্চ অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে সামগ্রিক লক্ষ্যসাধনে নিযুক্তি মূল্য বিবেচ্য, অতএব লোকায়ত শিল্পরচনায় কেউই নিজেকে অনধিকারী বলে বিবেচনা করে না বা বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত লোকসমাজে ব্যক্তির সামাজিক মূল্য অর্থকৌলীন্য বা শিক্ষাদীক্ষায় নয়,

সকলেরই এক নিজস্ব ভূমিকা ও গৌরব সেখানে সমভাবে স্বীকৃত। কেননা সামাজিক অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী হলেও সকলেরই অংশগ্রহণ সমপরিমাণে প্রয়োজনীয়। বলা চলে যে, এ এক ধরণের গণতন্ত্র। যার যার নিজস্ব ক্ষেত্র ও সাধ্য অনুসারে অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ শিল্পকর্মে অংশ নেবার বাধা নেই বরং আমন্ত্রণ ও প্রত্যাশা আছে বলেই প্রত্যেকে তার নিজস্ব সৃষ্টিশক্তির অকুণ্ঠ প্রয়োগ করতে সেখানে উৎসাহী হয়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষের শিল্পসত্তা যেন সোনারকাঠির স্পর্শে জেগে উঠে অনর্গল মুক্তির পথ খোঁজে। ফলে আমরা লাভ করি অনবদ্য সব শিল্পনিদর্শন যা ভিন্নতর পরিবেশে হয়ত কোনদিনই মূর্তরূপ লাভ করত না ও লোকচক্ষুর অন্তরালে স্রষ্টার মগ্নচৈতন্যে নিমেষিত অবস্থাতেই রয়ে যেত। প্রাত্যহিক জীবনে যে কর্মব্যস্ত গৃহবধূটি ঘরকন্না, পরিজনপরিচর্যা ও সন্তান পালনের বহুবিধ কর্তব্যের দায় চুকিয়ে ফুরসৎ পায় না, তার মধ্যে যে এক সহজাত শিল্পপ্রতিভা লুকিয়ে ছিল তা কে জানতে পারত যদি না তার হাতের আলপনার শিল্পসুষমা ও কল্পনাসমৃদ্ধি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। ক্রীড়াচঞ্চল, সখীপরিবৃত কিশোরীর হাতে গড়া শিবপূজায় মৃন্ময় মূর্তিটি কিংবা খেলাঘরের পুতুলগুলিও এক উন্মেষশীল শিল্পিমনেরই অর্ধস্ফুট প্রকাশ। যে প্রবীণা তাঁর প্রিয়জনের নবজাতকের জন্য অথবা নানা আকারের পেটিকা নির্মাণকল্পে তাঁর অবসরের দীর্ঘ প্রহরগুলিতে পরম ধৈর্য, নৈপুণ্য ও মমতা ভরে প্রায় তুলির মত নমনীয় আঁচড়ে অবলীলাক্রমে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের উপর দিয়ে সূঁচের ফোঁড়ের সাহায্যে বিচিত্র নকশা ও মোটিফের সমাবেশে এক অনবদ্য রূপকল্পের উপস্থাপনা করেন, সেই চিত্রণধর্মী সীবন-শিল্পী সহস্র গার্হস্থ্য দায়দায়িত্বের চাপে ঢাকা থাকতেন যদি না গার্হস্থ্যধর্মের একটি বিশেষ প্রথা বা প্রয়োজন তাঁকে এইভাবে বস্ত্রনির্মিত আচ্ছাদন বা আধার নির্মাণে প্রণোদিত করত। ঘরের মেয়েরা এইভাবে যুগ যুগ ধরে এঁকে এসেছেন, মাটি, ননী, ক্ষীর প্রভৃতি দিয়ে পুতুল গড়েছেন, কাপড়ের উপর নকশা বুনেছেন, দেওয়াল ও মেঝের গায়ে আলপনা ও ছবি এঁকেছেন, বেত ও মাদুর দিয়ে সুন্দর সুন্দর আধার ও আসন শয্যা তৈরি করেছেন, নানান আকৃতির মিষ্টান্ন বানিয়েছেন, ফুল-লতাপাতা দিয়ে গৃহ ও উৎসবমণ্ডপ সাজিয়েছেন, এবং এই সবই তাঁরা করেছেন শিল্পসৃষ্টি করছি এমন কোন সচেতন সঙ্কল্প বা বোধ নিয়ে নয়। বস্তুতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এঁরা সংসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে, সামগ্রিক জীবনচর্যারই

অঙ্গরূপে, আলপনা দিচ্ছেন কি পটে তুলির টান দিচ্ছেন বা কাঁথা বুনছেন বা পুতুল বানাচ্ছেন। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব শিল্পপ্রচেষ্টার আগ্রহ অপেক্ষা সামগ্রিক পারিবারিক বা সামাজিক লক্ষ্যসাধনই প্রধান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন কোন পরিবারে সরা-ঘট ইত্যাদি আঁকায় ব্যাপারে বা আলপনা দেওয়ার সময় যে সদস্যটি যে কাজটি ভাল পারেন বা যাঁর হাতে যেমন অবসর আছে তিনি তদনুযায়ী অংশগ্রহণ করেন ও কালে সমগ্র শিল্পকর্মটি ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি না হয়ে এক পারিবারিক প্রয়াসে পরিণত হয়। পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই একই কথা অল্পবিস্তর খাটে। তবে সে ক্ষেত্রে হয়ত যে বিভিন্ন শিল্পকর্মের সমাবেশ ঘটে তার প্রত্যেকটিই যৌথ প্রয়াসসম্ভূত নয়, কিন্তু মোটের উপর পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিপূরকতাই সেই সম্মেলনের মূল সুর।

লোকশিল্প বনাম অন্যবিধ শিল্প

লোকায়ত শিল্পের এই আটপৌরে সহজিয়া ভাব, তার এই সর্বজনসাধ্য, সর্বজনাধিগম্য এবং সার্বজনিক অংশগ্রহণের পক্ষে অনুকূল ও উৎসাহদায়ক রূপটি আরো ভালোভাবে বুঝতে হলে অন্যবিধ শিল্পের সঙ্গে তার স্বরূপের পার্থক্যটি উপলব্ধি করতে হবে। লোকশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ কী অথবা অন্যবিধ শিল্পের সঙ্গে তার পার্থক্য ঠিক কোথায় এসব জটিল ও দুরূহ প্রশ্নের স্পষ্ট ও অভ্রান্ত সদুত্তর আশা না করাই সমীচীন। এই গ্রন্থে অলঙ্কার প্রসঙ্গে বিশদভাবে যা ব্যক্ত করা হয়েছে তারই সূত্র ধরে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, লোকশিল্পকে আলাদা করে চিনতে হবে তার বাহ্য বিভাব অর্থাৎ নির্মাণোপকরণ, নির্মাণ শৈলী, নির্মাতা ও ভোক্তার সামাজিক, আর্থনীতিক বা ভৌগোলিক পরিচয় ইত্যাদি বহিরঙ্গ বিষয় দিয়ে যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গ চারিত্র্য দিয়ে। অর্থাৎ লোকশিল্প যথার্থ লোকশিল্প হয়ে ওঠে স্রষ্টা ও ভোক্তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর কল্যাণে। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত মন্তব্য পরে আসছে। এখানে লক্ষণীয় যে, লোকশিল্প-পদবাচ্যতার বিচারপ্রসঙ্গে ভাবের দিকটাই মুখ্য। মূলত আত্মপ্রয়োজন-নিবৃত্তিকল্পে রচিত হলেও বিনিময় প্রথার উদ্ভবের পরেও লোকশিল্প তার সহজাত ধর্ম হতে চ্যুত হয়নি। আপন সম্ভোগার্থ শিল্পনির্মিতিতে যে মমত্ব, যত্ন, ধৈর্য ও আগ্রহ তার কাছে প্রত্যাশিত, বিনিময়যোগ্যশিল্পবস্তুর রচনায় যদি তার ন্যূনতা বা অনুপস্থিতি ঘটে তবে তা আর যথার্থ লোকশিল্প

বলে বিবেচিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে লোকশিল্পের এই ভাবগত লক্ষণ বা উপাদান সমূহের পরিপূর্ণ ও সবল উপস্থিতি হয়ত সবক্ষেত্রে সমানভাবে লভ্য নয়, সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তথাকথিত লোকশিল্পের অনেক নিদর্শনই অন্যবিধ শিল্পের চারিত্র্যের দ্বারা অল্পবিস্তর আক্রান্ত হওয়াটাই, অন্তত বর্তমান যুগে, প্রত্যাশিত। ঠিক কতটা পরিমাণে মিশ্রণ সত্বেও লোকশিল্প তার লৌকিক মূল চরিত্র অক্ষুন্ন রাখতে পারে, তার মাত্রানির্দেশ অবশ্যই সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে একথা মনে রাখা যেতে পারে যে, নির্মাতা ও ব্যবহারকারীর মানসিকতা দিয়েই প্রধানতঃ বিচার করতে হবে যে কোন শিল্পবিশেষ লোকশিল্প পদবাচ্য রইল না অন্যবিধ শিল্পের এলাকাতেই প্রবেশ করল। গ্রন্থ মধ্যে অলঙ্কার প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উদাহরণসংযোগে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে শুধু গহনা নয়, ছবি, মূর্তি, পুতুল, তক্ষণ ও ভাস্কর্য, সীবনশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি সকল শিল্পধারাতেই ঐ উক্তিগুলি খাটে। বিক্রয়ার্থ নির্মাণ করলেও শিল্পী যখন নিছক ক্রেতার নির্দেশ বা পছন্দ মত জিনিষ তৈরির চেষ্টা না করে, অথবা প্রথাসিদ্ধ রীতিতে আত্যন্তিক উৎকর্ষ ও মার্জিত রূপসৃষ্টির মান অর্জনের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে, বরং আপন ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি ও কল্পনা অনুসরণে সময় ও যত্নের হিসাব না করে, আপন সম্ভোগার্থে যেমনটি প্রত্যাশিত তদনুরূপ অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে কোন সৃষ্টি কর্মে আত্মনিয়োগ করে তখন, অন্তত নির্মাতার দিক থেকে দেখলে, সেটি লোকশিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে ব্যবহারকারীও যদি শিল্পবস্তুটিকে অনুরূপ মমতা নিয়ে ব্যবহার করেন এবং স্বসৃষ্ট হলে যে দৃষ্টিতে দেখতেন তেমনভাবেই শিল্পটিকে বিবেচনা করেন, তবে ব্যবহারের দিক থেকেও সেটি লোকশিল্পরূপে গ্রাহ্য হয়।

এই মানসিকতার তারতম্যই লোকশিল্পের সঙ্গে অন্যবিধ শিল্পের পার্থক্যের প্রধান কারণ। লোকশিল্প একান্তভাবে আপন সম্ভোগের জন্য অথবা সামাজিক লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য পরিকল্পিত, বিপণনের সামগ্রীতে পর্যবসিত হলেও তার এই মৌল বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে (অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, সমাজ বলতে পল্লীপরিবেশে ব্যাপক অর্থে পরিবারেরই এক ব্যাপ্তরূপ বোঝায় এবং সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানাদি সর্বশ্রেণীর মানুষের আনন্দোৎসুক স্বার্থ ও নিঃসঙ্কোচ অংশগ্রহণেই সার্থকতা লাভ করে)। অতএব প্রত্যেক মানুষই যে অন্তরে অন্তরে একজন শিল্পী এটাই লোকশিল্পের গোড়ার কথা বলে ধরে

নেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিক প্রয়োজন অবশ্য কালক্রমে সামাজিক তাৎপর্যের মধ্যে প্রসার লাভ করায় পরবর্তী পর্যায়ে লোকশিল্পের প্রকৃত ধাত্রী হয়ে দাঁড়াল সামাজিক রীতি, প্রথা, আচারানুষ্ঠান ও উৎসবাদি, কেননা ব্যক্তি সেখানে সমাজেরই একজন সদস্যরূপে তার সাধ্যমত শিল্পার্ঘ নিবেদনে প্রয়াসী। তাই আদিতে ব্যক্তিক প্রয়াস হওয়ার দরুণ লোক-শিল্পের প্রাতিস্বিকতা একটি মুখ্য লক্ষণ, তেমনি আবার বিকাশপর্বে সমাজ-ভিত্তিক হয়ে ওঠার কারণে তা খানিকটা নৈর্ব্যক্তিকও বটে বিষয়টি লোকশিল্পের সমাজমুখিনতার ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লোকশিল্পে ব্যক্তিক স্পর্শের আবশ্যিক লাঞ্ছন সত্ত্বেও শিল্পী সেখানে তার আপন প্রয়াসকে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমি হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না বা সেটিকে একক ব্যক্তিক কৃতিত্বরূপে গণ্য করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করার কোন প্রবণতা তার নেই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তির অহং যেন এক্ষেত্রে সমষ্টির অংশগ্রহণে নিমজ্জিত ও যথাযথ বিন্যস্ত, ব্যষ্টির ভূমিকা সেখানে বহুর মধ্যে একজন হিসাবে, স্বতন্ত্র এক রূপে নয়। অন্যকথায়, লোকশিল্পের নমুনায় স্বাভাবিক প্রভেদ সত্ত্বেও তাদের কোনটিই প্রধান বা অন্যের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয় না, কেননা লোকশিল্পে উৎকর্ষের প্রতিযোগিতা নেই, সবার মধ্যে একজন হতে পেরেই ব্যক্তি পরিতুষ্ট। তার শিল্পার্ঘ বা দানের সার্থকতা তাই কোন এক উন্নতরুচিসম্মত, মার্জিতমানসঙ্গত, সর্বজনগ্রাহ্য, উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তুর নমুনা রূপে নয়, বরং সামাজিক নির্বিশেষ নিবেদনরূপে। ব্যক্তি ত আত্মসচেতন হয়ে সৃষ্টিকর্মে মাতে নি, সে সৃষ্টি করেছে সামাজিক প্রেক্ষিতে আত্মনিবেদনের এক উপায় হিসাবে। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ বা নৈপুণ্য অনুপস্থিত না হলেও লোকশিল্পে শিল্পী বা ভোক্তার ঝোঁকটি সেই গুণগত মানের উন্নয়ন বা মূল্যায়নের উপর নয়। লোকশিল্পের কোন উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখলে তাই লোকসমাজের কেউ সমীহা বা বিস্ময় বোধ করে না, বরং একাত্মতা বোধ করে ও এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় যে এমনটি আমিও পারি। লোকশিল্পে কৌশলগত চাতুর্য ও নৈপুণ্য বড় কথা নয়, স্বসৃষ্টিতে আত্মনিবেদন ও অংশগ্রহণই মুখ্য। পটুত্ব অর্জন অতএব সচেতন লক্ষ্যের বিষয় নয়।

অপরপক্ষে অন্যবিধ শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল উৎকর্ষ সাধন, স্বাতন্ত্র্য ও গরিমা অর্জন এবং আত্যন্তিক যাথার্থ্য বা প্রিসিশন লাভ। যেখানে রাজন্যবর্গ বা অভিজাতকুলের সমাদর, বিদগ্ধ শিল্পরসিক সমাজের স্বীকৃতি,

রুচিশীল ভোক্তার মনোরঞ্জন ও কাঙ্খিত মানার্জন এবং মার্জিত রূপসাধনের বিকাশ প্রভৃতিই প্রধান কাম্য ও সাধনীয়। অতএব শিল্পী সেখানে স্বভাবতই অতীব আত্মসচেতন, উৎকর্ষপ্রয়াসী ও বৈশিষ্ট্যসন্ধানী। সমাজে তার বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে আত্মসচেতনতা ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য তার আবশ্যিক আকাঙ্ক্ষা তাকে গণমানস ও গণরুচির এক ঊর্ধ্বচারী নিয়ামক, প্রশংসাস্পদ ও শ্লাঘ্যপদপ্রাপ্তরূপে চিহ্নিত করে দেয়। অপরদিকে এদেশের অভিজাত দরবারী বা দেবায়তনিক শিল্পের নির্মাণ প্রসঙ্গে শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও সন্ধানী দৃষ্টিপাতের প্রত্যাশায় যেমন উৎকর্ষের ও বৈশিষ্ট্যার্জনের লড়াইও বড়াই প্রকট হয়ে ওঠে, লোকশিল্পে তেমনটি ঘটারই কোনো অবকাশ নেই। সেখানে শিল্পী আপনার মন বা পারিবারিক রুচি অথবা সামাজিক লক্ষ্যসিদ্ধির দিকে চোখ রেখে প্রায় আত্মাবলুপ্তির মনোভাব নিয়ে, বা নিদেনপক্ষে মূল্যায়নেচ্ছু দর্শক বা ক্রেতার কথা স্মরণে না রেখে, শিল্পকর্মটি রচনা করে। আর লোকসমাজও সামাজিক প্রথা ও রীতির সমন্বয়ে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার আয়োজন করে ব্যক্তির শিল্পপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ও অভ্যর্থিত করে। এই দুই জাতীয় শিল্পের পটভূমিই তাই আলাদা।

তবে কি একদিকে লোকশিল্প ও অন্যদিকে অভিজাত দরবারী বা মন্দির শিল্পের মধ্যে এক দুরপনেয় ব্যবধান আছে বলে মনে করতে হবে? এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো সেতুবন্ধনের চিহ্ন কোথায়ও চোখে পড়ে না? প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শিল্পের মূলগত তত্ত্বের বিচারে এত জাতিবিভাগ করা চলে না, এদের প্রাসঙ্গিকতা শুধু ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটি সুবিধাজনক ব্যবহারিক অভিধা বা আলোচনার উপায়বিশেষ। আদিতে শিল্পমাত্রেই তথাকথিত লোকশিল্পের লক্ষণাক্রান্ত ছিল। কালক্রমে সভ্যতার বিবর্তনের ফলে, বিশেষত নগরে, অভিজাত ও মার্জিত রুচি, চিন্তাধারা ও রীতিনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আটপৌরে ও সরল শিল্পকর্মকে অতিক্রম করে নৈপুণ্যাতিশয্য ও উৎকর্ষাভিনিবিষ্ট একটি শিল্পধারার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল যার উদ্দেশ্য নিছক ব্যক্তিগতভাবে স্রষ্টার নান্দনিক তৃপ্তিলাভ বা কোন সামাজিক লক্ষ্যসাধন নয়; বরং শিল্পকে নান্দনিক, বিনোদক বা শোভাবর্ধক মণ্ডনকর্মরূপে দেখতে ও দেখাতে যাঁরা উৎসুক এবং সেইহেতু শিল্পের নিকট যাঁদের বিশিষ্ট মানগত প্রত্যাশা আছে ও সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক দানের সামর্থ্য যাঁরা ধরেন, সেইসব অভিজাত নাগররুচিসম্পন্ন বিদগ্ধ বা সম্ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ অথবা উচ্চতর

ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিবজায় রেখে সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের উৎকর্ষ দাবী করেন যাঁরা এমন ধর্মসজ্বপতিগণের কাঙ্ক্ষিত রূপসাধন ও সৌন্দর্যসৃষ্টিই হল এই নবোদ্ভূত দরবারী বা দেবায়তনিক শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। লোকশিল্পের তুলনায় এই শিল্পও পরম্পরা ঐতিহ্যাদির উপর হয়ত কম নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এর ঝোঁক পরম্পরাগত কৌশল রূপকল্প ইত্যাদির ক্রমিক মানোন্নয়ন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদির উপর এবং তদুদ্দেশ্যে এ কতকগুলি গঠনগত পারিপাট্যের ধারা, সিদ্ধ প্রথা ইত্যাদির প্রবর্তনও করেছে। এমন কি প্রয়োজন ও সুবিধামত সে লোকশিল্পের ভাণ্ডার থেকেও নক্শা মোটিফ প্রভৃতি আত্মসাৎ করে আপন পুঁজির সঞ্চয় বাড়াতে কসুর করে নি! তবে তার বৈশিষ্ট্য এই যে, যাকেই সে অধিগ্রহণ করেছে তাকেই প্রয়োজনানুযায়ী পরিমার্জিত করে নিয়েছে। ক্রমে লৌকিক ধারার সঙ্গে তার বিপুল পার্থক্য গড়ে উঠলেও এই অধমর্ণতায় তার কোনদিনই অনীহা দেখা দেয় নি। বলা বাহুল্য যে, অভিজাত ধারাগুলির একে অপরের সঙ্গে সাধারণ ভাবে ও বিশেষ করে বিদেশাগত ধারাগুলির সঙ্গে অবাধে ভাববিনিময় ও আহরণ রূপান্তর প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে। অবশ্য লৌকিক ধারা একতরফা ভাবে শুধু দানই করে গেছে তা নয়, অভিজাত ধারার কাছ থেকে সেও ঋণ গ্রহণ করেছে, হয়ত বা দূর অতীতে যা ছিল তার নিজস্ব সম্পদ তাকেই আবার সে নতুনরূপে ফিরে পেয়েছে অভিজাত শিল্পের চাতুরীলব্ধ পরিমার্জিত অবস্থায়।

লোকশিল্পী-বনাম-অন্যবিধশিল্পী, শিল্পিসত্তার গোত্রান্তর ও মিথস্ক্রিয়া

বাস্তবিক পক্ষে লৌকিক শিল্প কদাপি আপনাকে অভিজাতশিল্পের সমকক্ষ জ্ঞান করে নি, বরং তাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই দেখেছে ও সাধ্যমত অনুকরণ করতেও চেয়েছে। আসলে উৎকর্ষের জন্য তৃষ্ণা মানবমনের এক চিরন্তন ধর্ম। তাই লোকশিল্পও তার শিল্পিধর্মের প্রভাবে অভিজাতকুল ও উৎকর্ষ ও পরিমার্জনার জন্য সময় বা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকুল হয়েছে বৈকি। আর যখনই কোন লোকশিল্পী এইভাবে অভিজাত শিল্পধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তখনই সে সাময়িকভাবেই হক অথবা চিরতরে হক লোকায়ত ধর্মচ্যুত হয়ে মিশ্রিত বা নির্ভেজাল অভিজাত শিল্প রচনার পথে পা বাড়িয়েছে। বস্তুত এই ধরণের প্রবণতা যার মধ্যে বেশি প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠেছে, সমাজই তাকে অভিজাত শিল্পের সেবায়

ঠেলে দিয়ে স্থানান্তরিত অর্থাৎ গোত্রান্তরিত হতে প্রশ্রয় এমন কি উৎসাহ যুগিয়েছে। অন্যকথায়, লোকশিল্প ও দরবারী বা দেবায়তনিক শিল্পী এমন কিছু ভিন্ন গোষ্ঠী হতে উৎপন্ন নয়, তারা সকলেই একই জাতের বংশপরম্পরা, সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ও সর্বোপরি নিজস্ব মেজাজ-মর্জি অনুসারে কেউ রয়ে গেছে লোকশিল্পী আর কেউ উন্নীত হয়েছে অভিজাত শিল্পীর পদবীতে। একই শিল্পী লোকায়ত শিল্প গড়তে গড়তে প্রয়োজন সুযোগ বা ইচ্ছানুগত অন্যবিধ শিল্পেও পটুত্ব অর্জন করতে পারে, অবশ্য তার প্রাথমিক শর্তস্বরূপ প্রয়োজনীয় প্রতিভা তার থাকা চাই।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদেশে একই শিল্পী অবস্থা ও সুযোগ প্রাপ্তিভেদে লোকশিল্পী অথবা দরবারী বা মন্দিরশিল্পী হতে পারে। লোকশিল্পের সঙ্গে অন্যবিধ শিল্পের কোন মূলগত বিরোধ নেই, পার্থক্যটি শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। লোকশিল্পী শিল্পীকে মুখ্যতর সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে দেখতে অভ্যস্ত, শিল্পসৃষ্টির ব্যষ্টিক বাহনরূপে নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শিল্পিসত্তা সুপ্ত ও স্ফুটনোন্মুখ অবস্থায় রয়েছে, তাকে সে প্রবুদ্ধ ও নিষ্কাসিত করে সামাজিক কর্মে নিয়োজিত করে। সেই সামাজিক লক্ষ্যসাধনে অংশগ্রহণই বড় কথা, রচনার মান বা উৎকর্ষের বিচার নয়। তাই শিল্পসামর্থ্য নির্বিশেষে সকলেই লোকশিল্পের জগতে বিচারণা করতে ভরসা পায়। যেহেতু উৎকর্ষ বা নৈপুণ্য নিয়ে মাথাব্যথা নেই, অতএব লোকশিল্পের চর্চায় দীক্ষা, শিক্ষা ও অনুশীলনাদির তেমন কড়াকড়ি নেই। আর লোকশিল্পীদের মধ্যে যদি কেউ নকল করা, সূক্ষ্ম কারু-কৌশলও মার্জিতমণ্ডনকার্যে প্রতিভা দক্ষতা বা তীব্র প্রবণতা দেখায়, তবে সমাজই তাকে অভিজাত শিল্পের দিকে এগিয়ে দেয় যাতে সে তার সহজাত গুণ বা বৃত্তির বিকাশের সুযোগ ও ক্ষেত্র পেতে পারে। আবার লোকশিল্পী যখন তার কাজের মধ্যে দরবারী বা দেবায়তনিক শিল্পের অনুকরণ করে ফেলে তখন সে সেই পরিমাণে বা প্রসঙ্গে গোত্রচ্যুত হয়।

লোকশিল্পের সামাজিক ভিত্তিনির্মাণে লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কারাদির ভূমিকা

লোকায়ত শিল্পের সমাজমুখিনতা ও সমাজকেন্দ্রিকতার কয়েকটি দিক আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। আমরা এও দেখেছি যে, লৌকিক শিল্পকে সনাক্ত করতে গেলে তার বহিরঙ্গ পরিচয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে অন্তরঙ্গ ভাবের

দিকটা পর্যালোচনা করাই সঙ্গত। লোকশিল্পের নির্মাণ ও ব্যবহারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এইসব ভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নরূপে, ঐ শিল্পের সামাজিক ভিত্তির প্রসঙ্গে যাদের ভূমিকা বিশেষভাবে অনুধাবনীয় তারা হল এমন কতকগুলি বিশ্বাস, সংস্কার ও তদুৎপন্ন রীতি, অভ্যাস, প্রথা ও অনুষ্ঠানাদি যাদের মূল বিস্মৃতপ্রায় অতীতে, যারা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে নানাভাবে আজো সমানে কাজ করে চলেছে এবং যারা যুগযুগান্ত ধরে লোকায়ত সমাজসমেত লোকশিল্পী ও লোকশিল্পের ব্যবহারকারী সামাজিক সদস্যমাত্রেরই চিন্তাধারা, রুচি ও মানসিকতাকে কখনো অস্পষ্টভাবে কখনো বা প্রত্যক্ষ-প্রকাশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে।

এইসব সংস্কার ও বিশ্বাসাদি, যা লোকগাথা, ব্রত, উপাখ্যান, উপাসনা, আচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে টিঁকে আছে, এরা মূলত মানুষের ঐহিক কল্যাণ-অকল্যাণ, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উদ্বর্তন, বিবর্ধন ও সংরক্ষণ এবং পারত্রিক উধ্বর্গতি ও সবোপরি পিতৃপুরুষের পূজা, সন্তুষ্টিবিধান ও আশিসলাভের প্রশ্নাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে অন্ধকারময় ধূসর অতীতে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জগতকে ও আপন জীবনকে নানা দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্তির লীলাভূমি বলে মনে করত এবং ভয় ও অনিশ্চয় ছিল তার নিত্য সহচর, তখন এইসব শক্তির সেবা, প্রসাদলাভ, নিরস্তাকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সে নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের অধীন হতে লাগল ও তদনুযায়ী আচারানুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ মেনে চলতে অভ্যস্ত হল। কালক্রমে এরা ধর্ম ও সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। মানুষের জীবনেও ক্রমে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগল। অদৃশ্য দৈবশক্তি, মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে শুরু করে শত্রুগোষ্ঠীর বা বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রতিকূলতা এমনকি কৃষিকার্য, পশুপালন বা মৃগয়াকার্যে মরশুমী ব্যর্থতা প্রভৃতিও তাকে যথোপযুক্ত বিশ্বাস, সংস্কারাদি অর্জনে ও ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করেছে। এইসব আচার, অনুষ্ঠান, রীতি ও প্রথার অনেকটাই তাই জাদুধর্মী। এদের অঙ্গস্বরূপ যে শিল্পকর্ম অনুষ্ঠেয়, যথা আলপনা ও অন্যান্য চিত্রণকর্ম, প্রতিমা, পুত্তলিকা ও অন্যবিধ বস্তুনির্মাণ, নৃত্যগীতবাদনাদি ও মণ্ডনকর্ম প্রভৃতি, তারা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে জাদুতন্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের ব্রতাদি অনুষ্ঠানের আলপনা ও মণ্ডনসজ্জা বিশ্লেষণ করলে একথা বোঝা সহজ হয়। তেমনি কাঁথার নকশা ও মোটিফের ব্যবহারের পশ্চাতে যে নিগূঢ় অভীপ্সা বর্তমান তার মূলেও ঐসব আদিম বিশ্বাস ও সংস্কার

কাজ করছে। বিবিধ অলঙ্কারের নির্মাণরীতি, মোটিফের ব্যবহার, উপাদানের নির্বাচন, পরিধানের রীতি ও সর্বোপরি ব্যবহার বিষয়ক সামাজিক বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে এইসব দুরপনেয় সংস্কারের ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল। কোন পূজা, উপাসনা, অনুষ্ঠান বা মেলায় কোন্ শিল্পকর্মটির কোন্ প্রসঙ্গে কীভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ হবে, অথবা কোন্ উপলক্ষে কী আলপনা বা চিত্রণের অবতারণা করতে হবে, গৃহে বা প্রাঙ্গণে কোন্ শিল্পবস্তুটি কেমন ভাবে বিন্যস্ত হবে—এই সব প্রসঙ্গই উক্ত বিশ্বাস ও সংস্কারাদির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন, নবান্নের পর ধানের ছড়া বা ছোট কুলো দিয়ে ঘর সাজানো, লক্ষ্মীপূজার আলপনায় পায়ের ছাপ, কিংবা মাঙ্গলিক কাজে মঙ্গলঘটের অবস্থানের উল্লেখ করা যায়। এই সব বিশ্বাস ও সংস্কারের মূল এত গভীরে প্রোথিত এবং এত সুদূর অতীতে বিস্তৃত যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের যুক্তিসম্মত বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এরা আছে বলেই অনেক শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, শিল্পকর্মগুলি এদের বাই-প্রোডাক্ট।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, অভিজাত ধর্মেও ত এমন ধরণের বিশ্বাস-সংস্কারাদির দেখা মেলে এবং অভিজাত বা ধ্রুপদী শিল্পের জগতেও এবম্বিধ প্রত্যয় ও বিধিনিষেধের শাসন যে নেই তাও বলা যায় না। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, অভিজাত ও লৌকিক এই দুই প্রকার সমাজ ও শিল্পের মধ্যে মৌলিক কোনো ফারাক নেই। মানুষের আদিম ও যুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাস, সংস্কার ও বিধিনিষেধের প্রভাব যে অভিজাত শিল্পের উপরেও ক্ষেত্রবিশেষে বর্তমান তার উদাহরণ আমরা অলঙ্কার বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাব। তবে অভিজাত বা নাগরসংস্কৃতি সর্বতোভাবে যুক্তিচালিত বা সংস্কার মুক্ত না হলেও লোকায়ত সংস্কৃতির তুলনায় যে অনেক বেশি সন্দিগ্ধ, কৃত্রিম, খুঁতখুঁতে, পারিপাট্যপ্রিয়, গ্রহিষ্ণু ও অবিমিশ্র শিল্পসৌন্দর্যের সন্ধানী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একই মানুষের মধ্যে এই নাগররুচি ও লৌকিক বিশ্বাসের সহাবস্থান এমন কি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলা বর্তমান থাকতে পারে। কিন্তু মোদ্দা কথা হল, যখন সে কোন শিল্পকর্মকে ধর্মবিহিত বা সমাজ নির্দেশিত বলেই সৃষ্টি বা গ্রহণ করে ও তার শিল্পমূল্যকে আলাদা করে যাচাই করে দেখে না, তখন তাকে বলি লোকায়ত মানসিকতার লক্ষণাক্রান্ত। আবার যখন সে শিল্পকে ধর্ম, সমাজ, সংস্কার প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশুদ্ধ শিল্পসুষমা ও উৎকর্ষের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে,

তখন তাকে অভিজাতরুচির লোক বলে মেনে নিতে হয়। অভিজাত মনোভাবাপন্ন লোকও যেমন সময়বিশেষে শিল্পবস্তুর প্রতীকী বা ধর্মীয় তাৎপর্যের দ্বারা চালিত হতে পারেন, তেমনি লোকায়ত সমাজের মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে নিছক শিল্পশোভায় আকৃষ্ট হয়ে অভিজাত শ্রেণীর শিল্পবস্তু সংগ্রহে বা রচনায় বা অনুকরণে প্রবৃত্ত হতে পারে। অভিজাত শিল্পে সৌন্দর্য-সৃষ্টি একটি উপেয়, উপায় নয়। সৃষ্ট বস্তুটির সামাজিক, প্রতীকী বা ধর্মীয় তাৎপর্য সেখানে গৌণ বা নগণ্য। অপরপক্ষে লোকশিল্পে ধর্মসাধন, সামাজিক কর্তব্যপালন বা ঐতিহ্যসম্ভূত রীতি, প্রথা, অনুষ্ঠানাদির যথাযথ সম্পাদনই মুখ্য লক্ষ্য, শিল্পবস্তুটি যদি সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সক্ষম হয় তবে সেটা উপরিলাভ। শিল্পকর্ম সেখানে উপায় মাত্র। কালীমায়ের পট যে আঁকে তার কাছে ও ক্রেতার কাছে কালীভক্তিই আসল কথা, ছবিটি দেখে ভক্তির উদ্দীপন হয় কিনা বড়জোর এইটিই বিবেচ্য, শিল্পকর্ম হিসেবে সেটি কতটা উতরে গেল তার বিচার কেউ করতে বসে না। আর শৌখিন ড্রয়িংরুমে যারা সেই পট বা কাগজমণ্ডের তৈরি অনুরূপ মুখাকৃতি সাজিয়ে রাখেন তাঁরা বিশুদ্ধ ভক্তিতে ততটা নয় যতটা শিল্পসৌন্দর্যের খাতিরেই তা করেন। এইখানেই হচ্ছে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ।

লোকশিল্পে ব্যবহৃত নকশা ও মোটিফ

লোকশিল্পে যে সব নকশা ও মোটিফ সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার উৎস কী? মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, লোকশিল্পীরা প্রধানত প্রকৃতির অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে এই সব নকশা ও মোটিফ আহরণ করে থাকে। আর এ ছাড়া বিভিন্ন সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নানারূপ প্রতীকী চিহ্নও তারা যুগযুগ ধরে ব্যবহার করে এসেছে যার কোনটি প্রজনন বা উৎপাদন কোনটি অকল্যাণ নিবারণ কোনটি বা মঙ্গলোদয় অথবা পূর্ণতাপ্রাপ্তির তাৎপর্য বহন করছে। প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত। বৃক্ষলতা, বিভিন্ন আকৃতি বর্ণের পত্র, পুষ্প ও কোরকাদি, বীজ, শস্য ও ফলের বিচিত্র আকার, গিরি-নদী-কান্তার বা অরণ্যের শোভা, মেঘরাজির অসংখ্য মূর্তিধারণ, নদী ও বৃক্ষকাণ্ড বা লতাপাতার তরঙ্গায়িত রূপ ইত্যাদি সবকিছুই রূপকল্প নির্বাচনে লোকশিল্পীর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পিতৃপূজার মোটিফ ড্রাগন প্রভৃতি কল্পনার নিদর্শন, স্বস্তিক, বিন্দু ও আবর্তরেখার সাংকেতিকী অর্থবহতাও লোকশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

কাঁথার বুকে যে পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্ম, সূর্য ও জীবজন্তুর আকৃতি রূপায়িত করা হয়, পল্লীরমণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগ বর্তমান। ফল-ফুলে ও লতাপাতার নানা আকৃতির ত ছড়াছড়ি দেখি গাত্রচিত্রণ ও অলঙ্কারের ক্ষেত্রে, সরাসরি প্রকৃতিজ অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়।

অভিজাত শিল্প আবার এইসব নকশা ও মোটিফকে গ্রহণ করে নিজস্ব প্রয়োজনানুসারে পরিমার্জন ও সংমিশ্রণের দ্বারা তার ভোল পাল্টে দিয়েছে ও নানান ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছে। পট, অলঙ্কার ও অন্যান্য শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে।

আধুনিক নাগরসংস্কৃতিতে লোকশিল্পের ভূমিকা ও স্থান

লোকশিল্প যে একটি বিশেষসমাজ ব্যবস্থার দান ও সেই সমাজপ্রসূত একটি বিশেষ চিন্তাধারা, রুচি, বিশ্বাস ও সংস্কারাবলীর পরিমণ্ডলের উপর একান্ত-ভাবে নির্ভরশীল একথা স্মরণ করলে মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ভারতসমেত সমগ্র বিশ্বজুড়ে আধুনিক নাগরসংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের পটভূমিতে লোকশিল্পের কী হাল হয়েছে এবং তার ভবিষ্যতই বা কী। বর্তমান লেখক অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত যে সেই সমাজব্যবস্থা ও মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে লোকশিল্পের মূল ভিৎটাই সাংঘাতিক ভাবে নড়ে উঠেছে, আর্থনীতিক চাপ ও ভিন্নরুচি ও সংস্কৃতির নির্বিচার বন্যাস্রোতপ্রায় উদ্দাম আক্রমণে তার স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্র রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে হাটে-মেলায় ঘুরে ঘুরে একথা পরিষ্কার বোঝা গেছে যে, অধিকাংশ লোকশিল্পীই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বা এঁটে উঠতে না পেরে বৃত্তিচ্যুত, স্বধর্মভ্রষ্ট, গোত্রান্তরিত অথবা উপবাসী হয়ে কাল কাটাচ্ছেন। তাঁদের পরম্পরাগত শিল্পের বিপণনমূল্য গেছে কমে, সামাজিক মূল্যও এসেছে ফুরিয়ে। সমাজ আজ আর তাঁদের অভিভাবক বা প্রতিপালক নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে তাঁদের একদা অপরিহার্য ভূমিকার আর্থনীতিক তাৎপর্য আজ আর বিশেষ নেই, কেননা সেই সমাজ ও বিশ্বাস আর নেই। যন্ত্রোৎপাদিত ভূরিসৃষ্ট শিল্পনিদর্শনের প্রতিযোগিতা ছাড়াও শহুরে রুচির সর্বব্যাপী আগ্রাসনে আটপৌরে লোকশিল্পের কদর গেছে কমে। আজ বিদেশে বা শহুরে বাবুদের বৈঠকখানায় নতুনত্বের খাতিরে বা প্রাতিস্বিকতার কল্যাণে কোন কোন লোকশিল্পের নমুনা ঠাঁই পাচ্ছে, কিন্তু তা শিল্পসৌন্দর্যের

গরিমার জন্য, সামাজিক বা পারিবারিক মূল্যবোধের জন্য নয়।

কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে লোকশিল্পের শিল্পমূল্য অকিঞ্চিৎকর, এই শিল্প নিতান্ত অশিক্ষিত পটুত্বের ফসল, এবং ঐতিহ্যাগত নকশা ও মোটিফগুলিও অন্ধ, উন্নয়নপ্রয়াসরিক্ত অনুকরণে জীর্ণ ও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। অশিক্ষিত পটুত্বের অভিযোগটি আলোচনার আগে শিল্পমূল্যের প্রসঙ্গটি ধরা যাক্। আগেই বলা হয়েছে যে, লোকশিল্প মূলত শিল্পীর নিজস্ব প্রয়োজনে সৃষ্ট বলে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা সামাজিক প্রেক্ষিতে বিচার্য বলে শিল্পীর কাছে তার নিছক শিল্পোৎকর্ষ মুখ্য বিবেচ্য নয়। কিন্তু তাই বলে কোনো শিল্পীই শিল্পবস্তুটিকে যথাসাধ্য শ্রীমণ্ডিত ও কল্পনার স্পর্শে সমৃদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করে না। শিল্পের জগতে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী একই নমুনা একেক জনের কাছে একেক রকমের গুরুত্ব ও মর্যাদা পেতে পারে। অতএব চৌকশপটে বাঙালী পটুয়ার বলিষ্ঠ বিদ্যুদ্‌গতি রেখাঙ্কন বা লাটাইপটের নাটকীয় বিন্যাসব্যবস্থার মধ্যে পিকাসো বা দাভিঞ্চির তুল্য প্রতিভার স্পর্শ নেই বলে আক্ষেপ করা বৃথা। লোকশিল্পকে তার নিজস্ব শর্তেই গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শিল্পিসত্তা আছে সেই প্রাথমিক স্তরে নামতে পারলে যায় তবেই লোকশিল্পের আদিম সারল্য, অকৃত্রিম ও নিয়মভাঙ্গা অকুণ্ঠ প্রকাশ এবং সহজ অথচ উজ্জ্বল কল্পনাকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। তদুপরি লোকশিল্প সচেতনভাবে শিল্পসৃষ্টি করে না। নিয়মিত শিক্ষণ, অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দিয়ে পটুত্ব অর্জনেও তার না আছে স্পৃহা না আছে সুযোগ, কেননা তা থাকলে সে অভিজাত শিল্পের আঙিনাতেই প্রবেশ করত। অতএব অশিক্ষিত পটুত্বই তার নিকট প্রত্যাশিত ও তার পক্ষে স্বাভাবিক।

লোকশিল্পের কদর কমছে বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন, লোকশিল্পের আদরণীয় কোন গুণই নেই বলে যাঁরা তাকে নস্যাৎ করতে চান, তাঁদের এবম্বিধ চমকপ্রদ উক্তির পশ্চাতে কী মনোভাব কাজ করছে তা নিয়েও সংশয় জাগে। লোকশিল্প নিয়ে গবেষক, সংগ্রাহক, পেশাদার সংস্কৃতি-ওয়ালাদের মহলে লোক দেখানো মাতামাতি বা কুম্ভীরাশ্রুমোচন অবশ্যই নিন্দনীয়, কেননা এতে না লোকশিল্প, না লোকশিল্পী, কারুর সমস্যারই সুরাহা হয় না। কিন্তু তাই বলে লোকশিল্প মরেছে, তার কাল ফুরিয়েছে, বা তাকে মাথায় করে নাচানাচি করাটা অভিসন্ধিমূলক হুজুগেপনা, এমনতর বেপরোয়া মন্তব্য করার অধিকারও বোধহয় সমীচীন নয়।

প্রকৃতপক্ষে লোকশিল্পের বিষয়ে আখেরী বিচারের ভার শহুরে বাবু বা পণ্ডিত বা সরকার কারো উপরেই নেই, আছে তাদের উপর যারা এই শিল্পের স্রষ্টা ও যারা এই শিল্পের গ্রাহক ও ধারক। যদি এখনো গ্রামের লোক মেলায় গিয়ে সার্কাস, সিনেমা ও আর পাঁচটা পাঁচমিশেলী বিনোদনের সঙ্গে আত্মিক বা নান্দনিক তৃপ্তির উদ্দেশ্যে পটগান শোনে, তবে শত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যায় হলেও পটুয়া ও পট বেঁচে থাকবে। এখনো গ্রামঘরে লোকশিল্পের স্থান একেবারে মুছে যায় নি। হয়ত পুরনো ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতার স্থান নিতে সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনমত এগিয়ে আসতে পারে নি, হয়ত গ্রামীণরুচি ও নানা মিশ্রণের চাপে অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে, হয়ত শহুরে যান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোকশিল্পী আর জীবনধারণের মত উপার্জনে সক্ষম হচ্ছে না ও জাত হারিয়ে পেট ভরাতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এত প্রাতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও বাঙলার আলপনা, কাঁথা, পট, অলঙ্কার, মূর্তি, ডাকের সাজ ইত্যাদি এখনো টিঁকে আছে এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার সঙ্গে আরো বহুদিন টিঁকে থাকবে।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভারত প্রেক্ষাপট

প্রসারিত দৃষ্টিতে লোকশিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বগত আত্মীয়তা দেখা গেলেও সাধারণভাবে শিল্পব্যপারে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও অন্যান্য কারণ মিলে-মিশে একধরণের আঞ্চলিকতার জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের আবির্ভাব প্রাচীন ও মধ্যযুগে আদৌ ঘটেছে কিনা সন্দেহ। বিলম্বিত আর্যীকরণ ও আরো অজস্র ঘটনা ইঙ্গিত করে যে উত্তরভারত পূর্বাঞ্চলকে কোনদিনই তেমন সুনজরে দেখেনি। শশাঙ্কের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ পাল আমলে শাসক বাঙালীকে যদিও গৌরবদান করেছিল তবু একথা সত্য, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পূর্বভারত প্রায় চিরটাকাল উত্তরের দ্বারা শাসিত থেকেছে। শাসিতের শিল্পরুচিতে স্বাধীন চেহারা বা চারিত্র্য বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু বাঙালীর শিল্পকর্মে ভারতস্পর্শ সত্ত্বেও সেই স্বাধীন ছাপ আছে। এই বৈশিষ্ট্য শুধু শিল্পাচরণের ক্ষেত্রে নয়, মূল জীবনচর্যার মধ্যেও তা দেখা যায়। বাঙালীর জীবনধারা আদ্যন্ত লক্ষ্য করলে সমগ্র ভারতের সঙ্গে যুগে যুগে তার সম্পর্ক, প্রভাব বিস্তার ও প্রভাবিত হওয়ার পদ্ধতি, দেশীয় রাজন্যবর্গ, ভূস্বামী এবং ভিন্নভিন্ন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা মোটামুটি স্বচ্ছ হয়। আমরা গ্রন্থমধ্যে চিত্রণশিল্প ও অলঙ্কার অধ্যায়ে এই সূত্রে প্রসঙ্গ কথায় এসেছি।

বাঙলা চিত্রণশিল্প

উপক্রমণিকা

লোকায়ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধহয় বাঙলা-কলমের বিবর্তনশীল রূপটির সন্ধান বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নিছক লোক-শিল্প হিসেবে বাঙলা-কলমের আবির্ভাব কিংবা সাম্প্রতিক রূপগ্রহণ ঘটেনি, চিত্রশিল্পের সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে তার স্বতন্ত্র বিকাশ ওতপ্রোত। বাঙলা-কলমের সামগ্রিক চরিত্রোপলব্ধির উপক্রমণিকা হিসাবে তাই স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্মারক-পঞ্জীতে বঙ্গজ চিত্রকলার কী কী চিহ্নিত কালপর্ব আছে এবং তদনুযায়ী এই ধারার রূপান্তর ঘটেছে কেমন ভাবে। এই রূপান্তর সাধনে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চিত্রকলার সঙ্গে বঙ্গীয় ধারাটির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ী ভূমিকার তাৎপর্যও এই সূত্রে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বাঙলা-কলমের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য একদিকে যেমন দরকার সামাজিক প্রেক্ষিতে তার সঙ্গে বিভিন্ন কারুকলার আত্মীয়তা নির্ণয়, অপরদিকে তেমনি চাই ভারতের লোকপ্রিয় চিত্রকলার ও সেই সঙ্গে দরবারী-মন্দিরী চিত্রকলার অন্যান্য আঞ্চলিক শাখার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাঙলার নিজস্ব লিখনধারার বৈশিষ্ট্যগুলির (বিশেষত শিল্পকৌশলগত ও নান্দনিক চারিত্র্যের) বিশ্লেষণ এবং তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের রহস্য উদ্ঘাটন।

বাঙালী কবে যে লেখার কাজ সুরু করে তা আলো-আঁধার হলেও এই শিল্পকে আদৌ অর্বাচীন আখ্যা দেওয়া যায় না। খৃঃ ৪র্থ শতকে তাম্রলিপ্তে ছবি লেখা চলছে এমন সমাচার অবিদিত নয়। অঙ্কিত সামগ্রীর উপাদানগত নশ্বরতার জন্য ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের তুলনায় প্রাচীন লেখা-নমুনা তেমন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে লেখার ইতিহাসে পাল-যুগকে প্রথম মুখ্য কালপর্ব বলে ধরা উচিত। পালপূর্ব-যুগের দুয়েকটি চিত্রিত পাটা পাওয়া গেলেও তা থেকে শিল্প বৈশিষ্ট্যের কোন সাধারণীকরণ উচিত কাজ নয়। পালযুগেই বঙ্গজ শিল্পধারার চারিত্র্যের প্রথম বিকশিত রূপ আমরা দেখতে পাই। এই যুগের লিখিত ইতিহাসে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ

উভয়বিধ উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তখনকার দিনে মঠ-মন্দির, চৈত-বিহার প্রায় আপাদমস্তক চিত্রিত থাকত। কিন্তু পাল আমলের শিল্পীদের কলানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সৌধচিত্র নয়, পরন্তু প্রাচীরচিত্রের লক্ষণাক্রান্ত গরিমাদীপ্ত পুঁথিচিত্র। মোটামুটি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার এই রকম ২০।২২টি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও ৩টি তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্র পাওয়া গেছে। পুঁথির অলঙ্করণকল্পে অঙ্কিত এই চিত্রগুলিতে মুখ্যত ক্রপদী চিত্রাদর্শ অনুযায়ী বিস্তারপ্রবণ ধাবমান বঙ্কিম রেখার নিপুণ শাসনে এবং রঙের কুশলীগুণে সমৃদ্ধ ডৌলের সৃষ্টি করা হয়েছে। এইসব পুঁথিচিত্রের বিন্যাস ও রূপায়ণের ভঙ্গিমাতে সমকালীন মূর্তিশিল্পের প্রতিভাস সুস্পষ্ট। চিত্রগুলির পরিসর সঙ্কীর্ণ হলেও তাতে ক্ষুদ্রায়তন চিত্রের পরিবর্তে যেন প্রাচীরচিত্রের লক্ষণগুলিই প্রবল। আলো-ছায়া সৃষ্টির ব্যতিরেকে তুলির দুঃসাহসিক দ্রুত টানে বিদ্যুৎগতি, দূরাপসারী, প্রাণবন্ত রেখার সাহায্যে এবং উদার বর্ণপ্রলেপের মণ্ডন-কৌশলে এই অলঙ্করণ চিত্রগুলিতে যে অনায়াস ত্রৈমাত্রিক পরিপূর্ণ ডৌল সঞ্চারিত, লক্ষ্য করলে তার মধ্যে চিরায়ত বাঙলা-কলমের রঙ ও রেখার মণ্ডনবৈশিষ্ট্যের দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সুন্দরবন, ও চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রপট্টের চিত্রগুলির শিল্পাদর্শ আবার মুখ্যত মধ্যযুগীয় তীক্ষ্ণ, ডৌলনিরপেক্ষ, ঈষৎ কৌণিক রেখার প্রাচুর্যনির্ভর পশ্চিম ভারতীয়, বিশেষত গুজরাটি জৈন পুঁথিচিত্রের চিত্রাদর্শের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য প্রকট হলেও বঙ্গীয় তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রৈখিক শিল্পকর্মগুলি তুলনায় অধিকতর পেলব ও তীক্ষ্ণভাবর্জিত এবং তাদের সমর্থ রেখাগুলি আরো বেশি আত্মপ্রত্যয়ী, ভাবপ্রকাশক্ষম ও অভঙ্গ সজীবতায় সরস।

আঞ্চলিক ধারার বিবর্তন

পালযুগের চিত্রকলার তাৎপর্য শুধু এই নয় যে তা বাঙলা তথা প্রাচ্য-ভারতের পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে যেমন একে প্রাচীনযুগের সর্বভারতীয় ক্রপদী চিত্রাদর্শের একটি শেষ সফল অনুসৃতি বলা চলে, তেমনি অন্যদিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে, ৭ম শতকোত্তরকালে সর্বভারতীয় সার্বভৌম মানদণ্ড থেকে বিবর্তিত হয়ে ও সনাতন চিত্ররীতির বিভাজনের মধ্য দিয়ে যে আঞ্চলিক ধারাপত্তনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, তা সর্বপ্রথম সুষ্ঠু রূপ পরিগ্রহ করে দানা বেঁধে ওঠে পাল আমলের চিত্রশিল্পের মধ্যে।

বাঙলা-কলমের প্রেক্ষাপট

পালযুগের বঙ্গীয় চিত্রকলার বিবর্তনের বৃত্তান্ত উত্থাপনের সঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক শিল্পধারার প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণে এসে পড়ে। খৃঃ ১৩শ ১৪শ শতকে পশ্চিম ভারতে যে গুজরাটি জৈন পুঁথিচিত্রের ঘরানা সৃষ্টি হয় তাকে পাল ও মুঘল আমলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে আঞ্চলিক চিত্রধারার সমুত্থান ও বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলা চলে। পরবর্তী কালে, অর্থাৎ ১৭শ শতকের মাঝামাঝি, গুজরাটি পটে রাজপুত ও মুঘল রীতির ছায়া পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল লিপিরচনায় অসামান্য দক্ষতাজনিত রেখাঙ্কনের অত্যুৎকৃষ্ট মান। অনায়াস দ্রুততার সঙ্গে অঙ্কিত বহিঃরেখার জন্য এবং সমতল রঙের প্রলেপ ও বেরিয়ে আসা অবয়ব-রেখার সাহায্যে মাত্রার ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলার জন্য সচরাচর গুজরাটি কলমের যে বিরোধী সমালোচনা করা হয়, আধুনিক চিত্রাদর্শের বিচারে তা আর নিন্দনীয় নয়, বরং নির্ভীকতার নমুনাসাক্ষ্য। বাঙলা-কলমে প্রথাবিরোধী চিত্রাদর্শ তথা নির্ভীকতা আবহমানকাল রয়েছে

গুজরাটের সমসময়ে রাজস্থানে যে চিত্ররীতি মার্জিততর চেহারায় দেখা দিয়েছিল, গুজরাট-কলমের প্রতি তার প্রারম্ভিক অকিঞ্চিৎকর ঋণ সত্ত্বেও বিদগ্ধ ও পরিশীলিত লালিত্যে ও আবেগময়তার গুণে অচিরেই তা স্বতন্ত্র মহিমা অর্জন করল. প্রকৃতপক্ষে রাজপুত লিখনকাজের প্রাণই ছিল ক্ষুদ্রায়তন কাগজের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে হ্রস্বানুপাতিক কৌশলে প্রাচীর চিত্রাঙ্কন ও তৎসহ বয়নশিল্প সংক্রান্ত চিত্রণের ঐতিহ্যবাহী রীতি প্রয়োগ, তদুপরি তাতে আঞ্চলিক লোকায়ত চিত্ররীতির বলিষ্ঠতার আরোপে দার্ঢ্য আনয়ন। পরবর্তীকালে মুঘল দরবারে জাঁকজমকের মোহে বাদশাহী বিলাসব্যসন ও শিল্পকলার সর্বাঙ্গীণ অনুকরণ ও অনুশীলনের ব্যাপক জোয়ারে ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত কলমে যখন দরবারী মিনিয়েচারের লোকোত্তর নৈপুণ্য ও গীতিময় সৌকুমার্যের ছোঁয়াচ লাগল, তখনো কিন্তু প্রথমযুগের মৌল লোকায়ত চরিত্র থেকে কদাচ তা ভ্রষ্ট থেকেছে।

দিল্লীর বিজয়ীদের মধ্যে মুঘল শাসকরা শিল্পকলার চর্চায় প্রবল উৎসাহ জুগিয়ে কালক্রমে ভারতীয় শিল্পের বিবর্তনে প্রায় সর্বক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। আরব্য সংস্কৃতির পরিবর্তে বিলাসপ্রবণ ও গীতিময় সংবেদনশীলতায় স্পন্দিত পারসিক রুচির দ্বারা মুগলযুগের শাসককুল ও অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল। প্রথম প্রথম পারসিক চিত্র ও

চিত্রশিল্পীর সমাদরে নিরত থাকলেও ক্রমে পারসিক চিত্রগুরুর, হয়ত বা ঐকলব্যীয় দীক্ষায় শিক্ষিত স্থানীয় শিল্পীদের বিমিশ্ররীতিতে অঙ্কিত চিত্রের পৃষ্ঠপোষণাতেও তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। ফলে পারসিকধারার সঙ্গে দেশীয় প্রতিভার মিলনে জন্ম নিল জগৎবিখ্যাত মুঘল কলম। ভারতের চিরাচরিত লোকায়ত চিত্রাদর্শ ও প্রাচীন চিত্রধারার সঙ্গে পারস্যের পুঁথিচিত্রণ ও লিপিকৌশলের এক বলিষ্ঠ সমন্বয় এই কলমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল। এই সমন্বয়ী কলমের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা গেল ছবির মৃদু আদোল, অঙ্কিত বিষয় বস্তুর উপযোগী পটভূমি চিত্রণ, সূক্ষ্মতা ও সংবেদনশীলতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ এক স্থৈর্যপরায়ণ বাঙ্ময় বহিঃরেখা, আলো-আঁধার সৃষ্টির প্রয়াস এবং সে যুগের তুলনায় প্রাগ্রসর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপদান রীতি। একদিকে পারসিক কায়দায় ক্যালিগ্রাফী বা লিপিরচনাসুলভ অতুলনীয় পরিমিতি সৃষ্টি ও পরিণত রূপদান কৌশল, অন্যদিকে ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকায়ত চিত্রধারার ছন্দোময় তুলির আঁচড়ে দীর্ঘায়ত বঙ্কিম রেখার বিভ্রম বিলাস—এই দুই বিষম ধারা মিলেমিশে এমন পরম কমনীয়, সূক্ষ্ম ও পরিণত রেখ-সৌন্দর্য সৃষ্টি করল যার মেজাজের সঙ্গে পার্থিব কোন তুলনাই যেন তুলনা নয়।

রাজপুতনার বিভিন্ন সামন্তকুল ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী রাজ্যের দরবারগুলি বেশ কিছুদিন ধরে সনাতনধারায় দীক্ষিত শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল কলমে পারদর্শী শিল্পীদেরও পৃষ্ঠপোষণা করে আসছিলেন। নাদিরশাহী আক্রমণের পর মুঘল সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হতে আরম্ভ করলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা এড়াতে শিল্পীরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে একে একে দেশীয় রাজন্যবর্গের দরজায় কড়া নাড়তে লাগলেন। এই পরিস্থিতিতে আগন্তুক মুঘল কলমের সঙ্গে আঞ্চলিক চিত্রধারার পুনর্বার মিশ্রণে নতুন নতুন বর্ণসঙ্কর কলমের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। পাহাড়ী কলমগুলি ছাড়া আরো কিছু আঞ্চলিক মিশ্রিত চিত্রাদর্শ গড়ে উঠল লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং কোন কোন নতুন কেন্দ্রে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি সন্ধিক্ষণে বাঙলা-কলম নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে নেহাৎই দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এমন উদ্ভট অনুমানের কোন পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং বলা যায় বাঙলার ঐতিহ্যানুসারী লিখনাদর্শ বারংবার বহিরাগত প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে, গ্রহণ করেছে প্রয়োজন ও সাধ্য অনুসারে এবং অঞ্চলান্তরের চিত্রধারায় নিজ বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করেছে। তাছাড়া গ্রামজীবনের সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট অগণিত চারু ও কারুশিল্পের প্রকাশভঙ্গী, ভাব ও ভাষা আত্মস্থ করে কখনো কখনো সরাসরি বহিরাগত প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙলা-কলম ঋদ্ধি ও বিবর্ধনের মুখ দেখেছে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের মধ্যে পরিপূরক সহযোগিতার বিস্তৃত আয়োজন ঘটিয়ে।

দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণ থেকে আরম্ভ করে উৎসব-পরবের সামগ্রী পর্যন্ত সবকিছুকে শ্রীমণ্ডিত ও অলঙ্কৃত করে তোলার ব্যাপারে বাঙালীর সহজাত শিল্পচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। গ্রাম-বাঙলার নিস্তরঙ্গ, মন্থর জীবনে বৈচিত্র্য ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বর্ণবিলাস ও রূপসৃষ্টির সহায়তায় শোভাবর্ধনের একটি স্বাভাবিক তাগিদ আবহমানকাল রয়েছে। গার্হস্থ্যশিল্পের অজস্র সামগ্রী বরাবরই বাঙলা-কলমকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুখ্যমাধ্যম করেও কখনো কখনো অঞ্চলান্তর বা ভিন্ন জাতের শিল্পভাষাকে আত্মস্থ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন গার্হস্থ্যশিল্পের মধ্যে আদান-প্রদান ব্যবস্থা আভ্যন্তরীণ প্রভাবচক্র সৃষ্টি করেছে যা বাঙলা-কলমকে ঋদ্ধ করে তুলেছে এবং সময়ে অসময়ে নতুন সৃষ্টি ও পথান্বেষণে প্রেরণা জুগিয়েছে।

গার্হস্থ্য শিল্প

প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সামগ্রীকে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করার এমন একটি প্রয়াস হল কাঁথা বোনার গার্হস্থ্যশিল্প। অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজকের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যন্ত ছিন্নবস্ত্রকে গাত্রাবরণরূপে ব্যবহার করার রীতি চলে আসছে বটে, কিন্তু এটিকে সজ্জিত গার্হস্থ্য উপকরণে পরিণত করার কৃতিত্ব গ্রামবাঙলার নারীপ্রতিভার। কল্পনা, দক্ষতা ও ধৈর্যের সম্মিলিত প্রয়োগে পুরাঙ্গনারা তাঁদের বিক্ষিপ্ত অবসরকালকে তিল তিল পরিশ্রমে রূপান্তরিত করেন এমন এক অভিনব সীবনচিত্রে, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু হয়েও যা প্রয়োজনাতিরিক্ত সৌন্দর্যে অভিষিক্ত। প্রতীকী মূল্যসমৃদ্ধ নানাবিধ নকশা ও লোকায়ত মোটিফের সমাহারে বাঙলার কাঁথা মনোজ্ঞ ও অর্থবহ সূচীশিল্প। বঙ্গীয় রমণীর এই অন্তরঙ্গ সৃষ্টি যেসব চিত্রবিন্যাসে সমৃদ্ধ তারা বিস্ময়জনকভাবে সরল অথচ গূঢ় ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও নাটকীয় প্রভাব সঞ্চারী। গাত্রাবরণ ছাড়া বাক্স-প্যাঁটরার ঢাকা, শিকে, থলি, পেটি, বটুয়া ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর আকারে এই সূচীশিল্পের ব্যবহার আছে। কাঁথার চিত্রবিন্যাসের পরিকল্পনা সহজেই পটের কথা স্মরণ করায়। সূর্য, পদ্ম, বৃক্ষ, লতাপাতা থেকে মানুষ, গৃহপালিত ও বন্য জীবজন্তু, যানবাহন,

প্রসাধন সামগ্রী, অলঙ্কার, গৃহ ও গার্হস্থ্যজীবনের টুকিটাকি পর্যন্ত সবকিছুই অর্থাৎ পল্লীবণিতার ব্যবহারিক জীবন ও সেই সঙ্গে তার রহস্যময় কল্পনার জগতের সঙ্গে যারই আত্মীয়তা বর্তমান, তারাই এসে ভিড় জমায় অবসর-কালীন শিল্পীর সুচাতুলিকার মুখে। বীরভূমের উচ্‌করণের বৃদ্ধা বিবির মতো শিল্পীরা আবার প্রতিকৃতি অঙ্কনের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন সেলাইয়ের ফোঁড়ে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলার পট ও কাঁথার মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্কের অনুরূপ আত্মীয়তা দেখা যায় গুদ্‌রি নামের রাজস্থানী চাদর ও রাজস্থানী পটের মধ্যে কিংবা মিথিলার মধুবনী চিত্রধারা ও সুজনির মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে সমকালীন লোকায়ত জীবনযাত্রায় যে সব প্রতীক ও নকশা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাদের উপেক্ষা বা অতিক্রম করা কখনো কোন পল্লীশিল্পীর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

শুধু কাঁথা বা জামদানী শাড়ী নয়, পল্লীজীবনের ব্যবহারিক, উৎসবগত, ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক প্রকাশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শিল্পকর্ম মাত্রেই উল্লিখিত সর্বব্যাপী ঐতিহ্যাশ্রয়ী রীতির প্রভাবাধীন। আবার এইসব চারু ও কারু-শিল্পের মধ্যে চিত্রিত প্রতিরূপ নিয়েই যাদের কারবার, বাঙলা-কলমের গৌরবশাখা পটশিল্প যেমন তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমনি তাদের ওপর প্রভাববিস্তারও করেছে, যেমন আলপনা, চিত্রিত ঘট ও সরা, পুতুল ও অন্যান্য খেলনা, গৃহস্থালী তৈজসপত্র ও বিবিধ ছাঁচ, কাষ্ঠতক্ষণ, গহনা, পুঁথি ও পাটার চিত্র এবং অলঙ্করণ, লিপিরচনা, উল্কি বা গোদানির প্রাথমিক রেখা ও মায় অলঙ্কৃত কোষ্ঠী-ঠিকুজী।

উৎসব অনুষ্ঠানে ঘট ও সরা অপরিহার্য সামগ্রী। এই দুটি মৃৎপাত্রের গাত্রপৃষ্ঠের গড়ন দেব-দেবীর প্রতিলিপি অঙ্কনের এক লোভনীয় কৌশলের জনক। নারীব্রত, লৌকিক-পৌরাণিক ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে আলপনা সৃষ্টি করা হয় তার সঙ্গে ঘট ও সরা চিত্রণের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। ফুল, লতাপাতা, জ্যামিতিক চিহ্ন ও নানাবিধ প্রতীকী নকশা এবং বিস্মৃত লিপির সমন্বয়ে আঙিনা, পৈঠা, কুলঙ্গী, বেদী ইত্যাদি সজ্জিত করার মধ্যে অন্তঃপুরচারিণীদের যে গূঢ় আশা-আকাজ্ক্ষা ফুটে ওঠে কাঁথাচিত্রণের মতো তারও উৎস জাদু-নির্ভর ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নিহিত। তবে সূচীশিল্পের সীমাবদ্ধ নমনীয়তার জন্য কাঁথার রেখাসংযোজন স্বভাবতই ঋজু ও কৌণিক-প্রবণতা যুক্ত। সেই তুলনায় আলপনার তরঙ্গায়িত ছন্দোময় রেখার বঙ্কিমগতি ও বর্তুলাকার মণ্ডনকৌশল বরং পটচিত্রণের নিকটতম প্রতিবেশী।

বাঙালীর এই সৌন্দর্যসাধনায় বাহ্য আয়োজন ও উপচারের ভূমিকা নগণ্য, পরন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পচেতনা ও রূপদক্ষতার সমবায়ে পরিবেশকে নিয়ত শ্রীছন্দোময় ও কারুকার্যমণ্ডিত পারিপাট্যে পরিপূর্ণ করে তোলার স্পৃহা মুখ্য। সৌধগাত্র বা প্রাঙ্গণাদির ন্যায় অনড় কিংবা ঘট-সরা প্রভৃতির ন্যায় বহনযোগ্য, কাঁথা বা শাড়ীর মতো নমনীয় কিংবা কাঠ-মাটি-কাগজের মতো দৃঢ়তল ও কঠিন, ভূমি-প্রাচীর-কাগজ প্রভৃতির মতো সমতল অথবা সরা-ঘট-কুলো-হাঁড়ি-কলসার মতো উচ্চাবচ বা বক্রতল, কোন কোন বস্ত্রখণ্ড, জড়ানো পট বা প্রাচীরগাত্রের ন্যায় উল্লম্ব, কিংবা চৌকশপটের ন্যায় আনুভৌমিক, আলপনাদির মতো ক্ষণস্থায়ী কিংবা পুঁথিচিত্রণের মতো স্থিতিশীল—চিত্রিতরূপ ধারণক্ষম এতাদৃশ যাবতীয় বিষমপ্রকৃতির আধারই অবলীলাক্রমে বাঙলা-কলমের রূপচর্যার অবলম্বনে পর্যবসিত হয়েছে।

এই সার্বভৌম নান্দনিক প্রবণতাপ্রসূত ঐতিহ্যানুসারী, রূপসৃষ্টিমূলক লোকায়ত শিল্পগুলির সাধারণ লক্ষ্য ও অভিপ্রায় যেহেতু সামাজিক চরিতার্থতা সাধন, সেইজন্য এই সামাজিক শিল্পগুলির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও পরিপূরকতার সম্পর্ক বিদ্যমান।

পূর্বীধারা ও বাঙলাপট

সারা ভারতের লোকধর্ম ও রাজধর্ম বারেবারে সমগ্র সমাজটিকে নিয়ে একেকটি বাঁক সৃষ্টি করেছে। পূর্বাঞ্চলের এই মাগধী প্রাকৃতের বিবিধ শাখায় বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মাগধী এবং ভোজপুরিয়ায় উচ্চারণকারী বিশ্বকর্মার সন্তানেরা সর্বভারতীয় ধারা থেকে কোনক্ষেত্রেই খুব একটা বিচ্ছিন্ন থাকেননি। এদিকে লোকসমাজের সাংস্কৃতিক ভূমি পরমধ্যযুগে বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে এবং বৃহত্তর ভাষা এবং সংস্কৃতির আওতায় বেশ কয়েকটি উপসাংস্কৃতিক অঞ্চলের জন্ম দিয়েছে। তাই পূর্বাঞ্চলায় সাংস্কৃতিক আব-হাওয়ায় আঞ্চলিক লোকসমাজের চিত্তভূমি তৈরী হয়েছে। পূর্বী ধারা এমনভাবে বয়ে চলেছে যে কখনো কখনো মনে হয় সমতলের সংস্কৃতি আরণ্যককে কিংবা পার্বত্য সংস্কৃতি সমতলকে যেন চিনেও চিনতে পারে না। বিবর্তন, মিশ্রণ সব কিছুকে আত্মস্থ করে বাঙলা পট বিবর্ধনের রূপ দেখেছে। আজও বিবর্তনের ঢেউ যেখানে যত কম সেই বঙ্গীয় সাংস্কৃতিকভূমির স্থানিক কর্ষণার নিদর্শন বৈশিষ্ট্যে তত স্বতন্ত্র।

চিত্রণশিল্পের বৃত্তিবিভাজন

চিত্রকর সম্প্রদায় শুধু যে পট লিখেই ক্ষান্ত হতে পেরেছেন এমন নয়। লেখা তা সে যেরকমই হক তাতেই ছিল পটুয়ার অগ্রাধিকার। এমন কি কুম্ভকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সূত্রধর সম্প্রদায় যে গড়ার কাজ করতেন তাতে শেষভাগে লেখার কাজ অর্থাৎ রঙ তুলির কাজে পটুয়া হলেন উপযুক্ত লোক। কুমারটুলির এক বৃদ্ধ কুম্ভকার বলেছেন, আগে রঙের কাজে হিন্দুদের বাধা নিষেধ ছিল তাই পটুয়া এবং কিছু কিছু আচার্য ব্রাহ্মণ ঐ কাজ করতেন। আজ অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। রঙ সম্পর্কে আমাদের সেই পুরনো ধারণা তেমন কার্যকর নয়। এখন কুম্ভকার, সূত্রধর এবং পাশাপাশি পটুয়ারা গড়া ও লেখার কাজ করছেন, এ দৃশ্য বাঙলার সর্বত্র দেখা যায়।

বাঙলা-কলমে চাল ও সরা

শহর কলকাতার বুকে কুমারটুলি মূলত নদীয়ার কুম্ভকার সমাজের পীঠস্থান। আমাদের পশ্চিম প্রভাবিত নান্দনিক দৃষ্টিকে মায়া কাজল পরিয়ে এই কুম্ভকাররা যে লেখার কাজ করে এসেছেন তা পূর্ণত পটচিত্রের সমগোত্রীয়। কুমারটুলির লেখার কাজের খ্যাতি যুদ্ধের আগে পর্যন্ত অটুট ছিল। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত মূর্তির সর্বাঙ্গে, উৎসবপার্বণের সামগ্রীতে, ঘটে ও সরায় এবং সর্বোপরি চালে কুমারটুলির কারিগর যে কাজের নমুনা রেখে গেছেন তা যে কোন মানদণ্ডে উত্তীর্ণ শিল্পকাজ। বাঙলাধারা নামে যে ধারাটি এখনো কোনক্রমে বেঁচে আছে তার পেছনে কুমারটুলির জিতু পাল, অন্নদা পাল এবং কাঙালী পাল প্রভৃতির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সবরকমের গড়া ও লেখার কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিশেষ করে কাঙালী পালের নামে আজও অনেকে মাথা নত করেন। কাঙালীবাবু সরা-পিঁড়ি লেখা থেকে মূর্তি গড়া ও লেখার কাজ করতেন। অবসর সময়ে চালচিত্র লেখা এই শিল্পীদের বরাবরের অভ্যাস। বিশেষ করে বর্ষাকালে ঘরের মধ্যে লেখার কাজ বেশি করে করা হত। বাঙলার সনাতন পটধারা এবং গার্হস্থ্যশিল্পের ধারার সঙ্গে কুমারটুলি একাত্ম হয়ে লেখার কাজ করেছে। এমনকি আজও, আরো সংমিশ্রণের পরেও, বাইরে থেকে এখানে চালচিত্র আমদানী সত্ত্বেও কুমারটুলির নিজস্ব চাল সনাতন বৈশিষ্ট্য সর্বাংশে হারায়নি। এই সূত্রে

কুমারটুলির বাঘা কারিগর হরিজীবন পালের নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তখন কৈলাসী চালে সারা বাঙলা জুড়ে কুমারটুলির একাধিপত্য। বৃন্দাবনী চাল প্রায় উঠে যেতে বসেছে। ইতিপূর্বে প্রচলিত রামচন্দ্রী, দশাবতারী, ইন্দ্রানী ও ব্রহ্মাণী চালের কথা অনেক শিল্পি ভুলেও গেছেন। কৈলাসী চালের এই দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত লেখা অনুসরণ করলে আমরা সুস্পষ্ট চারটি বিভাজন দেখতে পাই। প্রথম, বাঙলা চাল। এই চালের ঢাল কার্তিক গণেশের মাথা পর্যন্ত নেমে আসে। এই চালে পাশটাটি লাগানো থাকে এবং এটি সরাসরি একহারা চাল। দ্বিতীয়, খোপ চাল। এই চালে আড়ে লাটাই (চক্ষুদান, গোঁসাইপটের মতো করে লেখা) পটের প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। এই চালের লেখা সনাতন গার্হস্থ্য শিল্পের অনুসারী। তৃতীয় হল, টানা চৌড়ি। বাঙলার অন্যান্য জেলায় টানা এবং বাঁকা চৌড়ির প্রভাব আজও একটু আছে কিন্তু শহরে যেহেতু দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় থেকে ঠাঁই ঠাঁই মূর্তি সুরু হয়ে গেল তাই চৌড়ি চালের স্থান অঙ্কিত দৃশ্যস্থাপনা দ্বারা পূরণ করা হয়। বর্ধমানের দাঁইহাট প্রভাবিত শোলাচুমকির চৌড়িচাল একসময়ে এখানে ছোটখাটো বাজার পেয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তা নেই। বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে চালচিত্র তা হল মার্কিন চাল। এই চালের ঢাল লক্ষ্মী-সরস্বতী পর্যন্ত নেমে আসে এবং এর কোন পাশটাটি থাকেনা। এর লেখার কাজে ঐশ্বর্যশালা কৈলাসের আভাস দিতে শিল্পী নানা নক্শার থাম কর্নিশ লিখে থাকেন।

উভয় বঙ্গে মূর্তির বদলে লেখা সরা দিয়েও পুজোর কাজ হতে দেখা যায়। এই সরা চিত্রণে কুম্ভকার, সুত্রধর, আচার্য ব্রাহ্মণ এবং পটুয়া একই লেখা লিখে থাকেন। তবু মোটামুটি পাঁচরকমের সরা আমরা দেখতে পাই। ঢাকাই, ফরিদপুরী, সুরেশ্বরী, আচার্যি এবং কুমারটুলি। বর্তমানে কুমারটুলির সরা লেখায় সেই পুরোন আদল আর নেই। লক্ষ্মীপুজোর সময় কুমারটুলিতে ঢাকাই ও ফরিদপুরী সরা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হয় এবং ফরিদপুরী সরা সর্বাধিক বিক্রি হয়। ফরিদপুরী কৌনি সরা যা লিখনধর্মে সুরেশ্বরীর সমগোত্রীয় তারই বাজার মূল্য বেশি। ঢাকাই সরার ক্রতত্তা মুহূর্তে চৌকশ পটকে স্মরণ করায়। তাছাড়া সরার খরিদ্দাররা সাধারণত সরাকে পট নামেই ডেকে থাকেন। সমতল পোড়ামাটির ফলকে লেখার কাজ না করে সরার উল্টো দিকটি কেন বেছে নেওয়া হল এ প্রশ্নের সদুত্তর আজও মেলেনি। কেউ কেউ এর মধ্যে বৌদ্ধ গন্ধ পেয়েছেন।

প্রাচীনযুগের প্রাচীরচিত্র ও পট

অতি পুরোনোকালের পটের কথা আমরা প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানতে পারি। সেই পটলিখা যার রচনা শেষ হলে রেশমের খাপে সযত্নে গুটিয়ে রাখা হত, তত্রোপরি চ দিব্যাংশুকবেষ্টিতোহয়ং বিমুক্তঃ পটঃ—তা আর নেই। এগুলি আবহাওয়া ও রাজনৈতিক কারণে বিনাশ পেয়েছে। কিন্তু বিভিন্নযুগে অঙ্কিত গুহা ও দেওয়ালচিত্রের কিছু নমুনা এখনো রয়ে গেছে যা থেকে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকরদের সাফল্য সম্পর্কে কথঞ্চিৎ ধারণা জন্ম নেয়।

পৃথিবীর বহুস্থানেই খৃষ্টজন্মের অনেক আগে থেকে গুহা এবং দেওয়ালে রেখা ও লেখার চিহ্ন রেখে গেছেন আদিম মানুষ। ফ্রান্সের দোর্দন বা স্পেনের গুহাগুলোয় এমন নমুনা রয়েছে যা থেকে শিল্পের ইতিহাস সেই প্রস্তরযুগকে দেওয়ালে লেখার সনাতন সাক্ষ্য বলে জ্ঞান করে। আমাদের দেশে ঠিক ঐ সময়ের না হলেও পরবর্তীকালের কিছু দেওয়ালছবি পাওয়া গেছে যার আকর্ষণ বড়ো কম নয়। মধ্যপ্রদেশের মন্দ্ নদীর ধারে সিংহনপুর গ্রামের পাশে একটি পাহাড়ের মালা আছে। এর কতকগুলি দেওয়ালে আদিম চিত্রকররা হাতি, হরিণ এবং খরগোস জাতীয় প্রাণী এবং ঐ পরিবেশে মানানসই মানুষের ছবি এঁকে রেখে গেছেন। এই দেওয়ালচিত্রের একটির বিষয়বস্তু হল বুনো মহিষ শিকার এবং মৃত্যুকাতর ঐ মহিষকে কেন্দ্র করে নৃত্যরত গুহা মানুষের আদিম উল্লাস। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের কয়েকটি গুহায় পাওয়া গেল গণ্ডার এবং সিংওলা হরিণের ছবি—এবারও বিষয়বস্তু শিকার। হয়ত যাদুক্রিয়ায় ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণীকে বশীভূত করার ভারতীয় নমুনা এগুলি। এর বেশ কিছুদিন পরে জানা গেল, সুরগুজার যোগীমারা গুহায় প্রথম খৃষ্ট পূর্বাব্দের ভারতীয় চিত্রকরসম্প্রদায় কিছু সৃষ্টি-নমুনা রেখে গেছেন। এই লেখার কাজে আমাদের জড়ানো বা লাটাই পটের মূলধর্মটি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বিষয়ভাবনায় এগুলি জৈন। যোগীমারার এই চিত্রগুলিকে গুরুত্বদান প্রসঙ্গে অনেকেই বলেছেন, ইতিহাস-পূর্ব এবং ইতিহাস যুগের সেতুবন্ধস্বরূপ এই চিত্রসম্ভার। আমাদের দেশে দেওয়ালচিত্র চরমে উঠেছে প্রধানত অজন্তা, বাঘ ইলোরা, কাহ্নেরি, কারলি, ভাজা, বেদশা এবং জুনারে। এমন কি দেওয়ালচিত্রের সুবাদে কুষাণ আমল থেকে ভারতীয় শিল্পীর বিদেশে যাত্রা ঘটেছে—এমন অনুমানও অনেকে করে থাকেন। বিদেশের কোন কোন চিত্রকে ভারতীয় শিল্পীর অঙ্কিত

বলে কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেন। সেই মতামতকে অগ্রাহ্য করলেও একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে তৎকালীন ভারতশিল্পীর হুবহু অনুকরণ ঐগুলি। এমন নমুনা রয়েছে মধ্য এশিয়ার কাশগড়, ইয়ারখণ্ড তুমসুক, কিজিল, কুচা, খোটান, সেরচুক, দাণ্ডান, উইলিক, মীরণ এবং বেজেকলিকে। চীনে সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে ওয়েই, তাঙ এবং সুঙ বংশের রাজত্বকালে আমাদের দেশের ছবি ওদের আচ্ছন্ন করেছিল। কানসুর তুন হুয়াঙ গুহার দেওয়ালে, সানসি প্রদেশের তিয়েন-লুন-শান এবং হোনান প্রদেশে প্রচুর ঐ ধরনের প্রভাবিত চিত্র রয়ে গেছে। এই সঙ্গে কোরিয়ার সকুলঅম, জাপানের হরিয়ুজি, সিংহলের সিগিরিয়া এবং ব্রহ্মের আনন্দ মন্দির স্মরণীয়। অজন্তার দেওয়ালে কুশলী শিল্পীরা যে কয়েকশো বছর ধরে ছবিগুলি এঁকেছেন তা সকলেই অনুমান করেছেন। গুহানুসারে এর যুগবিভাগ দেশী বিদেশী রসিকজন অনেকদিন ধরে করে চলেছেন। বাঘ গুহায় আবার এমন কোন নজির নেই যাথেকে এই শিল্পনমুনার বয়সকাল ধরা যায়। তবে অঙ্কিত মূর্তির বেশভূষা, কেশচর্চার ঢঙ ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় গুপ্তযুগের শেষদিককার লেখনিক নমুনা এগুলি। বাদামি বা বাতাপিপুরের গুরুত্ব এসেছিল চালুক্যবংশের প্রথম পুলকেশীর সময়ে। তাঁরই উৎসাহে এই স্থান রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। আগে এখানে তিনটি হিন্দু এবং একটি জৈন, এই চার প্রস্থ দেওয়ালচিত্রের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে একটি মাত্র আছে। মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝায় শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো দেওয়ালের ছবিও দুলে উঠেছিল। তাই উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিম ভারত থেকে এই সময়কার দেওয়ালের ছবির কোন নমুনা সংগ্রহ সম্ভব হয় না। তবে দক্ষিণে এই ধারাটি মোটামুটি অব্যাহত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন ধর্মকেন্দ্র মঠ-মন্দিরে সেই চিহ্নাবশেষ রয়ে গেছে। মাদুরা মন্দিরে রয়েছে তার নমুনা, রয়েছে আহনগুণ্ডির দেওয়ালে। বিজয়নগররাজ দ্বিতীয় বক্কারামার মন্ত্রী-সেনাপতি ইরুগাপ্পার উৎসাহ এই প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় এই সঙ্গে লিপাক্ষী ও তিরুনান্দিকরের লেখা উল্লেখ করতে হয়। উল্লেখ করতে হয় পদ্মনাভপুরমের সেই চারতলা প্রাসাদ চিত্রণ। এই সময়টাতেই চলছিল ইস্পাহানের মসজিদ ই-শাহের জগৎ বিখ্যাত দেওয়ালের কাজ। খৃঃ ৬২৫-৬৫০ ঠিক এই সময়েই পৃথিবীর সবদেশের লেখার কাজের চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল। আমাদের দেশের অজন্তার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোও এই সময়ের। দক্ষিণের সিত্তন্নবাসলের

লেখাও ঠিক এই সময়ে হয়েছিল। আজকের সহজলভ্য উপাদানের অভাবে তখনকার চিত্রকরসমাজ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন নি, বরং দীর্ঘায়ুলাভের আশায় ভিন্নতর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই দেওয়ালচিত্র অতি সম্প্রতিকালে যখন কাগজের ওপর দেখা দিয়েছে তখনি তা পট নাম গ্রহণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মিথিলার পট। মিথিলার গার্হস্থ্যশিল্পে ওখানকার উচ্চবর্ণের নারীসমাজের অবদান স্মরণ করতে হয়। এই বহমান শিল্পপ্রবাহে কোন শিল্পীকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। কতকগুলি সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই ছবিগুলি জড়ানো। সম্প্রতি ডিজাইন সেন্টারের উদ্যমে সোনার আহীর এবং দোশাদদের দেওয়ালচিত্র মিথিলা-কলমে হাতে তৈরি কাগজে পাওয়া যায়। বাস্তব থেকে বহুদূরে স্টাইলাইজড্ এই কলম আজ সমগ্র বিশ্বের কলারসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মধ্যযুগের পট

ভারতশিল্পের ইতিহাসে বিস্মরণের ঢেউ যেন শিল্পিসমাজের ঘাটেই বেশি করে আছড়ে পড়েছিল। এমন সময়ে লামা তারনাথ উপহার দিলেন পালযুগের কিছুসংখ্যক শিল্পীর নাম-ঠিকানা। ধীমান, বীতপাল, রাণক শূলপাণি মল্ল বা মঙ্গলদাস, শুভদাস, বিমলদাস, বিষ্ণুভদ্র, মহীধর, শশিদেব, কর্ণভদ্র এবং তথাগতসার—এঁরা হলেন বরেন্দ্রভূমি ও সমতটের কয়েকজন শিল্পী। এরপরই এসে যায় পশ্চিমভারতের কয়েকটি চিত্রিত জৈন পুঁথি। পাল-সেন এবং মুঘলযুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এগুলি। ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্ব তাই সহজেই ধরে নেওয়া যায়। শিল্পগত দিকটি অনেক পূর্বসূরি আলোচকের কাছে নগণ্য। ত্রুটি হিসাবে তাঁরা কৌণিক রেখাপাতন ও ক্রততার প্রসঙ্গ তুলেছেন। আজকের দৃষ্টিতে যা গুজরাটী পটের গুণ বলেই বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত চিত্রকথী নামে একদল ব্যক্তি সমাজে স্বীকৃত ছিলেন যাঁরা পেশা হিসাবে আমাদের পটুয়ার ভূমিকা পালন করতেন। গুজরাট মহামন্ত্রক কুমারপাল কল্পসূত্র থেকে জৈন তীর্থঙ্করদের সচিত্র জীবনকথা সৃষ্টির প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। পরে একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে ছবির কাজ গুজরাটে হয়েছে। চৌর পঞ্চশিকা বা লোরচন্দ্রানীর আখ্যায়িকা পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে। বাঙলায় তখন মহাজন পদকর্তা বলছেন : বিশাখা যখন দেখায়

চিত্রপট/মোরা বলেছিলাম সে বড় লম্পট॥ হাম সে অবলা সরলা অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি/ বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি॥ ভারতশিল্পের বরাতে· তুর্কি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাময়িক কালো পর্দা নেমে এসেছিল। শুধুমাত্র মানপ্রাণটুকু বাঁচাতে এখানে ওখানে পালিয়ে গেলেন অনেক শিল্পী। এদিকে শাসকের স্তরে তখন একমাত্র পারস্যশিল্পের স্বীকৃতি। তাই পাঠান থেকে মুঘলের শুরু পর্যন্ত সাধারণভাবে দেশীয় শিল্পিসমাজ প্রায় হাত গুটিয়েই ছিলেন, যতক্ষণ না হুমায়ুন অন্য একটি দিগন্তের আভাষ দিলেন। মীর সৈয়দ আলী এবং আবদুস সামাদের শিল্পাচার্যের ভূমিকায় বহু কারুকৃতের ভাগ্যে শিল্পী আখ্যা জুটল। কিন্তু বেশি সম্মান পেলেন লিপিবিদ্। সার্থক লিপিকাজের নমুনা দেখা গেল আজমীঢ়ের আড়াই দিনকা ঝোপড়ায় এবং ঘোরীর সমাধিক্ষেত্রে। পাগলা মহম্মদের মুদ্রাতেও লিপিকাজ দেখা গেল। বাবর নিজে বাবুরী লিপির জনক ছিলেন, হুমায়ুন ও লিপিবিদ্ ছিলেন।

তবে ক্যালিগ্রাফিষ্ট সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেলেন আকবরের সময়ে। আবুল ফজল সেই সময়ে লিপিকাজকে আটটি ভাগে দেখিয়েছেন। এর মধ্যে নাশ্‌খ্ এবং তালিক্ এই দুই জাতের সংমিশ্রণে নাস্তালিক নামে যে বিশেষ ধারার লিপি তৈরি হয়েছিল আকবর সেইটিকে খুবই পছন্দ করতেন। এই সঙ্গে বারোজন লিপিবিদের নামও জানা যায়। নাস্তালিকের যাদুকর মহম্মদ হুসেনকে 'জড়িন কলম' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে লিপি মুঘল দরবারে বিশেষ সমাদরের ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দরবার শিল্পের জাঁকজমকের এই প্রভাব দেশীয় সামন্ত-প্রভুদেরই যে শুধু বিচলিত করল তা নয়, এর ঢেউ লোকসমাজের ঘাটে এসেও পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে দিল্লীর দরবার যখন শুকিয়ে এল তখন পাহাড়ী রাজা থেকে বিভিন্ন সামন্তপ্রভুর দরবার শিল্পী সমরোহে জমজমাট। রাজস্থান ও গুজরাটের সমসাময়িক কিছু চিত্রনমুনা সংগৃহীত হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় মধ্যযুগে রাজনৈতিক কারণে ওখানকার দেশজ শিল্প নষ্ট হয়েছিল। সুরুর যুগে রাজস্থানী চৌকশে গুজরাটী প্রভাব লক্ষিত হত। পরে অনেকাংশে তা দূর হয়েছে কিন্তু একেবারে মুছে যায়নি।

ইতিমধ্যে দরবারশিল্পের ভঙ্গকৌলীন্য রাজ্যসীমা বাড়াতে আরম্ভ করেছে। লক্ষ্ণৌ, পাটনা, হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীরকে আচ্ছন্ন করে এক নতুন রাস্তা চাইতে সুরু করেছে। বড় বড় দরবার ভেঙে অজস্র ছোট ছোট দরবার

জন্ম নিচ্ছে। দরবারী সঙ্গীত থেকে দরবারী চিত্রশিল্প সব যেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দরবারচ্যুত শিল্পী সেই নবাবী মনটি খুঁজছে যেখানে তাঁর গুণ অর্থমূল্যে সমাদর পায়। লোকসমাজের দরবারও তখন বেশ জমকালো। সমাজ ইতিহাসে এই সময়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, দরবারতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের দাক্ষিণ্য লোকসমাজের সৃষ্ট শিল্পে কখনো কখনো অকুণ্ঠ হল। এবং সম্ভবত এই সময়ে লোকশিল্পের সমস্ত শাখায় সৃষ্টির বন্যা বয়ে গেল। আকস্মিকভাবে ভারতের বাইরের দিকে তাকালে এই সময়ে আমরা চীনের কুয়ান য়িন পটটি পাই। সম্প্রতি এ্যান্থনি ক্রিস্টি তাঁর চাইনিজ মিথোলজি গ্রন্থে পটটির প্রতিলিপি যুক্ত করেছেন। পদ্মে উপবিষ্টা এই দেবী যেন এখুনি জল থেকে উঠে আসছেন। আগে উনি ছিলেন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর থ্যাং রাজত্বের সময় উনি হয়ে গেলেন ক্ষমার দেবী এবং আমাদের ষষ্ঠীসমা অর্থাৎ সন্তানাদি ব্যাপারের দেবী। অষ্টাদশ শতকের এই চীনা পটটি অনেক দিক থেকে আকর্ষণীয়।

বাঙলাপট ও লোকধর্ম

বাঙলার লোকসমাজে লোকধর্মের ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মধ্য ও পরমধ্যযুগে এসে ইসলামধর্ম এই সনাতন লোকমানসে স্থান সংগ্রহের প্রবল চেষ্টা সুরু করল। গ্রামবাঙলার সর্বত্র শক্তিসংহতি চাই নাহলে রাজধর্মের প্রসার দূর কথা, অস্তিত্ব সংরক্ষণই কঠিন। বাঙলার লোকধর্মের সহিষ্ণুতা সহাবস্থানী শান্ত মনোভাব রাজশক্তি খুব সহজভাবে নিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত পীর গাজী দরবেশের ধর্মীয় যাদুদণ্ডের সাহায্য নেওয়া রাজশক্তির কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। সন্তরা এই অনুকূল পরিবেশকে যথাসাধ্য কাজে লাগিয়েছেন। তাঁদের সতর্কতা, বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তাতে শাসকবর্গ অনেক খুচরো ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছেন। এইসব সন্তদের মহিমা কীর্তনের সঙ্গে লোকসমাজ বিযুক্ত থাকতে পারেননি। সন্তরাও লোকধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হতে গতিপথ পরিবর্তিত করে খোলা আকাশের নিচে সনাতন থানের ঢঙে নতুন ধর্মীয় থান গড়ে তুলেছেন। বাঙলার পট ও পটুয়ার ধারা এই মধ্যযুগে স্বীয়-ভাবনা ও ধর্মাচরণে আবার নতুন একটা দিকে প্রবাহিত হতে সুরু করে। আজও বিশেষ বিশেষ পীরগাজীর জীবনকথা নিয়ে পটলেখা হয়।

পট ও লিপিকর্ম

জ্যোতিষীদের বিচিত্রিত কোষ্ঠীঠিকুজিও আকারে জড়ানোপটকে স্মরণ করায়। রাশির চিত্র অঙ্কিত থাকে বলেই বোধহয় এর নাম রাশিপট্ট। পুণার শ্রীকেলকারের সংগ্রহে সুন্দর সুন্দর মহারাষ্ট্রী রাশিপট্টের নমুনা দেখা যায়। উত্তর কলকাতার বহু প্রাচীন পরিবারে বাঙলা ধারার রাশি-পট্টের অনেক মূল্যবান নমুনা রয়ে গেছে। দুঃখের বিষয় অমূল্য চিত্রসম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও এখানকার সংগ্রহশালার দৃষ্টিতে এগুলি উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। যেমন পায়নি উল্কিচিত্রের নমুনা নক্শা। উল্কির রেখা মধ্যযুগ থেকে ওয়াশলির দ্বারা সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন। প্রাচীনযুগের উল্কির চরিত্র কি ছিল তা বলা আজ অসম্ভব। কিন্তু দরবারি লিপিবিদের প্রভাব মধ্যযুগে উল্কি ছাড়িয়ে আরও কিছু সামগ্রীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। গত শতকের শেষদিকে এবং বর্তমান শতকের গোড়ায় বাঙলা লিপিও দরবারি ক্যালি-গ্রাফিস্টদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। মানুষ ও নানান জীবজন্তুকে উল্টেপাল্টে বাঙলা লিপি তৈরী করা সেদিন অবধি বিশেষ বাহাদুরির কাজ ছিল। রশীদ চিত্রকরের লেখা এমন দুটি লিপি দেখা গেছে ১. আজ নগদ কাল ধার ২. জয় হিন্দ হরে মুরারে/বেচব নগদ দেব না ধারে। হরেকরকম ভঙ্গিমার বিচিত্র সব মানুষ শোয়া, বসা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় এখানে লিপিকারের প্রয়োজন মতো হাজির হয়েছে। এই লিপিগুলির সঙ্গে স্যার ভি. টি. কৃষ্ণমাচারির সংগৃহীত ওয়াশলির এবং ত্রিচিনাপটের কামদেবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

পট ও পুতুলনাচ

আমাদের দিশি পুতুলনাচের প্রদর্শনীর সঙ্গেও পট প্রদর্শনের মিল আকস্মিক নয়। পুতুলগুলির লেখার সঙ্গে পটের লেখা, পুতুলনাচের মঞ্চ এবং পটের খোপ যেন একই বস্তুর ভিন্ন রূপ মাত্র। অনেকে আরও একটু এগিয়ে বলেছেন. 'তাই পুতুলনাচ থেকে পটচিত্রের আবির্ভাব এ ধরণের উক্তিকে আকস্মিক বা শূন্যগর্ভ মনে করা সঙ্গত হবে না।' কৌশিকী ৮ম-৯ম সংখ্যা ১৩৭৯।

আমাদের পুতুলনাচের পুতুলগুলি যেভাবে রঞ্জিত ও চিত্রিত করা হয় তাতে পটের সঙ্গে তাদের রচনাকৌশলের অভিন্নতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। পটে চরিত্রগুলির অঙ্গসংস্থান অঙ্কনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

হল এই যে, মনে হয় যেন চিত্রসীমার ঊর্ধ্বে বসে কেউ অদৃশ্য রজ্জুর আকর্ষণে পুতুলনাচের কায়দায় তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা নিয়ন্ত্রিত করেছে। আবার তেমনি পটের বন্ধনী বা ফ্রেম, বিশেষত উল্লম্ব খোপের ক্রমিক বিন্যাসে জড়ানো পটের নির্মাণকৌশল দেখলে, পুতুলনাচের মঞ্চসজ্জার সম্মুখভাগের আয়তক্ষেত্রাকৃতি বন্ধনীনির্দিষ্ট মুক্তাংশটির একেকটি খোপকে পৃথকভাবে দেখলে চৌকশপট থেকে তাকে মোটেও আলাদা করে ভাবা যায়না। জড়ানো পটের প্রকোষ্ঠাশ্রয়ী চিত্রক্রমে চরিত্রগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানের ক্রমিক অনুবৃত্তি অনেকটা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন প্রদর্শনীর ঢঙে বিরচিত বলা চলে। এটি পুতুলনাচের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় স্থিরচিত্রের পরম্পরা অনুসরণে পরিকল্পিত। একই চিত্রক্রমের অন্তর্গত দুটি অব্যবহিত প্রকোষ্ঠের চিত্রবিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশেষত, হাতপায়ের অবস্থান এমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে যাতে দুটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে বিষয়গত ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকে। নাচের পুতুলের অঙ্গনির্মাণে যে সাবলীল সঞ্চালনক্ষমতার ও বাস্তবসুলভ নমনীয়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়, পটের চরিত্রসমূহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অনুরূপভাবে আড়ষ্ট ও স্পন্দনহীন। এই কাঠিন্য ও আড়ষ্টতা যে শিল্পীর ইচ্ছাকৃত কৌশলমাত্র, ডৌলসৃষ্টিতে এ তার অক্ষমতা বা নৈপুণ্যাভাবজনিত নয়, সেটা ছবির সমৃদ্ধ অলঙ্করণ ও দুরূহ অঙ্গভঙ্গিমার অনায়াস রূপায়ন প্রভৃতি থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

পট ও চিত্রিত তাস

আরও একটি বস্তু যেটি নেহাৎই খেলার সামগ্রী সেই তাসে পটচিত্রের অনুরূপ ধারার লেখা একসময়ে সর্বত্র দেখা যেত। ১৮৯৫ খৃঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দশাবতার তাস সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে দশাবতার তাসের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল আনুমানিক ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর মল্লরাজাদের আমলে। আদিপর্বে ভৃগুরাম, জগন্নাথ বা বুদ্ধ, বলরাম ও কল্কি এই মানুষ অবতার; নৃসিংহ, কূর্ম, বরাহ আধামানুষ অবতার এবং বামনাবতার—এঁদের লেখা দিয়ে তৈরি হত দশাবতার তাস। এই তাস যুগে যুগে ভারতের সর্বত্র দরবারি লেখা ও লৌকিক লেখা দুরকমেরই হয়ে এসেছে। দরবারি তাসে উপাদান হিসাবে সোনা, রূপো, হাতির দাঁত এবং মূল্যবান্ জহরৎ ব্যবহার করা হত। আর লোকসমাজ ব্যবহার করত গালা, কাগজ এবং কাপড়ের তৈরি তাস। দরবারি তাসে অনেক সময়

চিত্রভাবনা ভিন্ন সুরে বাঁধা থাকত। মহাকাব্যের দৃশ্য, শিকার দৃশ্য এবং দরবার বসার চিত্র দরবারি কলমে প্রায়ই দেখা যেত। লৌকিক কলম পুরাণাশ্রয়ী হলেও কিছুটা স্বাধীন ছিল। তাস সংরক্ষণ পাত্রের লেখার কাজ ও নক্শা এইসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য। দশাবতার, গঞ্জিফা, নহরাস, চিড়িয়া এবং ছাদ প্রধানত এই নিয়েই ছিল আমাদের চিত্রিত তাসের রাজ্য। সর্বভারতীয় দশাবতার তাসে ভাগবতের পর্যায়ক্রম অমান্য করে বিষ্ণুপুর এবং উড়িষ্যা একইসঙ্গে বুদ্ধদেবকে পঞ্চম স্থান দিয়েছে। অন্যত্র ভাগবতানুসারে ওঁর স্থান নবম। তাছাড়া এই দুই স্থানেই বুদ্ধ বলতে জগন্নাথদেবকেই বোঝানো হয়েছে। দক্ষিণের ছাদ তাসে চামুণ্ডেশ্বরী, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতির লেখায় পৈঠান চরিত্র চোখে পড়ে।

পট ও অঙ্গাভরণ

আমাদের অঙ্গাভরণের প্রাথমিক চিত্রণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় লেখার নক্শা ও ধাতুঢালাই, ছেলা এবং ঠোকাই একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে পূর্বভারতে এই প্রাথমিক লেখার কাজ দিশি শিল্পিসমাজ করে এসেছেন। কোন কোন অলঙ্কারের নক্শায় পটুয়ার পটলেখা অবিকৃত অবস্থায় মন্দিরগায়ের নক্শার পাশাপাশি এসে হাজির হয়েছে। আবার পটলেখার অলঙ্করণের সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সনাতন প্রশ্নটি চিরকাল জড়ানো। আঞ্চলিক কারুশিল্প তাই অঞ্চল বিশেষের যাবতীয় কারুকর্মের সঙ্গে পরস্পর নির্ভরতার সুতোয় বাঁধা।

পটের শ্রেণীবিভাজন

আকারের দিক থেকে চৌকো পট আর গোটানে পট এই হল মোদ্দা দুরকমের পট। গোটানো, জড়ানো, লাটাই এবং দোলিয়া বা দীঘল এই সবকটি নামই চালু আছে যে পটের তা সাধারণত ওপর থেকে নিচে খোপে খোপে ছবি দিয়ে ভরা। পর পর খোপের ছবিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন নাটকীয় ক্রমপর্যায় রক্ষা করা হয় তেমনি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা রক্ষিত হয় না। বিচ্ছিন্ন কতকগুলি দৃশ্যসংস্থানের দ্বারা জড়ানো পট লেখা প্রায়ই হয়ে থাকে। বিশেষকরে অবতার জীবনের লীলাপট বা কলিযুগ পটে ক্রম পর্যায়ের কোন বালাই থাকে না। অনেকগুলি পারলৌকিক পটে এবং গোঁসাই পটে ওপর থেকে নিচে না সাজিয়ে লেখাটি

আড়াআড়ি সাজানো হয়। সাঁওতাল ও ভূমিজদের পটে আড়াআড়ি এবং ওপর-নিচে দুরকমের লেখাই দেখা যায়। চৌকো এবং দুরকমের জড়ানো এই তিন পটেই সবরকমের বিষয়বস্তু লেখা হয়েছে। লেখার প্রকাশভঙ্গী সরাসরি এবং তির্যক দুই-ই আছে। তবু দেখা গেছে যুগের প্রয়োজন বা হাওয়া অনুসারে পটুয়াকে নিজ কর্তব্য ঠিক করতে হয়েছে। তার প্রকাশ যেখানে তির্যক হয়েছে সেখানে পটুয়ার সত্তার প্রতিফলন ঘটেছে এমন মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ঐ তির্যক প্রকাশভঙ্গীর সাময়িক বাজার আছে বলেই তাকে ঐ লেখা লিখতে হয়েছে। যেমন সম্প্রতি জড়ানো কলিযুগ পটের তির্যক ভঙ্গিমা প্রায় গ্রাম্য ভাঁড়ামোয় মুক্তি খুঁজছে। একসময়ে কালিঘাট পট ঐ পথেই শুধু কালের হাওয়ার দিকে তাকিয়ে নিজেরা শেষ হয়ে গেছে।

মধ্যযুগ থেকে হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টান এই তিন ধর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন পট আমাদের এখানে লেখা হয়েছে তেমনি যাবতীয় লোকপ্রিয় লোকদেবদেবী পটের বিষয়ভাবনায় সিংহভাগ নিয়ে বসেছেন। সম্প্রতি দেবমাহাত্ম্যমূলক পটের পাশে পাশে ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়ের পটও মোটামুটি বাজার পাচ্ছে। অতিসম্প্রতিকালের রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়েও পট লেখা হচ্ছে। এখনো পীরগাজীর পট, গোঁসাই মাহাত্ম্যপট, পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবী পট, যিশু লীলা পট, রামায়ণ পট, নরনারী প্রেমমূলক আখ্যায়িকা পট, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পট পরিবর্তনের পট, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী পট এবং নেহাৎই লৌকিক দেবদেবী বিষয়ে জড়ানো পট সংখ্যায় অল্প হলেও লেখা হয়ে থাকে। চৌকশের পাট একরকম চুকেই গেছে।

চৌকশ পটের আঞ্চলিক পরিণতি

বাঙলার প্রায় সব পোটো পাড়ায় চৌকশের চিত্রকর কেউ না কেউ সশরীরে বেঁচে আছেন কিন্তু চৌকো পট লেখেন না। এই চৌকশের লেখভঙ্গীর চরম পরিণতি ঘটেছিল কালিঘাটের প্রচলিত কলমে। কালি-ঘাটে যখন চৌকশের বাজার গরম তখন ভারতের বেশ কয়েকটি তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে চৌকশ এক বিশেষ ধর্মীয় পণ্যে পরিণত হয়েছে। আগেকার পাষাণ পট এবং ধাতব পট্ট যেমন তীর্থকেন্দ্রিক পণ্যে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেইরকম বাজার খুঁজে পেয়েছে চৌকশ। তীর্থের আসেপাশে পটুয়ারা বসতি গড়ে তুলেছে। তীর্থস্থানের পট বলতে উড়িষ্যা আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। মধ্য ও উত্তর ভারতের তুলনায় ত্রিচিনাপল্লীর চৌকশ অনেকের কাছে আদরের সামগ্রী। আক্ষেপের কথা, ত্রিচিনাপল্লীর উৎকৃষ্ট চৌকশের নমুনা আজ বিদেশের সংগ্রহশালার অনুগ্রহে মুদ্রিত প্রতিলিপি মারফৎ দেখতে হচ্ছে। অথচ এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ওখানকার কেল্লামন্দিরের দেবদেবী শোভাযাত্রার দিনে চতুর্দিক থেকে ঐ চৌকশের উৎকৃষ্ট নমুনা হাজির হত তীর্থপণ্য হিসাবে বাজার পাওয়ার জন্য। তীর্থপণ্য পট কালিঘাটে এসে যেন মুক্তিস্নান করল। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চিত্রোপজীবী এসে এই ঘাটে তরী বাঁধলেন এবং ত্বরিত পেশল রেখার টানে গড়ে তুললেন এক বিশেষ ধারা। দেখতে দেখতে কালিঘাটে চৌকশের একটি জমানো বাজার গড়ে উঠল এবং কাছাকাছির সমস্ত মেলাতেও কালিঘাট ব্রাণ্ডের চৌকশ উপস্থিত হতে লাগল। প্রথম দিককার শিল্পীদের মধ্যে ভাবনা দাস ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল দাস, নীলমণি দাস এবং বলরাম দাসের নাম আজ সর্বজনবিদিত। পরে দীর্ঘজীবী নিবারণ ঘোষ ও কালী ঘোষের নাম শোনা যায়। বলাই বৈরাগী, বটা পাল, পরাণ দাস এবং খ্যাপা কানাই কালিঘাট কলমের কয়েকজন দক্ষ শিল্পীর নাম। খ্যাপার ছবিতে কাংড়া কলমের অনুকরণ ও পরিবর্তনের কায়দাটুকু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় দ্রুততা কালিঘাট ছবিকে বিশিষ্ট করেছে। হতে পারে ব্যবসায়িক কারণে পটুয়া দ্রুত লিখনে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু তা না হলে আবার কালিঘাটপট ছবির রাজ্যে কোন নামই হতনা। কালিঘাটের বিখ্যাত গণেশ-জননী চিত্রটিকে ধরা যাক। অসম্ভব দ্রুততা এই অতিখ্যাত ছবিটিকে কালিঘাটের প্রায় সব শিল্পীর হাত দিয়ে কোমলতম উচ্চারণ করিয়েছে। এমন কোমল করার ক্ষমতা যে শিল্পীর অধিগত তিনি কি করে সময় বিশেষে মারাত্মক সোচ্চার হতে পারেন তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

কালিঘাট শাখার বিবর্তন

যুগে যুগে ভারতের, বিশেষ করে পূর্বভারতের যেসব আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে সার্বভৌম চিত্ররীতির প্রাধান্য দেখা যায়, বাঙলার চিরায়ত লিখনশৈলী তার নিকটতম আত্মীয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে বাঙলার ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিত্রশিল্পের ধারা বারংবার বহিরাগত প্রভাবের সামনা-সামনি হয়েছে। যেসব সর্বব্যাপী রাজনৈতিক, সামাজিক, এমন কি ধর্মীয়শক্তির প্রভাব যুগে যুগে পল্লীজনপদের বৃহৎ জনগোষ্ঠী জীবনে

গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল, মূলত লোকপ্রিয় লোকশিল্প বলে বাঙলা-কলম তাদের এড়িয়ে যেতে পারেনি। ভাব, রুচি ও পণ্যের আদান-প্রদানে লোকশিল্পরীতির আঞ্চলিক সীমারেখা মুছে যাবার প্রবণতা থেকে থেকেই যেন সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাঙলা-কলমের সঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক কলমের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে একদিকে বাঙলায় যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিকরীতির কিছু ধর্ম সংক্রামিত হয়েছে, তেমনি বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যও বহুল পরিমাণে অঞ্চলান্তরের চিত্রধারায় সঞ্চারিত হয়েছে। এই প্রভাব বিনিময়ের অভিনবত্ব এইখানে যে, বাঙলায় উক্ত প্রক্রিয়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত কোন রাজসভার ছত্রছায়ায় ঘটেনি ; পরন্তু এটি অতীব জটিল, যুগ-যুগান্তব্যাপী, এমন এক গভীরমূল প্রক্রিয়া যে, বাঙলা-কলমের বিবর্তনে ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলের বা কোন্ যুগের চিত্রকলার অবদান কতোখানি তা সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। একথা আরো প্রযোজ্য এই কারণে, বাঙলা-কলমের ওপর ক্রিয়াশীল বহিরাগত প্রভাবগুলি সবসময়ে যে সরাসরি অঞ্চলান্তরের চিত্রশিল্প সঞ্জাত তা নয় ; বরং গ্রাম বাঙলার ঐতিহ্যশাসিত জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত শতসহস্র ভিন্নতর মাধ্যমাশ্রয়ী চারু ও কারুশিল্পের অলক্ষিত যৌথ ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়েই বাইরের প্রভাব প্রায়শ বাঙলা-কলমকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বাঙলায় কোন লোকশিল্পই অন্যান্য শিল্পকলা থেকে বিশ্লিষ্ট ও স্বতন্ত্র হয়ে বিকাশলাভের চেষ্টা করেনি—আমাদের পল্লীজীবনের সাধারণ সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে সুসমঞ্জসরূপে একাত্মীভূত ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে অনুস্যূত গ্রামীণ শিল্পকলার যে ব্যাপক সমাহার যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন চারু ও কারুকর্মে পরিপূরক সহযোগিতার বিস্তৃত নিঃশব্দ আয়োজন সাজিয়ে রেখেছে, পট ও অন্যান্য লেখশিল্প তারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিকশিত হতে পেরে তৃপ্ত থেকেছে। গ্রামীণ শিল্পী ও কারুকৃৎ জীবিকার দায়ে হক আত্মাভিব্যক্তির উপায় হিসাবে হক, কখনো সমাজ-নিরপেক্ষ কিংবা আত্মসর্বস্ব মনোভাব নিয়ে নিজ নিজ চারু ও কারুকর্ম চর্চার কথা কিংবা শিল্পিসত্তার বিকাশের কথা চিন্তা করেননি। ফলে শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতার মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। এই সূক্ষ্ম ও গভীর প্রক্রিয়াতে বাঙলার চিত্রশিল্প অন্যান্য শিল্পের এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন আঞ্চলিক শিল্পধারার প্রভাব সরাসরি আত্মস্থ করেছে।

বাঙলা-কলমের বিবর্তন বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে নবোত্থিত

শহুরে পরিবেশে বিচিত্র ও বিমিশ্রণজাত যে অভিনব রূপান্তরসংসাধিত কালিঘাট শাখা দেখা দিয়েছিল তার গুরুত্ব কম নয়। বাঙলা-কলমের এই নতুন শাখার বৃহত্তম গুণ হল এমন এক ছন্দোময় ও দুঃসাহসী প্রবহমান বহিঃরেখা—যা দৃঢ় ও মিতবাক্ অথচ অতীব কমনীয়, যার আবেদন নিতান্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, এবং বক্তব্য কোন ভূমিকার অপেক্ষা রাখে না।

লোকশিল্প বিশেষত বাঙলার লিখনশিল্পের সহজাত গুণ যে দ্রুতাঙ্কন, তার সঙ্গে আরেকটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সরলতার মিলনে জন্ম নিল এমন এক আশ্চর্য দক্ষ ও বলিষ্ঠ রেখাঙ্কন, যার উপযুক্ত উপমা হল স্ফুরিত বিদ্যুৎরেখা। কালিঘাট শাখার বহিঃরেখা ও তার লিখনশৈলীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেসব শিল্পশৈলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষপ্রভাবে তিলে তিলে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার পরিধি ও বৈচিত্র্য রীতিমতো বিস্ময়কর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই গড়ে ওঠার তিলোত্তমা তত্ত্বে বিন্দুমাত্র সহনশীল না হয়ে এই শাখা-কলমের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেশী-বিদেশী কোন কোন পণ্ডিত কিছু মূঢ় মন্তব্য করেছেন। কোরাসে গলা মিলিয়ে তাঁরা রায় দিয়েছেন, ধর্ম-নিরপেক্ষ চিত্রবস্তুই প্রমাণ করে কালিঘাট-কলম পশ্চিমাস্য। অথচ কালিঘাট-কলমের উৎপত্তির ইতিহাস থেকে একথা স্পষ্ট, নিতান্ত আর্থনীতিক দায়ে এবং কিছুটা বৃহত্তর শিল্পসংস্কৃতির জগতের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে এই শাখা-কলমের পটুয়ারা একটিমাত্র পর্যায়ে সনাতন ধর্মীয় বিষয়ভাবনার সীমা পেরিয়ে ভিন্ন ভাবনায় মগ্ন হবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। বাঙলা-কলমের সামগ্রিক বিষয়ভাবনার তৎকালীন রুদ্ধ পরিধির বিচারে এই পথান্বেষণ নাগরিকতা তথা আধুনিকতার যাদুস্পর্শে সংঘটিত হয়েছিল। ওদিকে ইতিহাস বলে, ধর্ম-নিরপেক্ষ চিত্রবস্তু বাঙলাধারার অতিপ্রাচীন, প্রাচীন, মধ্য ও পর-মধ্যযুগে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও ম্যুজিয়ামের সংগ্রহে কালিঘাট-কলমের নমুনা যা দেখা যায় তা থেকে বাঙলার এই মিশ্রিত লিখনশৈলীর কয়েকটি চিহ্নিত পর্যায় বিভাগ স্পষ্ট হয়। ১. প্রাথমিক পর্যায়ে ভাবনা দাসের ভুষোকালির বহিঃরেখা সম্বলিত পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্র ২. দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশী টেম্পেরা পদ্ধতির ঘন জলরঙে [পণ্ডিতবর্গ কথিত পশ্চিমা জলরঙে নয়] আলোছায়ার খেলা দেখানোর চেষ্টা-সম্বলিত অমৌলিক বিবিধ বিষয়ক চিত্র ৩. মোলারামের রেখা-ছন্দ বাঙলা-কলমে বৈরাগী কর্তৃক রূপান্তর এবং সুখ্যাত নীলমণি, গোপাল ও বলরামের নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ের ভুষোকালির

বহিঃরেখা ও চিত্রবস্তুর পুনঃ প্রবর্তন ৪. ঘন জলরঙে তৎকালীন সামাজিক বিষয়বস্তু এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পশ্চিমা লিখনশৈলীর অনুকরণে বাজারপট লিখন। এই পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় হলেন কালী, নিবারণ, বটা প্রভৃতি ৫ অন্তিম পর্যায়ে পূর্বোক্ত চারিটি পর্বের লিখনশৈলী ও চিত্রবস্তুর অনুকরণ যার নেতৃত্বে ছিলেন রঞ্জনা।

পূর্বভারতের প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পনিদর্শন বরাবরই এসেছে বিক্রয়ার্থে শুধু নয় আরো বিবিধ কারণে। বিদেশী চিত্রের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়ত পটুয়ার মনের আকাশে রঙ ধরিয়েছে এবং গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এইসব বিষয় ও বিচিত্রশৈলীর নির্বাচিত অংশবিশেষের সঙ্গে সনাতন বাঙলা-কলমের মেলবন্ধনের প্রয়াস তাঁরা পেয়ে থাকবেন। কিন্তু সবকিছুর শেষে তা একক বিশিষ্ট, এক কথায় কালিঘাট কলমই হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যয়শীল দ্রুত টানে দ্বিতীয়বার চিন্তার অবকাশবর্জিত রৈখিক রূপায়ণ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এই ক্ষিপ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্রুত কিংবা ব্যাপক চিত্র-উৎপাদনের তাগিদ থেকে এসেছে বলে ধরে নিলে সেটা ধরে নেওয়াই হবে, তার বেশি কিছু নয়। আসলে এই ক্ষিপ্রতা বাঙলা-কলমের শ্রেষ্ঠ অবদান—একটি পরিপূর্ণ অঙ্কনাদর্শ। এই দ্রুততা কোন উপায়মাত্র নয়, উপেয় বিশেষ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, দ্রুতাঙ্কনের নিজস্ব ও ছিমছাম শ্রীর খাতিরে বাঙলা-কলমের সমস্ত শাখাই আবহমানকাল এই অঙ্কনাদর্শের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী, বাঙলা-কলম বিশিষ্ট এখানে। আর কালিঘাটের মিশ্রণলব্ধ শিল্পশৈলী প্রকৃতপক্ষে বাঙলা-কলমের ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকায়ত ও অভিজাত শাখার এক সার্থক ও মহান্ নাগর পরিণতি।

পটুয়া সম্পর্কে একটি নমুনা সমীক্ষা

১৯৭১ এর জানুয়ারি মাসে কালিঘাট পটুয়ার এক নমুনা সমীক্ষা করা হয়েছিল। সেই সংগৃহীত তথ্য থেকে আজকের কালিঘাট পটুয়ার তালিকা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে: ১. সাধন চিত্রকর, রাসবিহারী চিত্রকর, নীহার চিত্রকর। ২. বরেন চিত্রকর, ভোম্বল চিত্রকর, ৩. মানু চিত্রকর, ৪. যতীন চিত্রকর, ৫. পটা চিত্রকর, ৬. গুণদা চিত্রকর। ৭. যতীন চিত্রকর, ৮. সন্ধ্যারাণী চিত্রকর, ৯. মন্মথ চিত্রকর, ১০. পাঁচু চিত্রকর, উদয় চিত্রকর, জহর চিত্রকর। ১১. সত্যবালা চিত্রকর, ১২. নরেন

চিত্রকর, ১৩. বাসনা চিত্রকর, ১৪. কচিরাম চিত্রকর, দুলাল চিত্রকর, ১৫ মানা চিত্রকর, গোপাল চিত্রকর এবং কেষ্ট চিত্রকর। ১৫. মৃত্যুঞ্জয় চিত্রকর, ১৬. শ্রীশ চিত্রকর, রমানাথ চিত্রকর, ননী চিত্রকর, নিখিল চিত্রকর। ১৭. অমরনাথ চিত্রকর। ১৮. ভূতনাথ চিত্রকর। এই আঠারোটি পারিবারিক কর্তানামের কাঁধে সব মিলিয়ে পোষ্য সংখ্যা ১০৫ থেকে ১১০। এঁরা বর্তমানে পুরোপুরি মূর্তিশিল্পী এবং পট কি বস্তু তা জানেন না এমন চিত্রকরসন্তান আজ কালিঘাটে বিরল নয়। পতিচ্যুতির এমন সমাচার বাঙলার সর্বত্র পটুয়া পাড়ায় সুলভ।

ব্যাপক অর্থে পট

আমাদের দেশে পট্ট বা পট অর্থে খোদাই, কোদাই ঢালাই, লেখাই সবরকমের চিত্রণশিল্প বুঝিয়ে এসেছে। পট্ট অর্থে পাট, কাপড় বা কাগজে লেখা চিত্র ধরে নেওয়ার ব্যাপারটি অতি সম্প্রতিকালের অর্থ-সঙ্কোচনের নমুনা। মাঠাই, খোদাই এবং কুঁদকারি কাজে পাথর প্রভৃতি কঠিন তলবিশিষ্ট সামগ্রী যেমন ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি আবার কাঠ, শোলা, মোষের শিঙ, ঝিনুক, শাঁখ, কচ্ছপের পিঠ, সজারুর কাঁটা, পালক, হাতির দাঁত এবং বিবিধ জীবদেহের অবশিষ্ট দিয়ে যুগে যুগে নানাধরণের শিল্পসামগ্রী এদেশে তৈরি হয়েছে।

গজদন্ত শিল্প

সিন্ধুর ব্রাহ্মণাবাদে উৎখননে পাওয়া হাতির দাঁতের দাবার ঘুঁটি সম্ভবত এই শিল্পের প্রাচীনতম নমুনা। মৌর্যযুগের কাঠের সামগ্রীতে অন্যান্য নানা বস্তুর সঙ্গে হাতির দাঁতের পাত ব্যবহৃত হয়েছে। সাঁচী স্তূপের ঠোকাই কাজে বেসনগর বা বিদিশার গজদন্ত শিল্পীদের ভূমিকা উৎকীর্ণ লিপি থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা, প্রাচীন সাহিত্যের পাতা এবং উৎখননে পাওয়া প্রত্নদ্রব্যের সাহায্যে এই শিল্পটির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সব অঞ্চলে সমস্ত যুগে গজদন্ত শিল্পের অস্তিত্বকথা জানা যায়। বাঙলাদেশে পরমধ্যযুগে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে এই শিল্পটি উন্নতির মুখ দেখেছিল। বিদেশে মুর্শিদাবাদী কাজের নমুনা আন্তর্জাতিক শিল্পরসিকদের মুগ্ধ করেছে। মুগল্প কারুকাজের

কাজের সাফল্য নিয়ে ঐ জেলায় অনেক আঞ্চলিক লোককথার চলন রয়েছে।

বরাবর অতিশয় মূল্যবান্ বলে এই শিল্পের ভোক্তার ভূমিকা থেকে সাধারণ লোকসমাজ একটু দূরে থেকেছে। এখানে তার ভূমিকা হয়ত স্বষ্টিকর্তার, কারুকৃতের। মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর ভোগ্যসামগ্রী হওয়াতে এই শিল্পের আয়ু আগাগোড়া অনিশ্চিত থেকে গেছে। তাই কৌলিকবৃত্তির কাজের আওতায় এসেও গজদন্ত শিল্প পুরোপুরি কৌলিক একচেটিয়ার অধিকার পায়নি। সমাজের নানাস্তরে মানুষ সাধারণ বৃত্তি হিসাবে এই শিল্পে কারিগর হয়েছেন। এমনকি ভিন্ন প্রদেশবাসী ও ধর্মাবলম্বীর আবির্ভাবও এক্ষেত্রে কম ঘটেনি।

নিত্যনব সামগ্রীর দিকে বিত্তবানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষণা সময়ে সময়ে ব্যাহত হয়েছে। অতি স্বল্পসংখ্যক ভাস্কর আজ এই শিল্পে নিয়োজিত আছেন। এই অবক্ষয়ের মধ্যেও কিছু শিল্পনমুনা বিদেশের বাজারে উচ্চমূল্যে রপ্তানী হয়। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে শৌখিন দ্রব্যসম্ভার তৈরী করে গিরীশ ভাস্কর, দুর্লভ ভাস্কর, অভিমন্যু ভাস্কর প্রভৃতি খ্যাতকীর্তি শিল্পীরা অগণিত শিল্পরসিককে মুগ্ধ করেছেন। মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক শৈলীকে সর্বতোভাবে ঋদ্ধ করেছেন হরিপদ ভাস্কর, গৌর ভাস্কর, হেমন্ত ভাস্কর, শশি ভাস্কর এবং আরো কয়েকজন। শুধুমাত্র সরকারী পুরস্কার দিয়ে নয়, সত্যিকার সহৃদয়তার সঙ্গে ভাস্করদের বাস্তব সমস্যাগুলি বিবেচনা ও তা নিরাকরণের ব্যবস্থা করতে পারলে এই ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পটিকে নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

দারু তক্ষণ

পাথর ও ধাতুর তুলনায় কাঠের আয়ু সুনিশ্চিত কম তাই প্রাচীন কাঠের কাজের বহু অমূল্য নমুনা আজ আর আমাদের সামনে তেমন নেই। সাহিত্যের পাতা থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে অন্তত মৌর্যযুগে দারু তক্ষণ শিল্প যে উৎকর্ষের চরম রূপ দেখেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সভায় এসে তৎকালের যে বিবরণ রেখেছিলেন তাথেকে জানা যায়, মগধ, বিশেষ করে রাজধানী পাটলিপুত্রের কাঠের কাজের সৌন্দর্যে ও বৈচিত্র্যে সকলেই মুগ্ধ হত। পাটলিপুত্রের নগরপ্রাচীর অগণিত স্তম্ভে ও অসংখ্য তোরণে শোভিত ছিল। মেগাস্থিনিস

বলেছেন, কাঠের স্তম্ভ ছিল ৫৭০ এবং তোরণের সংখ্যা ৬৪। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদটি আপাদমস্তক কাঠের কাজে ভরা ছিল। রাজপ্রাসাদের মধ্যে অসাধারণ কারুকার্যমণ্ডিত শতাধিক স্তম্ভ ছিল, আর যেখানে যা ছিল তা সবই কাঠের তৈরী। এই কাঠের ওপর মূল্যবান্ ধাতুর পাতের কাজ করা থাকত। বর্তমানে প্রচলিত সাদেলীকাজের পূর্বসূরী হিসাবে মৌর্যযুগের ঐ ধাতুর পাতের কাজকে চিহ্নিত করা যায়।

মেগাস্থিনিস তৎকালের পাটলিপুত্রের বর্ণনায় রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর উচ্ছ্বাসের মূল উৎস ছিল ঐ সময়কার কাঠের শিল্পীর অসাধারণ শিল্পবোধ ও দক্ষতা। পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে বুলন্দিবাগে পাটলিপুত্রের নগরপ্রাচীরের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। পনেরো ফুট উঁচু এই উৎখনিত প্রাচীর থেকে মৌর্যযুগের কাঠের ব্যবহার সম্পর্কে কথঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা যায়। পরবর্তীকালের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে কাঠের ব্যবহার বহুলাংশে হ্রাস পেলেও মৌর্যযুগের দারু তক্ষণের বিশিষ্ট শৈলী একেবারে লোপ পায়নি। ভারহুতের প্রস্তর-ভাস্কর্যের ধারা লক্ষ্য করলে অনায়াসে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মৌর্য শৈলীর দারু তক্ষণ শুঙ্গপর্বের এই ভাস্কর্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ভারত-ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি চিহ্নিত পর্বে দারু তক্ষণের উল্লেখযোগ্য কাজের নমুনা রয়ে গেছে। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ রীতির সঙ্গে পরবর্তীকালে ইসলামী ও পাঞ্জাবী রীতি ও শৈলীর সংমিশ্রণে একেকটি আঞ্চলিক রীতি-শৈলীর জন্ম ও বিবর্ধন ঘটেছে। মধ্যযুগে ল্যাটিস বা জালি-পিঁজরার কাজ দারু তক্ষণকে বিশেষ উচ্চাসনে উন্নীত করে। পাঞ্জাবীশৈলী গম্বুজ, ব্যালকনি ও প্যানেল বা তিলি কাজে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ওদিকে কাশ্মীরে যে জালি কাজ প্রচলিত হল তার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সাদৃশ্য শুধু শৈলীগত নয়, রীতিগতও বটে।

বাঙলায় দারু তক্ষণ আসবাব ও দৈনন্দিন প্রয়োজনের বিবিধ সামগ্রী পার হয়ে পুতুল ও মূর্তিশিল্পে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। আজও নতুনগাঁর কাঠের পুতুল বিভিন্ন মেলায় দেখা যায়। পূজামণ্ডপ থেকে মূল দেবদেবীর মূর্তিতে তক্ষণ শিল্পী এখনো বাঙলার আঞ্চলিক কাজের নমুনা রাখেন।

আঞ্চলিক শৈলী দক্ষিণভারতের দারুশিল্পকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। চালুক্যরীতির অপূর্ব নমুনা বেশ কিছু দারুশিল্পে বিধৃত আছে। এছাড়া চন্দনকাঠের তক্ষণে দক্ষিণভারত এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু কাঠের

জিনিসের ওপর হাতির দাঁত, রূপো, শিং বা অন্যান্য বস্তুর কাজ যাকে সাদেলী শিল্পকর্ম আখ্যা দেওয়া হয় সেই কাজে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনায় দক্ষিণভারতের উৎসাহ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এছাড়া কাঠের সামগ্রী চিত্রিত করা নিয়ে এক বিশিষ্ট শিল্পশৈলী দেখা দেয়, দেশভাষায় যাকে কামানগিরি কাজ বলা হয়ে থাকে। এই কামানগিরির কাজে পাঞ্জাবের আধিপত্য অনস্বীকার্য। ত্রিপুরায় কাঠ এবং বাঁশের সংমিশ্রিত কয়েকটি সামগ্রী তক্ষণ ও চিত্রণের মিলনে যথার্থ শিল্পপণ্যে পরিণত হয়েছে।

প্রস্তর-ভাস্কর্য

আমাদের অন্যান্য প্রত্নসামগ্রীর মতো প্রস্তর-ভাস্কর্যের আদিতম নমুনার সন্ধান পাওয়া যায় হরপ্পা ও মাহেঞ্জোদারোতে। হরপ্পার সেই হাত-পা ও মাথা ভাঙা সুগঠিত মূর্তিটি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ভারতের প্রস্তর ভাস্কর্যের প্রাচীনতম নমুনা। এই শিল্প নিদর্শনটির ঋজু বলিষ্ঠ অথচ সাবলীল আবেদন অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবানুগ কোমলতা এই ভাস্কর্যটিকে যে বৈচিত্র্য দান করেছে সেই শৈলীর রেশ বহুকাল পরের মৌর্য ভাস্কর্যে মোটেও দেখতে পাওয়া যায়নি। সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া কয়েকটি মূর্তি দিয়ে ভারতের ভাস্কর্য ধারার সূত্রপাত। মধ্যে দীর্ঘকাল এই ধারার কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্যরাজ দারায়ুস যে প্রস্তর-ভাস্কর্যে নিজ রাজ্য সজ্জিত করেছিলেন অনুমিত হয় সেই প্রভাবে অন্যান্য দেশে আবার প্রস্তর-ভাস্কর্যের প্রচলন ঘটে।

মৌর্য আমল থেকে বৈশালী, নন্দনগড়, সাঁচী, রামপুরা এবং সারনাথ পাথরের স্তম্ভগুলো নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই স্তম্ভশীর্ষে মৌর্যযুগের অপরূপ প্রস্তর-ভাস্কর্যের নমুনাস্বরূপ পাওয়া যায় কতকগুলি প্রাণীমূর্তি। মৌর্যচিহ্নিত প্রস্তর-ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শবাদী রূপায়নের সঙ্গে বৈদেশিক প্রভাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই ভাস্কর্যের কোমলতা ও চাকচিক্য আমাদের দেশের সমজাতের ভাস্কর্যে এর আগে বা পরে আর দেখা যায়নি। শুঙ্গপর্বের প্রস্তর-ভাস্কর্য দেখা গেছে পর্বতগাত্রে, বৃহৎ শিলাখণ্ডে, স্তূপবেষ্টনীতে, তোরণে ও বোধিবৃক্ষের শিলাবেষ্টনীতে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত ভারহুত স্তূপের তোরণ ও বেষ্টনীগুলি এই সময়কার তক্ষণ-ভাস্কর্যের আদর্শ নমুনা। এগুলি ছাড়া ভারহুতে প্রচুর বড়ো আকারের কাজের নমুনা রয়েছে। অগণিত মোটিফ, জাতকের কাহিনীর রূপায়ন এবং

নানান্ লৌকিক পূজার চিত্রসম্বলিত এই স্তূপ শুঙ্গশৈলীর গৌরবের দিক ঘোষণা করে। মূর্তি রূপায়নে ভারহুতের ভাস্কর্যে এক ধরণের আড়ষ্টতা ও কাঠিন্য লক্ষ্য করা যায় সত্য কিন্তু পট বা আলেখ্যর ঢঙে দৃশ্যসংস্থাপনার গুণে সেই আড়ষ্টতা ও কাঠিন্য আমরা লঘু করে দেখতে পারি। শুঙ্গপর্বের বিস্ময়কর শিল্পনমুনা হল সাঁচী স্তূপ। সাঁচীর ভাস্কর্যে সনাতন পটধারার অবলম্বনে যে বুদ্ধ জীবন রূপায়িত হয়েছে তাথেকে সহজে অনুমিত হয় যে শিল্পী তাঁর নিজের পাশে ঐ বিষয়ক পট রেখে তার প্রস্তর সংস্করণ নির্মাণ করেছেন। এই কাজে যে একদল গজদন্ত শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন এমন প্রমাণ অপ্রতুল নয়। ভাজা ও কারলির গুহামন্দিরের আগে উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির উল্লেখ করতে হয়। এগুলি জৈনবিহারের শিল্পনমুনা। কারলির দাতাদম্পতি এবং ভাজার সূর্য ও ইন্দ্র শুঙ্গযুগের প্রস্তর-ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য নমুনা।

কুষাণযুগের প্রস্তর-ভাস্কর্য মূলত তিনটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তক্ষশিলা, পুরুষপুর প্রভৃতি স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিদেশী প্রভাবিত গান্ধার শিল্পকলা, দ্বিতীয় কেন্দ্রেও বিদেশী প্রভাব অব্যাহত ছিল কিন্তু শিল্পভাবনায় সেটি ছিল খাঁটি ভারতীয়, এই কেন্দ্রটি হল মথুরা। তৃতীয় কেন্দ্রটি অন্ধ্র রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যার বিকাশ দেখা যায় অমরাবতীর অপরূপ স্তূপ ভাস্কর্যে।

গুপ্তযুগের প্রস্তর-ভাস্কর্যে ঐ সময়কার ভারতীয় সংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের ছাপ বর্তমান। এতদিন ভারতীয় ভাস্কর্য মোটামুটি বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে বিকাশের পথ খুঁজছিল। গুপ্তযুগে এসে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদ ভাস্করের সৃষ্টি কাজে রসদ জোগালো নবতর বিষয় ভাবনা দিয়ে। আখ্যানমূলক প্রস্তর-ভাস্কর্যের একঘেয়েমি এই পর্বে অনেকটা কেটে গেল। এই সময়কার মথুরা ও বারাণসী কেন্দ্রের মূর্তিগুলিতে যে ভাবসমৃদ্ধ ডৌল ও ধ্যানস্তব্ধ প্রকাশ দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে সাধারণ প্রস্তর-ভাস্কর্য থেকে বহু উচ্চভূমিতে চারণের উদাহরণ। এই নতুন দিগন্তের পরিচয় মেলে মথুরা, সাঁচী, সারনাথ, অজন্তা, কৌশাম্বী দেওগড়. বিদিশা এবং উদয়গিরিতে।

গুপ্তযুগের শেষ দিক থেকে পূর্বভারতের দেবদেবীর মূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রস্তর-ভাস্কর্য এক অভাবনীয় বিস্তৃতিলাভ করে। এই বিস্তৃতি প্রথম লহমায় বলা যায় সারনাথকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা

যার গুপ্তভাস্কর্যের যে নমুনা সারনাথে ছিল তার সঙ্গে পাল-সেন যুগের প্রস্তর-ভাস্কর্যে অমিল কম নয়। গুপ্তযুগের সেই আত্মসমাহিতি পরবর্তী যুগে সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে পরিবর্তে এসেছে মূর্তির অঙ্গে সুষম পরিমিতি এবং আপাত কমনীয়তা। তাছাড়া আগের যুগের সেই স্বাচ্ছন্দ্য বিন্দুমাত্র নেই। আন্তর সৌন্দর্যে যদি সারনাথের ভাস্কর্য চিহ্নিত করা যায় তাহলে বাঙলার দশমোত্তর প্রস্তর-ভাস্কর্য বহিরঙ্গের কান্তিতে বিশিষ্ট। বাঙালীর মূল প্রকৃতি যে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা সেই উচ্ছ্বাসের সুসমঞ্জস মূর্তপ্রতীক হল আমাদের পাল-সেন যুগের প্রস্তর খোদিত মূর্তিগুলি। পরমধ্যযুগ থেকে আঞ্চলিক শৈলীর স্থান অধিকার করে মিশ্রিতশৈলী। প্রস্তর-ভাস্কর্য যেহেতু দরবার ও পুরোহিততন্ত্রের নির্দেশ মেনে চলেছে এবং এই মাধ্যমটি বেশ ব্যয়সাপেক্ষ তাই লোকসমাজ ও তার শিল্পরুচির প্রতিফলন এক্ষেত্রে তেমন দেখা যায়নি।

পোড়ামাটি শিল্প

কাঁচা মাটিকে পুড়িয়ে নিলে যে তার আয়ু বহুগুণ বেড়ে যায় এমন ধারণা অতি প্রাচীনকালে গ্রীস, ক্রীট, সাইপ্রাস ইটালির মতো ভারতের ভূমিসন্তানদের ছিল। সিন্ধু উপত্যকা এবং বেলুচিস্তান থেকে পোড়ামাটি শিল্পের অগণিত প্রাচীন নমুনা পাওয়া গেছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে শিল্পমাধ্যম হিসাবে পোড়ামাটি একসময়ে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। খৃষ্ট-ধর্মীয়সৌধে পোড়ামাটির অলঙ্করণ গৌরবজনক স্থান নিয়ে আছে। ইলেকট্রনিক পুরাতাত্ত্বিক কার্লো লেরিসি ইটালির ভূগর্ভ থেকে পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও রিলিফকাজের এট্রুস্কান নমুনা অজস্র উদ্ধার করেছেন যা পোড়ামাটি শিল্পের একটি গৌরবজনক অধ্যায় স্মরণ করায়। ইটালির এই ধারার পশ্চাদ্‌পট হিসাবে গ্রীসের প্রাচীনতর পোড়ামাটির শিল্পের উল্লেখ করা প্রয়োজন। খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীর এই শিল্পমাধ্যমের নমুনা যা গ্রীসে পাওয়া গেছে, অনুমান হয় ইটালি তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

আমাদের সভ্যতার ধারাবিবরণীতে পোড়ামাটির পাত্র এবং ভাস্কর্য প্রধানতম কীর্তি-নিদর্শন হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। শুধু আমাদের নয়, মিশর ও চীনের প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ধরে রেখেছে পোড়ামাটি শিল্পসম্ভার। আমাদের রঙমহল সংস্কৃতির লাল-কালো মৃৎপাত্রের বিস্তৃতি হরপ্পা পর্যন্ত ঘটেছিল। দক্ষিণভারতে প্রাগৈতিহাসিক বেশ কিছু পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকার দেব বা মানুষের মূর্তিতে পশুপাখির

আকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া দক্ষ শিল্পীর কাজের নমুনা রয়ে গেছে কিছু মুখোশ ও প্রাণীমূর্তিতে, আর আছে হরেকরকম খেলার সামগ্রীতে।

রঙমহল সভ্যতার লাল-কালো মৃৎপাত্রের পর যে মৃৎপাত্র সারাভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহল চিত্রিত ধূসর পাত্র। এই বিশেষ ধরণের মৃৎপাত্রটি সময়ের দিক থেকে আর্যদের অবদান বলে অনেকেই অনুমান করেছেন। হরপ্পা সভ্যতার শেষ দিকে বা ঐ সভ্যতা মুছে যাবার পর চিত্রিত ধূসরের আবির্ভাব এমন অনুমানের সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উৎখননের নিরিখে আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয়নি। এরপর যে মৃৎপাত্র প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় সেটি উত্তরভারতের চকচকে কালো পাত্র। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে শুঙ্গ আমল পর্যন্ত ঐ মৃৎপাত্রের বিস্তার ঘটেছিল। মথুরা, ভিটা এবং তক্ষশিলায় মৌর্যপূর্ব যুগের কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। পাটনা এবং অহিছত্রে মৌর্যযুগের পোড়ামাটি শিল্পনমুনা অজস্র মিলেছে। নিরেট এই মূর্তিগুলি হাতে এবং ছাঁচে গড়া দুরকমেরই আছে।

শুঙ্গ যুগ থেকে পরবর্তীকালের পোড়ামাটি শিল্পের নমুনাসাক্ষ্য ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে এবং এখনো যাচ্ছে। পশ্চিম বাঙলার পুরাতীর্থগুলি থেকে এই পর্যায়ের পোড়ামাটি শিল্পের বিচিত্র নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। বর্ধমানের মঙ্গলকোট, বীরভূমের বাসাপাড়া, মহিষদল, চব্বিশ পরগণার দেউলপাতা, হরিনারায়ণপুর, বোড়াল এবং চন্দ্রকেতুগড়, মেদিনী-পুরের তমলুক, পান্না, বাঁকুড়ার পোখরনা, পশ্চিম দিনাজপুরের বানগড় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে খৃষ্ট পূর্বাব্দের যে সমস্ত পোড়ামাটির সামগ্রী পাওয়া গেছে তার মধ্যে নানা ধরনের মৃৎপাত্র থেকে সুরু করে শীলমোহর, নিরেট মূর্তি, বাড়ী তৈরির ইট, টালি, মাল্যদানা, ফাঁপা পুতুল, ফলক এবং মাছের জালের গুটি প্রধান। এছাড়া বিভিন্ন রকমের মূর্ত ভাস্কর্য ও খেলনা পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে। এই সময়ে বিদেশী মৃৎপাত্র বা বিদেশী প্রভাবে নির্মিত বেশ কিছু মৃৎপাত্রের সন্ধানও পাওয়া গেছে। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলিতে গান্ধারশৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। তমলুক ও চন্দ্রকেতু-গড়ে পাওয়া ডানাযুক্ত মূর্তিতে বিদেশী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কুষাণ আমলের পোড়ামাটি শিল্পের নমুনা হিসাবে কয়েকটি মাথা, কিছু বাদ্যযন্ত্র এবং অগণিত যক্ষিণী মূর্তির উল্লেখ করা যায়। গুপ্তযুগে এই শিল্পমাধ্যমটির সুনিশ্চিত উন্নয়ন ঘটেছিল এবং সর্বভারতীয় স্থাপত্য অলঙ্করণে পোড়ামাটি গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিছু বড়ো

আকারের মূর্তিও এই সময়ে পোড়ামাটিতে রূপায়িত হয়। গুপ্তযুগের শেষ দিক থেকে এই মাধ্যমটির জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে এবং পালযুগে পূর্বভারতের দুই তিনটি রাজ্য ব্যতীত অন্যত্র পোড়ামাটির শিল্পনমুনা প্রায় উধাও হয়। পালযুগের কয়েকটি মন্দিরের অলঙ্করণে ঐ সময়কার শিল্পনমুনা সামান্য বিধৃত আছে। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণে সবচাইতে গৌরবের যুগ সুরু হয়েছে ষোড়শ শতকের শেষ দিক থেকে। মুঘল আমলে নির্মিত হলেও পূর্বভারতের স্থাপত্যে ও অলঙ্করণে পাঠান আমলের সন্ধিপর্বের প্রভাব সব থেকে স্পষ্ট। সম্প্রতিকালে ষোড়শ শতকোত্তর এই সমস্ত দেবায়তন সম্পর্কে কেউ কেউ সরাসরি পাঠানপ্রভাবের কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ঠিক ঐ ধরণের মন্তব্যের দ্বারা এইসব সৌধের বাস্তুবিদ্ ও শিল্পীদের হেয় বা অবজ্ঞা করা যায়না। পরস্পরে প্রভাবিত হওয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নান্দনিক প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষিত হলে বোধহয় অমন হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারটা গৌণ হয়ে যায়।

পাঠান আমলের প্রথম দিকে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাই তৎকালীন সমস্ত সৌধে হিন্দু কারিগরের স্পর্শচিহ্ন বর্তমান। সর্ব ভারতীয় স্থাপত্যে তখনো ইন্দো-সরাসনিক কথাটির আমদানী ঘটেনি। সুলতান কুতুব যখন সন্ত কুতুবুদ্দিনের স্মৃতিরক্ষার জন্য মিনারের কাজ সুরু করেন তখন কিন্তু হিন্দু শিল্পীদের এই কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। ঐ মিনার শেষ হয়েছিল ইলতুৎমিসের সময়ে এবং তখন হিন্দু-মুসলমানের যৌথপ্রভাবের কাজ সর্বত্র সুরু হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ আজমীরের মসজিদটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া এই সময়ে স্থাপত্যশিল্পে যৌথপ্রভাবের যে ধারা প্রবাহিত ছিল তাথেকে আঞ্চলিক শৈলীর রূপ ও রেখা মোটামুটি গতিপথ খুঁজে পেয়েছে। গৌড়, পাণ্ডুয়া, জৌনপুর, মালব, গুজরাট, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে কেন্দ্র করে সুলতানী স্থাপত্যের আঞ্চলিক রীতি ও শৈলী তাদের বিশিষ্টতা নিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন কথাই ওঠেনি, উঠেছে আঞ্চলিক শৈলীর কথা। আলাই দরজার খিলানের অনুকৃতি যৌথপ্রভাবের স্থাপত্যে অনায়াসে গৃহীত হয়েছে, কোন ছুঁৎমার্গী মতামত বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সাংস্কৃতিক মিলনপর্বের এই গৌরবজনক অধ্যায়টিকে স্মরণে রেখে বাঙলার ষোড়শ শতকোত্তর দেবায়তনগুলির আলোচনায় অগ্রসর হলে সম্ভবত প্রভাব বিচারের বাতিক অনেকাংশে প্রশমিত হয়।

স্থাপত্য

মূলত চোখের কাছে আবেদন রেখে যে যে শিল্পসামগ্রী আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে স্থাপত্যশিল্প সেখানেও তার গৌরবাসন বিছিয়ে নিয়েছে। প্রধানত ইট, কাঠ-পাথরকে অবলম্বন করে রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষণায় ধর্মীয় এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ শিল্পসৌধ নির্মিত হয়েছে বেশ কিছু, এছাড়া সাধারণ মানুষের বসবাসের গৃহ ও প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। বলা বাহুল্য, এগুলি নির্মাণের পেছনে নান্দনিক দৃষ্টি সজাগ ছিল।

আমাদের দেশে স্থাপত্য প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে আসবে সিন্ধু সভ্যতার অবদান। উৎখননান্তে যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে জানা যায়, ঐ প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার মানুষ উন্নত নাগর-জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের বসবাস-গৃহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে রান্নাঘর, অতিথি আপ্যায়ন ঘর, এবং সম্ভবত ভৃত্যদের থাকার ঘর নিয়ে দ্বিতল গৃহগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে স্নান ও আনুষঙ্গিক কৃত্যের জন্য স্থপতিরা পৃথক্ চিন্তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা স্থাপত্যের এমন কিছু নমুনা রাখেনি যা থেকে ঐ সভ্যতায় স্থাপত্যের ভূমিকা সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। অনুমিত হয়, আশ্রম সভ্যতায় কাঁচা ঘর-বাড়ী ভিন্নতর আবেদন নিয়ে তৎকালে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি আসতে চেয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার পরে উল্লেখনীয় স্থাপত্যের কথা জানা যায় মৌর্য পর্বে এসে। ষষ্ঠ খৃষ্ট পূর্বাব্দে শিশুনাগ বংশের রাজা বিম্বিসারের সময়ে রাজগীরে পাথরের ঘর-বাড়ী, পাঁচিল এবং বড়ো বড়ো অট্টালিকা তৈরীর কথা আমরা জানতে পারি। এই পর্বের অব্যবহিত পরে বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম-উপপ্লব সাধিত হয় তারই ফলে ভারতের প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধস্থাপত্য নামে এক অভিনব স্থাপত্যধারার আবির্ভাব ঘটে। স্তম্ভ, বিহার ও সর্বপ্রকারের চৈত্যেকে কেন্দ্র করে এই স্থাপত্যধারা বিবর্ধিত হয়। এই ধারার চরম বিকাশ ঘটল গুপ্তযুগের প্রথম দিকে গুপ্তস্থাপত্যশৈলী পূর্ববর্তী বৌদ্ধস্থাপত্যের স্থান দখল করল তার উদার স্থাপত্য আদর্শের দ্বারা। ভারতীয় স্থাপত্যের আবহমানকালের মূলপ্রবাহে গুপ্তধারার ভূমিকা বোধহয় দীর্ঘতম। বস্তুত পূর্বভারতে তুর্কি আক্রমণের কাল পর্যন্ত গুপ্তস্থাপত্যের আদর্শই অনুসৃত হয়েছে।

ভারতীয় স্থাপত্যে দক্ষিণভারতীয় শৈলী একটি সর্বাংশে পৃথক্ বিশিষ্ট শৈলী হিসাবে গণ্য হয়। এই ধারার প্রভাব ভূমি ও কাল সুদীর্ঘ।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দক্ষিণী স্থাপত্যে মূলত পাঁচটি ধারা লক্ষিত হয়। প্রথমটি পল্লবী ধারা, এর কালসীমা সপ্তম শতক থেকে প্রায় দশম; দ্বিতীয়টি চোলধারা, কালসীমা দশম থেকে প্রায় দ্বাদশ শতক; তৃতীয় হল পাণ্ড্যধারা, এর কালসীমা দ্বাদশ থেকে চতুর্দশের মধ্যপর্ব; চতুর্থ হল নগরী বা বিজয়নগর ধারা যার বিস্তৃতি ষোড়শের মাঝামাঝি পর্যন্ত; পঞ্চমটি নায়কীধারা, এর কালসীমা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমাদের স্থাপত্যধারায় মধ্যযুগের নয়নাভিরাম ব্যয়বহুল সংমিশ্রিত শৈলীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। সুলতান আমলের মাঝামাঝি সময়ে এসে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা অনুসারে স্থাপত্যশিল্পের ছয়টি পৃথক্ আঞ্চলিক শৈলী মালবী, গৌড়-পাণ্ডুয়া, জৌনপুরী, বিজাপুরী, গুজরাটি ও গোলকুণ্ডাই নামে অভিহিত হয়। এইসব শৈলীর নমুনা সাক্ষ্য আজও কিছু কিছু রয়ে গেছে। পাঠান ও মুঘলকে একই সঙ্গে ঐস্লামিক স্থাপত্যের জনক হিসাবে গণ্য করলেও এদের সংযুক্ত অবদানের মধ্যে কয়েকটি আঞ্চলিক দরবারী ধারা পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। গড়মানদাই, আমেদাবাদী, দক্ষিণী এবং জৌনপুরীর মুসলীম স্থাপত্যের আঞ্চলিক বিশিষ্টতা কোনওভাবে অস্বীকার করা যায় না। এই আঞ্চলিকতা আর কিছু করুক বা না করুক অন্তত স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক অভিধা মুছে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের শৈলীর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রপট্ট এবং ফা-হিয়েন, হুয়েনসাং প্রভৃতির বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পূর্বভারতেও বহু দেবায়তন, চৈত্য ও বিহার একসময়ে ছিল। এই সমস্ত স্থাপত্য সম্পর্কে প্রযুক্ত বিশেষণগুলির সত্যাসত্য বিচারের আজ আর তেমন সুযোগ নেই। গুপ্তযুগের শেষ দিকেও বাঙলা-দেশে বৌদ্ধদের অনেকগুলি বিহার ছিল, নানাসূত্র থেকে সে তথ্য জানা যায়। কিন্তু ময়নামতী ও পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ এবং রক্তমৃত্তিকার অংশবিশেষ ছাড়া আর তেমন কোন সন্ধান মেলেনা। হুয়েনসাং বর্ণিত পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণের সেই চৈত্যেগুলির কোন সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। শারীরিক ও পারিভোগিক ক্ষুদ্র চৈত্যের কিছু কিছু নমুনা অবশ্য পাওয়া গেছে কিন্তু তা থেকে কোন বিশেষপর্বের' স্থাপত্যশৈলীর সাধারণীকরণ উচিত কাজ নয়। পাল-সেন পর্বের কয়েকটি মন্দির এখনো কোনক্রমে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যা থেকে হাজার বছর আগেও

আমাদের বাস্তবিদ্‌দের অস্তিত্ব আজকের দিনে প্রমাণিত হয়।

গুপ্তস্থাপত্যের প্রভাবকে অঙ্গীকার করেই পরবর্তীকালের পূর্বাঞ্চলীয় স্থাপত্য ঋদ্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে পাল আমলে পূর্বভারতে কিছুসংখ্যক স্থাপত্যশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। পাহাড়পুর, নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদ্দল, ওদন্তপুরী এবং রক্তমৃত্তিকা বিহারের কথা আমরা লিখিত সাহিত্য থেকে জানতে পারি। এর মধ্যে নালন্দা এবং পাহাড়পুরের প্রসিদ্ধি সবচেয়ে বেশি। পাহাড়পুরের একক বৈশিষ্ট্য হল তার বিরাটত্ব। এই সময়কার অন্যান্য দেবায়তনে পাল স্থাপত্যশিল্পীর কাজের নমুনা বিধৃত আছে। গুপ্তযুগের মন্দির দিয়ে বাঙলায় যে স্থাপত্যের আভাস তার পরিপূর্ণ বিকাশ মধ্যযুগের গৌড় ও পাণ্ডুয়ায়।

ধাতব শিল্প

উৎখননে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন ভারতীয় প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে ধাতব সামগ্রীর উপস্থিতি বরাবর আছে। অর্থাৎ ধাতুর ব্যবহার সুরুর পরেই আমাদের দেশের মানুষ দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র থেকে মূর্তি নির্মাণ পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারে ধাতুকে কাজে লাগিয়েছেন। ক্রমে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ধাতুশিল্পের একেকটি আঞ্চলিক ধারা গড়ে ওঠে। রাঢ়বঙ্গে বিভিন্ন স্থানে উৎখননে তামা ও লোহার অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র এবং আরো কিছু ধাতববস্তু পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের অন্তত দেড়হাজার বছর আগে এগুলি তৈরি হয়েছিল।

মূর্তি নির্মাণ ছাড়াও ধাতুশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মুদ্রা প্রস্তুত। অনুমান করা হয় খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে এদেশে প্রথম মুদ্রার আবির্ভাব ঘটেছিল। যদিও আরো প্রাচীনকালের মুদ্রার কথা পরোক্ষ উপায়ে উপায়ে আমরা জানতে পারি কিন্তু তার নিদর্শন কিছু পাওয়া সম্ভব হয়নি। তক্ষশিলা ও সন্নিহিত অঞ্চলের 'বেন্ট বার' মুদ্রাকে আমাদের দেশের প্রাচীনতম মুদ্রার নমুনা বলে ধরা হয়। মৌর্যযুগ থেকে নানা ধাতুর বিবিধ মুদ্রা ভারতের প্রায় সব অঞ্চলে পাওয়া গেছে এবং তাথেকে সহজে এই শিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্ম নেয়। ধাতবশিল্পের মুদ্রা শাখায় গুপ্তযুগ ছিল চরম উৎকর্ষের যুগ।

আফ্‌তবা, তশ্‌ত, সুরাহির, গুলাবপাশ, আতরদান, আসাসোটা প্রভৃতির ধাতু কাজে, মার্তাবনে, জয়পুর ও বেনারসের মিনাকরিতে,

শিল্পভাবনা

দক্ষিণের 'স্বামী' কাজে, উড়িষ্যার পিঁজরাই তারের কাজে, পাঞ্জাবের কোফৎগারি কাজে, বিদরের আঞ্চলিকশৈলীর কাজে এবং দক্ষিণী চালুক্যরীতির কাজে অসাধারণ দক্ষ শিল্পকর্মের নমুনা বিধৃত আছে। গুপ্তযুগ থেকে পূর্বাঞ্চলের নিজস্ব শিল্পশৈলী সর্বভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করে। সারনাথকে কেন্দ্র করে ধাতবমূর্তির এক বিচিত্র বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় যার প্রভাব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন পড়েছিল তেমনি কালসীমা ছিল অতি দীর্ঘ। অবশ্য সারনাথের সমসাময়িক মথুরার শিল্পসম্ভারের কথাও এই সূত্রে স্মরণ করা কর্তব্য। তবে পালযুগের ধাতুমূর্তি মথুরা নয়, পূর্বভারতীয় গুপ্তশৈলীর দ্বারা, সারনাথের শিল্পকৃতির দ্বারা সবিশেষ আচ্ছন্ন ছিল। ভাগলপুরের সেই বুদ্ধ মূর্তি দিয়ে যে দক্ষতার, যে নান্দনিক প্রয়াসের জয়যাত্রা তার গতিপথ আজ নিঃসন্দেহে বহুমুখী। বর্ধমান-বাঁকুড়ার ঢোকরাদের ধাতুশিল্প, পুরুলিয়ার আদিবাসীদের ফাঁপা ঢালাই থেকে গ্রামের কামারশালার কাজে পর্যন্ত প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে কঠিন ধাতববস্তুকে মনোরম ও সুন্দর করে তোলার যে বিপুল আয়োজন ও সাধনা তা ঐতিহ্যের নীরব কিন্তু কার্যকর অবদান ছাড়া কিছুই নয়।

যুগে যুগে পূর্বভারতে অগণিত শিল্পসামগ্রী ধাতুতে নির্মিত হয়েছে। বৃহৎ কারখানার কথা বাদ দিয়েই বলা যায় সোনা-রূপো, তামা, সীসে, কাঁসা, পেতল, লোহা, দস্তা প্রভৃতির কাজে আজও পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য কারুকৃৎ নিয়োজিত রয়েছেন। জেলায় জেলায় ক্রমে এমন শিল্পবৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে যে, খাগড়া, নবদ্বীপ, মুড়োগাছা, বিষ্ণুপুর, ঘাটাল, লোকপুর, বনপাশ প্রভৃতি স্থানের বিশেষ বিশেষ ধাতুপাত্র এক পৃথক্ মহিমা অর্জন তথা রীতিমতো চাহিদার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। লোহার কাজে ঝালদা, কামারপুকুর, বনপাশ প্রভৃতি স্থান উৎকৃষ্ট উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে আজও চিহ্নিত।

বাঙলার বৃত্তিমূলক জাতিবিভাজনের মধ্যে ধাতুশিল্পীদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। যদিও সেই সনাতন সমাজকাঠামোর আর তেমন অস্তিত্ব নেই তবু পূর্বভারতীয় ধাতু শিল্পীরা পূর্বপুরুষদের কীর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখনো এই ধারাটিকে সজীব রেখেছেন। অন্য ক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়ে বলা যায়, সনাতন শ্রম বা জাতি বিভাজন প্রথা ক্ষুদ্র আকারের ধাতুশিল্প সংরক্ষণ ও বিবর্ধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

অলঙ্কার

ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ দেশে অঙ্গসজ্জা বা অন্য কোন কারণে অলঙ্কারের প্রচলন হল তা স্থির নিশ্চিত করে বলা অসুবিধাজনক। তবে এটুকু বলা যায় আমাদের দেশে অন্তত খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ থেকে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু আমাদের দেশে নয় মিশরে, চীনে এবং গ্রীসে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের অঙ্গাভরণ ব্যবহার চলছে।

অলঙ্কারের লক্ষণ

উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রথমেই একথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার—অলঙ্কারের সাধারণ লক্ষণ কি। শুধুমাত্র ধাতু অলঙ্কার তার মধ্যে আবার স্বর্ণালঙ্কারই একমাত্র অলঙ্কার পদবাচ্য—এটি অতি সাম্প্রতিক সংস্কার। অলঙ্কারের দীর্ঘ ইতিহাসে এই পর্বটুকু নগণ্য স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য ধাতুশ্রেষ্ঠ হিসাবে, সর্ব ধাতুসার হিসাবে সোনার যে মর্যাদা তা অলঙ্কারের সঙ্গে এক করে ফেললে আলাদা কথা। ধাতুর ব্যবহার খুব প্রাচীন হলেও মাত্র হাজার দশেক বছর তার বয়স, আর সোনার আবিষ্কার তারও হাজার তিনেক বছর পরের কথা। কিন্তু তারও অনেক কাল আগে থেকে মানুষ অলঙ্কার ব্যবহার করে আসছে, কিছুটা অঙ্গসজ্জার তাগিদে, কিন্তু বেশিরভাগটাই সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বা জবদেহাবশেষ অঙ্গে ধারণ করে অদৃশ্য প্রতিকূল শক্তিকে প্রসন্ন বা শান্ত করার আধিদৈবিক প্রয়োজনে। ইতিহাসধারার এই বিষয়ে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, আদিম মানুষ যখন অঙ্গাবরণের ব্যবহার শেখেনি তখনি কিন্তু অলঙ্কার উঠে গেছে তার অঙ্গে। এই প্রাগৈতিহাসিক অলঙ্কারের উপাদান, বলাই বাহুল্য, উজ্জ্বল ও মহার্ঘ্য ধাতু কিংবা মণিমুক্তা নয়, পরন্তু আধিদৈবিক শক্তিসম্পন্ন আপাততুচ্ছ উপাদান, যেমন, বিশেষ ধরণের ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষনির্যাস, প্রাণীর অস্থি (মাছ, উট, হাতির)। পোড়ামাটির টুকরো, চকচকে রঙীন কাঁচের প্রলেপ লাগানো পুঁতি, হরিদ্রাবর্ণ কঠিন অম্বর বা কৃষ্ণবর্ণ খনিজ জেট ইত্যাদি ধাতু ও রত্নের ব্যবহার পরবর্তীকালের ব্যাপার। অর্থাৎ বলা যায় যে, প্রকৃতির

দান সত্যিকারের ফুল থেকে সুরু করে মূল্যবান্ ধাতু, মণিরত্ন, দগ্ধমৃত্তিকা সবকিছুই অঙ্গাভরণের জন্য আবহমানকাল ব্যবহার হচ্ছে। প্রাণী দেহের অবশিষ্ট, সরাসরি গাত্রচিত্রণ বা রঙ্গোলির মধ্য দিয়েও বহুক্ষেত্রে বিবিধবর্ণের অলঙ্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ইঙ্গিত আরেক গতিপথ খুঁজে পেয়েছে উল্কির মধ্যে। এমন কি চৌকশ পটের বহিঃরেখা যে যে মাধ্যমে এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করছে সাম্প্রতিককালের উল্কি তার অন্যতম।

উৎপত্তির কারণ

মানুষের আদিতম অলঙ্কার যে শোভন, নয়নাভিরাম ধাতুজ কিংবা মণিময় অঙ্গসজ্জা ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। নিছক সৌন্দর্যপ্রেরণা নয়; আধিদৈবিক কারণেই প্রথম যুগের মানুষ তার সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কবচের মত যে অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করত তা ছিল জীবজন্তুর দাঁত, অস্থিপঞ্জর কিংবা কেশাবশেষ দিয়ে রচিত বন্ধনী বা মালা। অঙ্গাভরণের শোভাবর্ধনকল্পে তার বহিরাকৃতির সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য আনয়নে কিংবা বর্ণবৈচিত্র্য সংযোজনে অভিনিবেশ পরবর্তী যুগের সৌন্দর্যবুদ্ধি বিকাশের ফলশ্রুতি। এমনকি সুদৃশ্য মণিমুক্তা ও দ্যুতিমান্ ধাতুর ব্যবহারও সুরু হয় আদিতে ঐ একই আধিদৈবিক সংস্কারের প্রেরণায়। বস্তুত চিরদিনই জড়োয়া ছাড়া আরও একটি পথ ধরে রত্নপ্রস্তর অঙ্গাভরণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা এবং কল্যাণকে স্বাগত জানাতে রত্নপ্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিশ্বাসে আমাদের দেশেও বিভিন্ন যুগে একাধিক রত্ন এবং শেষপর্যন্ত নবরত্ন ব্যবহার ঘটেছে। মানুষের কল্যাণের জন্য সূর্য, শুক্র, কেতু, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র, রাহু, বৃহস্পতি ও শনিকে অনুকূল করতে একেক ব্যক্তির কোষ্ঠী ঠিকুজী বিচার করে নয়টি রত্ন কে কোথায় বসবে তার নির্দেশ দিয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র। এর মধ্যে আবার কোন কোন রত্ন নিয়ে নানান্ জল্পনা দেখা গেছে, কি জানি নীলা ধারণে রাজা হব, না সরাসরি যমরাজের দরবারে হাজির হব। শাস্ত্র বলে, শনিকে কাটাতে নীলা হল অমোঘ মহারত্ন। এসব ছাড়া মিশ্রিত ধাতুঅলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। অনেক দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়েছে মিশ্রিত ধাতুর উপাদানে, তার কোনটি পঞ্চধাতু কোনটি বা অষ্টধাতু ইত্যাদি।

অলঙ্কারের নান্দনিক আবেদন নিরপেক্ষ এবং প্রথা ও বিশ্বাসের উপরে একান্ত নির্ভরশীল অন্যান্য কয়েক ধরণের ব্যবহারের মধ্যেও অলঙ্কারের

উৎপত্তির সাধারণ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, প্রাচীন জ্যোতিষ-শাস্ত্র থেকে আয়ুর্বেদ পর্যন্ত সর্বত্র বিশেষ বিশেষ মণিরত্নকে রোগারোগ্যে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনো অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ত আঙুলে পরেন শাঁখের আংটি কিংবা বাহুবন্ধ হিসাবে লোহা বা তামার তার ব্যবহার করেন। প্রাচীন বিশ্বাস কান ছেঁদা করলে চোখ ভালো থাকে, সেই ছিদ্রিত কানে পরবর্তীকালে বিচিত্র অলঙ্কার উঠেছে। আজও গ্রামের দিকে কোন কোন দরিদ্র পরিবারের অলঙ্কারাভ্যাসে হয়ত শুধুমাত্র কাঠি গোঁজার ব্যবহার আছে. কানের কথায় একটি প্রাসঙ্গিক পুরাণের গল্প এসে পড়ছে। এখনকার অলঙ্কারজগতে বারাণসী ঘরানার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না। সেই বারাণসীর স্নানের ঘাটে নাকি দেবী দুর্গার কানের অলঙ্কার হারিয়ে যায়। হারানো অলঙ্কারের নামানুসারে সেই ঘাটের নাম হয় মণিকর্ণিকা। বর্ণানুযায়ী মণিমুক্তা ও মূল্যবান্ ধাতুর আরোগ্যকারী শক্তি সম্পর্কে চীন, পারস্য, আরব, মিশর, সুমের, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন এবং আজও প্রচলিত বিশ্বাসের কথা এই সূত্রে স্মরণীয়। পৃথিবীর সবদেশেই তুকতাক বা জাদুর সঙ্গে জড়ানো মাদুলি আদিযুগের সংস্কৃতি নমুনা। এইসব ইন্দ্রজাল ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ রঙ বেছে নেওয়ার প্রথা আছে। অথর্ববেদে নীলের সঙ্গে লালের মিশ্রণকে তাৎপর্যপূর্ণ বলা হয়েছে। ওদিকে, হিব্রু ধর্মযাজক লাল আর নীলের মেশানো পোষাক না পরে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন না।

অলঙ্কার প্রসঙ্গে লৌকিক ধারার অবদান

অলঙ্কারের বিবর্তনে বিশেষত এদেশে, লৌকিক ধারার অবদানের কয়েকটি দিকের তাৎপর্য অনুধাবনীয়। অলঙ্কারজগতে লোকায়ত সংস্কৃতির স্বাক্ষর রয়ে গেছে প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে—এক, উপাদান নির্বাচন ও রূপকল্পনায় অর্থাৎ বহিরঙ্গ সাজে ; দুই, অলঙ্কারের ব্যবহার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আচরণবিধি (বিধিনিষেধ) নির্মাণে যার উৎস লোকসমাজের সুদূর ও অজ্ঞাত অতীতযুগ। বিবর্তনের সাধারণ বিধি অনুসারে যেমন সমাজের কোন কোন স্তরে কোন কোন রীতি বা প্রণালী একটি বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে গেলে আর রূপান্তরিত হতে চায়না এবং কালক্রমে এক সনাতন ও অক্ষয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী মর্যাদা লাভ করে সমাজের পূজো পেতে থাকে, অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায় যে সমাজের অন্যান্য অংশে অলঙ্কাররীতির

বহুল বিবর্তন ঘটে চললেও সমাজের একটি বৃহৎ অংশ কমবেশি সেই প্রাচীনতম অলঙ্কারাভ্যাস বাঁচিয়ে রেখে চলেছে, কিছুটা অর্থনৈতিক কারণে, কিন্তু অনেকটাই ঐতিহ্যমুখী অনড় অভ্যাস ও সংস্কারের দায়ে। আবার এই সংস্কারের ঢেউ কিছুটা চেহারা পাল্টে সমাজের অগ্রসর স্তরগুলিতেও জায়গা করে নিয়েছে দেখা যায়। তবে মানবজাতির প্রাচীনতম অলঙ্কারাভ্যাসের অবিকৃত বাহু অনুসৃতি লোকায়ত সমাজেই বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ এখনো সেইসব প্রাকৃতিক সম্পদসৃষ্ট বা প্রাণিদেহাবশেষ নির্মিত অলঙ্কার পরিধান করা হয় যা লোকসমাজের আদিতম পূর্বপুরুষ অঙ্গে ধারণ করতেন। অবশ্য সুযোগ পেলে কৃত্রিম অর্থাৎ প্রাগ্রসর সমাজের অলঙ্কারের সুলভ অনুকরণও ঘটে যায়। তবু বলব, লোকসমাজ অঙ্গপ্রসাধনে প্রকৃতির দানের উপরেই বেশি নির্ভরশীল, এমনকি প্রথাগত কৃত্রিম গহনা ব্যবহারের মধ্যে তাদের যে মনোভাব ও অভীপ্সা ফুটে ওঠে তার সঙ্গে অভিজাত-বিদগ্ধ-নাগরজনের পরিশীলিত ও কৃত্রিম রুচিবোধ ও পারিপাট্যপ্রিয়তার চারিত্রিক প্রভেদ ঐকান্তিক।

লৌকিক নকশা ও মোটিফের সার্বভৌম প্রাধান্য

এখনো পর্যন্ত এ দেশের সামগ্রিক অলঙ্কার সম্ভারের মধ্যে তুলনামূলকভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপাদানসৃষ্ট লোকায়ত অলঙ্কারের অনুপাত ঢের বেশি হলেও অলঙ্কার শিল্পের বিবর্তনে লোকায়ত ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান উপাদানের বৈচিত্র্যে নয়, যদিও তা তুচ্ছ করে দেখার মত নয়। এমনকি সাধারণভাবে দেখতে গেলে মূল্যবান্ ধাতু বা প্রস্তালঙ্কারে লোকায়ত শিল্প হয়ত তেমন কিছু সৃষ্ট হয়নি, কিন্তু লোকসমাজের ব্যবহার উপযোগী অলঙ্কার যে তৈরি হয়নি তা নয়। আমাদের অলঙ্কার ধারায় লোকশিল্পীর অবদান স্বল্পমূল্যের অলঙ্কারের মধ্যে প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়েছে। এইসব সুলভ অলঙ্কারের ব্যাপক প্রচলনের পেছনে রয়েছে আমাদের সর্বস্তরে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের অলক্ষিত ব্যাপক প্রসার। কিন্তু লৌকিক শিল্পরীতির যেটি সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অবদান, তা হল অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অনুকরণে এমন কয়েকটি চিরন্তন ও উদ্দীপক নকশা ও মোটিফের সৃষ্টি যা অভিজাত ও প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারশিল্প শুধু গ্রহণই করেনি উপরন্তু পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও বিন্যাসান্তরের সাহায্যে তাদের গৌরব এমনি বাড়িয়ে দিয়েছে যে গভীরভাবে অনুধাবন না করলে তাদের লোকায়ত উৎস

আমাদের নজরে আসে না। লৌকিক অলঙ্কারের অন্যতম প্রধান উপাদান ফুল ও লতাপাতা। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ফুল বা পাতার আকৃতি অনুকরণ করে কতো যে ধাতুময় ও মণিমুক্তাখচিত অভিজাত অলঙ্কার হয়েছে তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রাচীন শিরোধার্য অলঙ্কারের মধ্যে মাল্য ছিল ফুলের মালারই ধাতব অনুকৃতি ; ললমক ছিল তিন সারি সোনার পাতা দিয়ে তৈরি নক্ষত্রশোভিত মাল্যবিশেষ, আর আপীড় হল সিঁথির উপরে বিলম্বিত হার। ললাটের ঠিক ওপরে শোভা পেত পিপুল পাতার অনুকরণে রচিত সোনার হংসতিলক। চূড়ামণ্ডন ও চূড়িকা হল যথাক্রমে পদ্মপাতা ও পদ্মফুলের মত দেখতে শিরোভূষণ। মুসলমান আমলে উত্তরভারতে শিসফুল, চৌঙ্ক বা ছোটিফুল নামে যে গোলাকৃতি উচ্চাবচ শিরোভূষণটি ললাটের ওপর কেশের শোভা বর্ধন করত তা ছিল চন্দ্রমল্লিকার অনুকরণে খাঁজকাটা। একটি খাঁটি বাঙালী চুলের কাঁটার নাম হল পান কাঁটা। কর্ণভূষণের অধিকাংশ আবার ফুলের অনুকরণে রচিত প্রাচীন কর্ণপুর বা তার আধুনিক সংস্করণ যথা কর্ণফুল, চম্পা, ঝুমকা, ঝাঁপা ইত্যাদি গহনা পুষ্পাকৃতি। ঝুমকা এসেছে ধুতুরা ফুল থেকে, চম্পার পরিচয় তার নামেই। যাবতীয় ঘণ্টাকৃতি কর্ণাভরণ আসলে পদ্মফুলকে উল্টে দিলে যেমন দেখায় তারই অনুকরণে রচিত। পদ্মকোরকের সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে কাশ্মীরের রক্তাভ শঙ্খসদৃশ কর্ণভূষণে। বাঙলার পিপুলপাতার নামটিও অবিকৃত রয়েছে। প্রাচীন প্রথাগত অলঙ্কার কর্ণিকা হল তালপত্রের হৈম অনুকরণ। এক সময়ে কচি তালপাতার কর্ণভূষণ জনপদবধূর লাবণ্যকে মনোরম করে তুলেছে। আজও লোকসমাজে ও আদিবাসীসমাজে এর বহুল প্রচলন রয়েছে। ওদিকে নেকলেস জাতীয় হারটি লোকায়তধারার কাছে ঋণী। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার আধিবাসারা যে ধরণের টুকরো ঘাস গেঁট বেঁধে হারের মত করে গলায় পরে, আমাদের অভিজাত গহনা নেকলেসে তার প্রভাব প্রমাণিত সত্য। উত্তরভারতের চম্পাকলি বা তার সহজ সংস্করণ জওয়াহর-এ চাঁপাফুলের মত ছোট ছোট পেণ্ডেন্ট থাকে। বাঙলায় কামরাঙা হার কামরাঙা ফলের আকৃতি অনুসারী। বাঙালীর খাঁটি কটিভূষণ বটফল ও নিমফলের বেলাতেও একই কথা। রূপোর তৈরি পিপুলপাতার যে কটিভূষণ অভিজাতসমাজে চালু আছে তা ভারতের কোন কোন আদিবাসীসমাজে প্রচলিত অনুরূপ পিপুলপাতার পোষাক বা অলঙ্কার থেকে আহৃত। গোড়ালিতে পরবার নূপুরজাতীয় অধিকাংশ গহনাই

আসলে পাকানো ঘাসের তৈরি লোকায়ত গহনার পরিমার্জিত উন্নত সংস্করণ। বাঙলার নিজস্ব গহনায় বহুবিধ শস্যদানার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন মটরমালা হার, যবদানা ব্রেসলেট, চালদানা ব্রেসলেট, খোয়ে-নো ব্রেসলেট (খৈ সদৃশ), লবঙ্গদানা ব্রেসলেট ইত্যাদি।

বস্তুত, অভিজাতধর্মী ও লোকায়তধর্মী অলঙ্কার উভয়েরই উৎসস্থল একই এবং মূলত একই ঐতিহ্য উভয়কে পুষ্ট করেছে। তাই এই দুই ধারার মধ্যে মাঝেমাঝেই ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছে। বাহ্য গঠনচাতুর্য ও পরিপাট্যের বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সেটা ছাপিয়ে এক মৌলিক আত্মীয়তা সহজে অনুভব করা যায়। অভিজাত অলঙ্কার শিল্প যেখানে আদিম অলঙ্কার-উপকরণকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, শুধু তাদের থেকে সংগৃহীত মৌল নকশা ও মোটিফগুলি নিয়ে নব নব সৃষ্টির কৌশলে মেতে উঠেছে, লোকায়ত শিল্প সেখানে বড়ো জোর সুলভ ধাতু ও উপকরণের সাহায্যে ঐ সব আকরস্বরূপ প্রাকৃতিক নকশা ও মোটিফের অমার্জিত ও অনিপুণ অনুকরণেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি অনেকক্ষেত্রে এখনো লোকসমাজ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে অলঙ্কারের সাধ মেটায়। এখনো গাছের বীজ, কাঠ, নির্যাস, পাতা, শস্যদানা, এমনকি কার্পাস, রজন, শোলা, নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অলঙ্কার রচিত হয়—সেই নির্মাণ কাজে কৌশলগত উৎকর্ষ না থাকলেও লোকশিল্পীর সহজ সরল সৌন্দর্যবোধ, অনাড়ম্বর শিল্পরুচি এবং সর্বোপরি সুনিশ্চিত নিজস্বতার ছাপ গায়ে মেখে তা এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করে। কাঠের তক্ষণে বিচিত্র সব লৌকিক কণ্ঠাভরণ তৈরি হয়েছে। অভিজাতধর্মেও রুদ্রাক্ষ, তুলসী এবং ঘুণির দানা এসে গেছে। অভিজাত সমাজে ঐ ধরণের লোকায়ত অলঙ্কারধারার এই অনুপ্রবেশ অবশ্য শুধু শিল্পসৌন্দর্যের খাতিরেই ঘটেছে তা নয়। আসলে এই জাতীয় প্রভাববিস্তারের মূলে রয়েছে এমন কতকগুলি গভীরমূল বিশ্বাস ও সংস্কার যার উৎস মানবসমাজের শৈশবকালীন ভয়-ভাবনার ইতিহাসে লুকানো থাকলেও যাকে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় এখনো লালন করে চলেছে সাধারণভাবে লোকায়ত সমাজ এবং বিশেষভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়।

অভিজাত অলঙ্কারবিধির উপর লৌকিক সংস্কারের গূঢ় প্রভাব

এই সংস্কার এবং বিধিনিষেধের মধ্যে কোন কোনটির গূঢ়, অলক্ষিত আবেদন অভিজাতসমাজের অবচেতনমানসে যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত ও

সক্রিয় হয়ে আসছে। এই জাতীয় সংস্কারাদি সামাজিক ব্যবধান নির্বিশেষে অলঙ্কার ব্যবহারের মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে বিধিনিষেধগুলি অভিজাতধর্ম নির্দেশিত বলে মনে হলেও এরা আসলে সেই অন্ধকার অতীতের স্মৃতিচিহ্ন যখন মানুষ অজানা অচেনা বিরূপ শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণে তার পার্থিব অস্তিত্ব যে সদা বিপন্ন এই আশঙ্কায় অনেক আপাত অর্থহীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অধীন হয়ে পড়েছিল। হয়ত বা যে ধরণের আধিদৈবিক সংস্কার তাকে আত্মরক্ষার্থে কবচস্বরূপ অলঙ্কার পরিধানে উৎসাহিত করেছিল, তারই স্বগোত্র কোন সংস্কার বা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার পরিধান বিষয়ে কিছু কিছু বিধিনিষেধ রচনা করেছিল। পরবর্তী যুগে অভিজাতধর্ম এগুলিকে সামান্য পরিশোধন করেছে হয়ত, কিন্তু আদৌ নাকচ করতে পারেনি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যুগে যুগে আমাদের দেশে লোকায়ত সমাজের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় অনুশাসন প্রচলিত ছিল। এই অনুশাসন থেকে পরবর্তীকালে অনেকগুলি সংস্কারের জন্ম হয়। কিছু কিছু সংস্কারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়ত আমরা দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয় না। অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কয়েকটা প্রাচীন বিধিনিষেধ নজরে আসে। বিয়ের আংটি সংক্রান্ত অজস্র বিধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালু আছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত অনন্ত বিছা, বাঙলার নোয়া, মাদ্রাজের থালি, কুর্গের পুঁতিমালা কোন কুমারী বা বিধবার অঙ্গে ওঠা নিষেধ। এই সূত্রে কোন কোন অলঙ্কারের অতীতকথা ও জন্মবৃত্তান্ত এসে পড়ে। লৌহবলয়কে মেয়েদের বন্দীদশার চিহ্ন বলা ঠিক কি না, যাবতীয় পদাভরণকে বেড়ি বলা শোভন কি না, বাহুবলয় রোম ও গ্রীসের যোদ্ধাদের ব্যবহার সামগ্রী কি না, আংটির প্রাচীন ব্যবহার নামমুদ্রা বা পাঞ্জাতে সীমাবদ্ধ কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তত্ত্বের পাহাড় তৈরি হতে পারে। আমরা বিধিনিষেধ প্রসঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান সমাজেও এর অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। বাদশাহের অনুপস্থিতিতে বেগমের নথ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এছাড়া সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে অলঙ্কার সম্পর্কিত কয়েকটি সংস্কার বিধিনিষেধের পর্যায়ে পড়ে।

লোকায়ত অলঙ্কার

এই প্রসঙ্গে লোকায়ত অলঙ্কারের লক্ষণ ও বিশেষ করে প্রথাবদ্ধ

অভিজাতধর্মী অলঙ্কারের সঙ্গে তার চারিত্রিক পার্থক্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। লৌকিক অলঙ্কারের মৌল বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করতে গিয়ে আমরা তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়বিধ তাৎপর্যের দিকে নজর দিতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে লোকায়ত অলঙ্কারকে বাহ্য লক্ষণ দিয়ে চেনার প্রবণতাটা সহজে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। এই হিসাবে, যে অলঙ্কারের উপাদান সহজলভ্য, স্বল্পমূল্য, প্রকৃতিজ বা প্রাণীজ এবং যার নির্মাণশৈলী সূক্ষ্ম-মার্জিত রূপসৃষ্টির প্রয়াসবিবর্জিত, অর্থাৎ এককথায় যা প্রকৃতির কাছাকাছি বা কৃত্রিমতামুক্ত, তা-ই লোকায়ত অলঙ্কার। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই লক্ষণ-বর্ণনও তেমন গ্রাহ্য মনে হয়না। একদিকে লোকায়ত সমাজ যেমন ধাতু ও অন্যান্য কৃত্রিম উপাদানের অলঙ্কার এমনকি প্রথাবদ্ধ পদ্ধতিতে নির্মিত অলঙ্কার পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে অথচ ভিন্নতর কারণে তা তথাচ লোকায়তিক অভিধাচ্যুত হয়না; অন্যদিকে তেমনি অভিজাত সমাজও নিগূঢ় কোন সংস্কার বা বিশ্বাসের বশে প্রাকৃতিক উপাদাননির্ভর অলঙ্কারের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে বটে, কিন্তু সেই অলঙ্কার ব্যবহারে মানসিকতার বৈগুণ্যে তা লোকায়ত চরিত্র হারাতে পারে। পক্ষান্তরে বিত্তপ্রদর্শন বা সঞ্চয়াভিলাষের প্ররোচনায় যে পল্লীবাসী জোতদার পরিপাটি, স্বল্পায়তন ও কারুকার্যসমৃদ্ধ অলঙ্কার না গড়িয়ে ভারী, মোটা সোনার চেন বানায়, তাকে রুচি ও মানসিকতার দিক থেকে লোকায়তপন্থী বলেই চিহ্নিত করা সঙ্গত। আর একটি সম্ভাব্য বাহ্য লক্ষণ হল অলঙ্কার ব্যবহারকারীর আর্থিক সামর্থ্য ও তার বাসস্থানের পটভূমিকা। একথা মনে করা বিচিত্র নয়, লৌকিক অলঙ্কার যারা অঙ্গে ধারণ করে তারা দরিদ্র ও সামাজিকভাবে অনুন্নত, অথবা শেষোক্ত শ্রেণীর লোক যে অলঙ্কার পরে তা নিতান্তই লোকায়ত। অনুরূপভাবে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে অভিজাত প্রথাবদ্ধ ধাতুরত্নাদি নির্মিত অলঙ্কারের এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথাও মনে আসতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর অলঙ্কারের সঙ্গে ব্যবহারকারীদের আর্থিক সামর্থ্য বা অবস্থার উক্তরূপ যোগসূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান হলেও তা অপরিহার্য ও আবশ্যিক নয়। অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চন ব্যক্তিও অভিজাত অলঙ্কারের সেবায় আংশিকভাবে হলেও উদ্যোগী হতে পারে, আবার ধনাঢ্য ব্যক্তি কারণবিশেষে লোকায়ত অলঙ্কারের দিকে ঝুঁকতে পারে। অনুরূপভাবে লোকায়ত অলঙ্কারকে গ্রামের বা লোকালয় বহির্ভূত অঞ্চলের অধিবাসীর জন্য নির্দিষ্ট এবং অভিজাত

অলঙ্কারকে নাগরিকবিলাসের বিশিষ্ট করণ বলে মনে করাটাও সর্বাংশে নির্ভুল হবেনা। প্রকৃতপক্ষে, পল্লী ও নগর নামক জনপদশ্রেণীতে যারা বসবাস করে তারা সকলেই যে নিরঙ্কুশভাবে জনপদের শ্রেণী চারিত্র্যের দ্বারা আক্রান্ত বা আবিষ্ট একথা বলা চলেনা। শহরের মূলকেন্দ্রে বাস করেও লৌকিক মানসিকতা, রুচি ও সংস্কারাদি লালন করা কিছু মানুষের পক্ষে যেমন সহজ, স্বাভাবিক বা অনিবার্য, তেমনি গ্রামীণ জীবনযাত্রার সাধারণ ধারাকে অতিক্রম করে বা পাশ কাটিয়ে কোন কোন বিশিষ্ট রুচি পল্লীবাসী নাগরধর্মের দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে। এককথায়, মন-মেজাজ-রুচি প্রভৃতির বিচারে শহরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ ছিটমহল ও অনুরূপভাবে গ্রামের মধ্যেও নাগর ছিটমহলের অস্তিত্ব সহজেই কল্পনীয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাজনে বাহ্য বৈশিষ্ট্য খুব নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। লোকায়ত অলঙ্কারের প্রকৃত লক্ষণ তার আন্তর তাৎপর্যের মধ্যেই নিহিত আছে। এই জাতীয় অলঙ্কার মূলত এক বিশেষ ধরণের জীবনচর্যার অভিব্যক্তি। ঐ জীবনধারার অন্তর্নিহিত ভাবের নিগূঢ় প্রভাবই লৌকিক অলঙ্কারের নির্মাতা ও ভোক্তা উভয়কেই প্রণোদিত করে এবং ফলত এই অলঙ্কারের অবয়ব, ভঙ্গী ও পরিধানশৈলী এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করে।

লোকায়ত অলঙ্কারের তথা লোকায়ত শিল্পের বৈশিষ্ট্যাত্মক মানসিকতা বলতে বোঝায়, উৎপন্ন দ্রব্যটির সঙ্গে ব্যবহারকারীর সৃষ্টিমূলক ও ব্যক্তিগত যোগ থেকে উদ্ভূত এক নিবিড় আত্মীয়তা ও মমতার নিজস্ব বোধ। অলঙ্কার সমেত যাবতীয় লোকশিল্পের উৎস যে ধূসর অতীতে সেই শৈশবযুগে মানুষ তার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনভারের সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহস্থালীর ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ সমগ্র বাসপরিবেশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার দায়ও নিজের কাঁধে রেখে দিয়েছিল। এই নান্দনিক কাজে তার সহজাত কল্পনাশক্তি, সরল দক্ষতা ও নিজস্ব রুচির এক সাবলীল সমাহার ও সহযোগ ঘটত; সমাজব্যবস্থার সেই উষাকালে কোনরকম সামাজিক নান্দনিক মান বা রুচির বিকাশ ঘটার বিলম্বের জন্য স্বীয় অঙ্গ, সামগ্রী ও পরিবেশের সৌন্দর্যবিধানার্থে প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ধারণা, রুচি ও সামর্থ্যের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হত। ফলে পরিস্থিতির কল্যাণে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তি ও নান্দনিক অভিরুচি উন্মেষের সুযোগ পেত। বিনিময়প্রথা উদ্ভবের প্রাক্‌পর্বে স্বসৃষ্ট মণ্ডনকৃতি আত্মতৃপ্ত্যর্থে নিয়োজিত

হত। এই প্রাতিস্বিক আত্মমুখাপেক্ষী রচনাই লোকশিল্পের মূলধর্ম। সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে আত্মকেন্দ্রিক উৎপাদনের প্রয়োজন বা অবকাশ বহুলাংশে হ্রাস পেলেও বিশেষ করে আমাদের দেশে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো, পাল-পার্বণ ও অনুষ্ঠানাদির বিবর্তন এমনভাবে হয়েছে যে তাদের যোগফল লোকশিল্পের বিশিষ্টতা সংরক্ষণ ও সংবর্ধনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

ভারতীয় অলঙ্কারের ইতিবৃত্ত : সূত্র

ভারতবর্ষে অলঙ্কারের ইতিহাস অন্তত পাঁচ হাজার বছর পুরনো। এদেশের আর্দ্রোষ্ণ জলবায়ুতে গায়ে জামাকাপড়ের বোঝা না চাপিয়ে অলঙ্কারের বাহুল্যই মানায় ভালো। এখানে অলঙ্কারের উপাদান যেমন ছড়ানো, এদেশের মানুষ তেমনি প্রাচীনকাল থেকে আত্যন্তিক অলঙ্করণ-প্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। বহু বিচিত্র জাতির সমাবেশে এবং বহিরাগত সংস্কৃতির ঘাত অভিঘাতে এদেশের অলঙ্কারশিল্পে বৈচিত্র্য এসেছে। তবু, ইতিহাসে অন্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য বিরাজমান। এই ঐক্য শুধু দেশগত নয়, কালগতও বটে। যুগে যুগে ভারতের আলঙ্কারিক প্রতিভা কতকগুলি প্রধান প্রধান আকর শিল্পনমুনাকে নতুনভাবে বিকশিত করার সাধনায় সার্থকতা লাভ করতে চেয়েছে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে তাই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রচিত হয়েছে। এরও পেছনে রয়েছে সেই সনাতন দুরপনেয় ঐতিহ্যপরায়ণতা।

আমাদের দেশের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কিত ধারণা প্রধানত দুটি পথে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। প্রথম পুরাতত্ত্বের সাহায্যে, দ্বিতীয় সাহিত্যপাঠে। মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খনন কাজে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের অঙ্গে যে সব অলঙ্কার আছে সেগুলি অর্থাৎ পরোক্ষ ধারণা, যে সব অলঙ্কার সরাসরি পাওয়া গেছে এবং তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মাল্যদানা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ধারণা, ওদিকে ঋগ্বেদ থেকে সুরু করে প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থে দেবদেবীর অলঙ্কার বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার অঙ্গাভরণ, মৌর্যযুগ থেকে সুরু করে প্রাগাধুনিককাল পর্যন্ত দীর্ঘদিনের বহুবিধ মূর্তিতে উৎকীর্ণ অলঙ্কার—সব মিলিয়ে অলঙ্কারের ধারা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এছাড়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, প্রায় সবকয়টি মঙ্গলকাব্যে, পুঁথি

ও পটচিত্রণে এবং ধর্মীয় তিলক ও গাত্র আলপনায় অলঙ্কারের অনুসন্ধান চলতে পারে।

সাহিত্যে অলঙ্কারের উল্লেখ

বেদে নিষ্ক নামে একরকম হারের উল্লেখ আছে। স্বর্ণরচিত স্রক্ বা মালারও উল্লেখ পাওয়া যায়। গোভিলের গৃহ্যসূত্রের এক টীকা অনুসারে স্রক্ বলতে পুষ্পরচিত শিরোভূষণ এবং স্বর্ণময় কণ্ঠাভরণ দুইই বোঝাত। অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে আছে যে, শিক্ষা সমাপন অন্তে ব্রহ্মচারী যখন গুরুর কাছে বিদায় নিতে উপস্থিত তখন তাঁর অঙ্গে শোভা পাচ্ছে রত্নখচিত কণ্ঠহার ও দুটি কর্ণভূষণ। কঠোপনিষদে বহুরূপযুক্ত সৃঙ্কা নামক হারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি যাবতীয় অলঙ্কারের তালিকা দিয়েছেন, স্বর্ণকার যদি সোনায় ভেজাল দেয় অথবা তার কারিগরীতে যদি কোন দোষ ধরা পড়ে তাহলে সেই কারিগরের সামাজিক শাস্তি কি হবে মনু তা সবিস্তারে বলেছেন। রামায়ণে সীতার অঙ্গে বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময়কার অলঙ্কারের শিল্পগত মান ছিল খুবই উন্নত। রামায়ণে উল্লেখিত অলঙ্কার হার, হেমসূত্র, রসনা, অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয় এবং কেয়ূর প্রভৃতি আজও কোন না কোন নামে চালু আছে। লঙ্কার রমণীকুল পরতেন বৈদূর্যমণি ও হীরকখচিত স্বর্ণকুণ্ডল। অঙ্গদ ও কুণ্ডল ছিল স্বর্ণনির্মিত এবং তাদের যথাক্রমে 'বিচিত্র' ও 'শুভ' এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অঙ্গাভরণকে সাধারণভাবে 'আবেধ্য' যেমন কুণ্ডল, 'বন্ধনীয়' যেমন অঙ্গদ, 'ক্ষেপ্য' যেমন নূপুর ও বস্ত্রাভরণ এবং 'আরোপ্য' যেমন হেমসূত্র ও বিবিধ হার—এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া মস্তক, কর্ণ, গ্রীবা, আঙুল, কটিদেশ ইত্যাদির জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যবহার্য নানান্ আভরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসা ও আভরণ ধারণ উভয় উদ্দেশ্যে বালকের কর্ণবেধের কথা আছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে একটি কর্মচঞ্চল গহনার দোকানের ঐ যুগের এক অতি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে। শকুন্তলার আংটি, কালিদাস এবং অন্যান্য কবিদের বর্ণিত পুষ্পালঙ্কারের আকর্ষণ আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। দশকুমার চরিত, জাতককাহিনী, বিনয় পিটক, বাণের কাদম্বরী ও হর্ষচরিতে, মাঘের শিশুপালবধে, হর্ষের নৈষধ চরিতে, বৃহৎ সংহিতায়, অমর কোষে এবং যাবতীয় পুরাণাদিতে অলঙ্কারের বহুবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্যে আদিম সমাজের অনুকরণে কণ্ঠাভরণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই আভরণ হৃদয়ের কাছাকাছি রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। কারণ, হৃদয় ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। হৃদয় রয়েছে গ্রীবাদেশের নিচে, নাভিদেশ থেকে বারো আঙুল ওপরে। পদ্মের মুকুলের মত ঐ হৃদয় নাড়ীগুলো দিয়ে জড়ানো। ঐখানে ছোট একটি ফুটো আছে যার মধ্যে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

দেবতাদের স্তবগানে তাঁদের রূপ বর্ণনাকালে অগণিত অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় (বর্হাপীড়) ময়ূরের পালক দিয়ে শিরশোভনের কথা, (বল্লবীনয়নাম্ভোজ মালিনে) পদ্মের মালার কথা বলা হয়েছে, শ্রীরামরহস্যে 'শঙ্খভূষণ' উল্লেখিত হয়েছে। চিরকালের ছাইমাখা শিবকে পর্যন্ত রত্ন-আকল্প-উজ্জ্বলং-অঙ্গং, মন্দার-পুষ্প পূজিতায়, রঞ্জিত সৎ মুকুটং, মঞ্জীর-পাদ যুগলায় ইত্যাদি স্তব করা হয়েছে। দেবীদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই যেখানে যত ভালো অলঙ্কার আছে, স্বর্ণময় বস্ত্র থেকে মুক্তামালা সবকিছু পরিয়ে তবে শান্ত হয়েছেন স্তব রচয়িতা। বলা বাহুল্য, এই বর্ণিত বিবিধ অলঙ্কার স্তোত্রকারের মনগড়া ব্যাপার কিছু নয়।

আমরা সাহিত্যে দেবদেবীর অঙ্গে যে অলঙ্কারের বর্ণনা পেয়েছি শিল্পশাস্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সেই কারণে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য ছাড়া বিগ্রহের অঙ্গে ধাতু ও অন্যান্য মূল্যবান্ অলঙ্কার চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত অলঙ্কারে স্থানকালের বিশেষ শৈলী দৃষ্টি এড়ায় না। যেহেতু নির্দেশানুসারে সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অলঙ্কার কোন বিশেষ দেব-দেবীর অঙ্গে থাকে না তাই মানুষের ব্যবহারের অলঙ্কারেই তার পরিচয় বিধৃত। এ কথা শুধু হিন্দু দেবদেবীর ক্ষেত্রে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁর 'অভিধান চিন্তামণি'তে যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর কথা বলেছেন তাঁদের অঙ্গাভরণ এবং শ্বেতাম্বরী ২৪ শাসনদেবীর অঙ্গাভরণ থেকে সুরু করে বৌদ্ধ অমিতাভকুল, অক্ষোভ্যকুল, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধিকুলের যাবতীয় দেবদেবীর অঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জৈন ধনপালের তিলকমঞ্জরী এবং নারদশিল্পের ভৌমিক, ভিত্তি ও প্রস্তরচিত্র আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কিত ধারণার সহায়ক।

উৎখননের তথ্য

ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণার আরেকটি

গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মাহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, পাটলিপুত্র, বৈশালী, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদের খননলব্ধ অগণিত মূর্তি, খেলনা এমনকি মণিমুক্তা ও অলঙ্কার। যে বাঙলাদেশের ভূমির প্রাচীনতা সম্পর্কে সেদিন অবধি পণ্ডিতদের দ্বিধার অন্ত ছিল না, আজ অনুসন্ধানের ফলে সেখানেও যে সব প্রত্নদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রাচীন পূর্ব-ভারতীয় অলঙ্কার সম্পর্কিত একটি চিত্র পরিস্ফুট। চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা (২৪ পরগণা), মঙ্গলকোট (বর্ধমান), বাসাপাড়া (বীরভুম) থেকে বর্তমান আলোচক শুঙ্গ যুগের কয়েকটি পোড়ামাটির যক্ষিণী সংগ্রহ করেন। এই মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিতে রত্নজালি, টিকা, পর্যাষ্টক, হেমসূত্র এবং কিরীট কুণ্ডল অতি স্পষ্ট। এ ছাড়া পাওয়া গেছে নানান্ আকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিবিধ মাল্যদানা। এর মধ্যে আগেট, কালসিজনীয়, গারনেট, জেস্পার এবং কোয়ার্টজ্ই পরিমাণে বেশি। হরিনারায়ণপুর এবং দেউল-পোতায় পাওয়া গিয়েছিল অগণিত পোড়ামাটির মাল্যদানা যার বড়োগুলিকে মাছের জালে ব্যবহারের গুটি বলে মনে হয়।

ভারতীয় নারীমূর্তির প্রাচীনতম নমুনা ঝোব ও কুল্লির দগ্ধমৃত্তিকা থেকে সুরু করে প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি আকর অলঙ্কারের (যুগে যুগে তার অভিধান্তর ঘটলেও) কথা জানতে পারি। ১। রত্নজালি অর্থাৎ রত্নখচিত কেশ আবরক ২। কিরীটকুণ্ডল অর্থাৎ শিরোভূষণ ৩। হেমসূত্র অর্থাৎ কণ্ঠাভরণ ৪। জনপদবধূর করশোভা বলয় ও অঙ্গুলীয়ক ৫। হেমমেখলা ও কিঙ্কিণী, সজ্জিতা ললনার কটিবন্ধ ৬। নাগরিকার পদাভরণ নূপুর।

শিল্পশাস্ত্রে দেবদেবীর আপাদমস্তকের যে বিভাজন আছে তদনুসারে বিবিধ অলঙ্কার যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে। এই সমস্ত অলঙ্কারকে রীতিসিদ্ধ-ভাবে এইরকম ভাগ করা হয়েছে। মস্তক থেকে কণ্ঠ : শিরোরত্ন, ললাটিকা, তাড়ক, মুক্তামালা, গ্রৈবেয় ও উর্মিকা। কণ্ঠ থেকে কটি বা নাভিদেশ : প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তংস ও খক্ষমালিকা। পার্শ্ব ও হস্তালঙ্কার : পার্শ্বোত্তত, নখোত্তত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, অঙ্গদ, মণিবন্ধবলয়, শিখাভূষণ ও অঙ্গিকা। কটিদেশের অলঙ্কার : ভ্রাস, প্রাগণ্ডবন্ধ, নাভিপুর, নাভিমালিকা। এ ছাড়া মাণবক, ললন্তিকা, কটিলগ্ন ও উধ্বতারার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে শৃঙ্খল ব্যবহৃত হত। সপ্তকী কটিদেশের অলঙ্কার : কাঞ্চী, অষ্টযষ্টিকা, রসনা ও কলাপ।

ভারতীয় অলঙ্কারের বিবর্তন

সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই ভারত অলঙ্কারের ক্ষেত্রে নির্মাণ কৌশলের মানে, দক্ষতায়, গঠনবৈচিত্র্যে ও উপাদানব্যাপ্তিতে বিশ্বের সেরা দেশগুলির অন্যতম ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় ধাতুশিল্পের উৎকর্ষ, খোদাই, ঠোকাই, ছাঁচঢালাই প্রভৃতিতে দক্ষতা, জালি কাজ, ঠাণ্ডা পাথরবসানো কাজ, রঙীন উজ্জ্বল কাঁচের কাজ, রঙ ঢেলে এনামেলের কাজ, পুঁতি ছেঁদা করার কাজ—সব ব্যাপারেই আশ্চর্য অগ্রগতি চোখে পড়ে। আর্যরা ধাতুর ব্যবহারে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, স্বর্ণ ও কখনো কখনো রৌপ্য ব্যবহার করে বিবিধ অলঙ্কার নির্মাণ করতেন তাঁরা। তক্ষশীলা থেকে উদ্ধার করা অলঙ্কার গ্রীক ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত। তাতে যে গঠনবৈচিত্র্য ও নকশার পারিপাট্য দেখা যায়, তার প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। সোনার সুক্ষ্ম জালি কাজ ও অত্যুন্নত এনামেলিংয়ের জন্য তক্ষশীলা খ্যাত। মৌর্যযুগে প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারী গহনাও এল, আর দেখা দিল সোনারূপোর বাসনকোসন এবং রাজার হাতির অঙ্গে সোনা রূপোর অঙ্গাভরণ। ভারতবর্ষের সমাজ আর্থনীতিক যাবতীয় ব্যাপারের সঙ্গে অর্থাৎ ইতিহাসের প্রত্যেকটি মোড় ঘোরার সঙ্গে ছোটবড় রাষ্ট্রযন্ত্র ও ব্যক্তিক অভিরুচি নতুন নতুন পথ খুঁজেছে। প্রাগৈতিহাসিক, মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণের পর গুপ্তযুগ মোহনমালার ব্যবহারে যেন ঝলমল করে উঠেছিল। পূর্বের তুলনায় আয়তনে বড়ো হলেও গুপ্তযুগীয় অলঙ্কার ছিল ওজনে হাল্কা, বৃহদায়তনের উপযোগী জটিল নকশায় সমৃদ্ধ এবং সব মিলিয়ে অনেক বেশি মার্জিত।

গুপ্তযুগ ও মুসলমান যুগের মধ্যবর্তীকালে এই শিল্পটি অলঙ্করণ প্রাচুর্য ও তক্ষণাদি কৌশলে মার্জিত সূক্ষ্মতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মানসাম্য লাভ করেছিল যাকে প্রকারান্তরে অগ্রগতির দিক থেকে অচলাবস্থা বলা চলে। আসলে, ভাবসমৃদ্ধ গুপ্তযুগের পর থেকে কারু ও শিল্পের রাজ্যে এক বদ্ধ অবস্থা এসে গিয়েছিল। অলঙ্কারশিল্প ইতিপূর্বে নকশা, পরিকল্পনা ও রূপায়নে শ্লাঘনীয় পরিণতি লাভ করলেও, এই অন্ধকার যুগে অলঙ্কারশিল্পে গণরুচিকে যা নিয়ন্ত্রিত করত তা বিশুদ্ধ শিল্পস্পৃহা নয়, পরন্তু অলঙ্কারসমূহের বিবিধ আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ও ধর্মীয় সংস্কার, কখনো তাদের নিছক ঐশ্বর্যমূল্য। মুসলমান আক্রমণের ফলে এই অচলায়তন ভাঙতে সুরু করে এবং ক্রমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পরিণতিস্বরূপ অলঙ্কার শিল্পেও

যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সমন্বয়-প্রক্রিয়া চরম সার্থকতা লাভ করে মুঘল আমলে এবং এর মূলে কাজ করেছিল আরবীয় নয়, পারসিক বিলাসবহুল বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যরুচি, কারণ অভিজাত শাসককুল তখন পারসিক আদর্শে মগ্ন ছিলেন।

প্রাক্-মুঘল যুগের তুর্কি অধিপতিদের কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক রাজসভায় ঠাঠ-ঠমক ও আড়ম্বর হয়ত কম ছিল না, কিন্তু মুঘলযুগের অলঙ্কারের অভিজাত মনোভঙ্গী, চরমোৎকর্ষপরায়ণতা, রুচিসৌকুমার্য, গীতিময় সৌন্দর্য-প্রেম ও নিটোল দীপ্তির পাশে পাঠান বিত্তবত্তার নগ্ন প্রদর্শন অনেক ঠুনকো ও নিষ্প্রভ বোধ হয়। পাঠান যুগের কারুকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় বিদেশীদের লেখা বিবরণে। 'ভোজসভা শেষ হলে রাজপ্রতিনিধিদের সোনার বাটি, সোনার কটিবন্ধ, সোনার কুঁজো আর সোনার পেয়ালা উপহার দেওয়া হল। সহকারীরা ঐ সমস্ত জিনিসই পেলেন তবে সেসব রূপোর তৈরী।'...'তারা পায়ে দেয় সোনালী জরীর কাজ করা চটি ; ...কানেতে তারা দামী পাথর বসানো সোনার দুল পরে। তাদের গলায় দোলে হার।...হাতের কব্জী এবং পায়ের গোড়ালিতে তারা সোনার বালা ও মল পরে, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে আংটি পরে।' গৌড়েশ্বর বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রাজমুকুট' উপাধি দেবার সময় তাঁকে 'উজ্জ্বল মণিময় সুন্দর হার দ্যুতিমান কুণ্ডল রত্নখচিত দশ আঙ্গুলের রতনচূড় দিয়েছিলেন।' বৃন্দাবন দাসের দৃষ্টিতে, 'কেবল নারীরা নয়, পুরুষেরাও নানারকম অলঙ্কার পরতেন, যেমন—অঙ্গবলয়, আংটি, নূপুর, কুণ্ডল ; এইসব গয়না সোনায় তৈরি হত, তার সঙ্গে সময় সময় রূপাও থাকত এবং মরকত, প্রবাল, মুক্তা, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রত্নও গয়নায় ব্যবহৃত হত।' [সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পরিশিষ্ট]

মুঘল যুগের অলঙ্কার

বস্তুত আজ অধিকাংশ ম্যুজিয়ামের প্রাচ্য অলঙ্কার-সম্বল হল মুঘল অঙ্গাভরণ। এখানে আমাদের প্রাচীন ধারা পারসিক ধারার সঙ্গে মিলে যে প্রবাহ সৃষ্টি করল পরবর্তীকালেও তাকে এতটুকু ম্লান করা যায়নি। পাঠানের পর থেকেই সমরখন্দ ও হীরাটকে আমরা খুব কাছে পেতে থাকি। সৈয়দ আলি বা সামাদ শুধু যে আমাদের চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছিল তা নয় আসলে আমাদের নান্দনিক দৃষ্টির একটা বিরাট পরিবর্তন তখন এসে

গেছে। মুঘল বাদশাহের অর্থকৌলীন্যের সঙ্গে পারসিক রুচির বিবাহবন্ধনে আমাদের চোখের বিপ্লব পুরোপুরি ঘটে গেল। ক্ষুদ্র চিত্রের কারিগরীতে, দিল্লী আগ্রার প্রাসাদ হর্ম্যে, সিদি সৈদের জালি কাজে যে দক্ষতা, যে চমক, তারই আরেক দিক মুঘল অলঙ্কার। এ অলঙ্কারে ধাতু ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে নেওয়া হয়েছিল, গঠনশৈলী প্রায় ঐতিহ্যবাহী কিন্তু জড়োয়ার এমন নয়নাভিরাম সমাহার এর আগে পরে কখনো দেখা যায়নি। সর্বোপরি যোগ হল পারসিক মিনাকারি। মুঘলযুগের এই মিনাকারি আমাদের আবহমানকালের অলঙ্কারধারাকে নতুন নতুন পথে চালিত করল। গৌড়ের লোটন মসজিদের মিনাকারি শুধু যে আমাদের অঙ্গাভরণকে চঞ্চল করল তা নয়, এর ঢেউ সাগরপারে গিয়েও পড়ল। প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে সাদা মিনার কাজ ইংলণ্ডে চালু হয়েছিল (জয়পুরেও তা চলছিল) কিন্তু পারসিক রঙদার মিনাকারি রাণী এ্যানকে অস্থির করে তুলল। দেখতে দেখতে রামধনু মিনা সমগ্র ইংলণ্ডে ধনী সমাজের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল। জয়পুরের ওপর মুঘলপ্রভাব কলাক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী রূপে দেখা দিয়েছিল। তাই দেখা যায় চিত্রকলায় জয়পুর যেমন গুজরাটি প্রভাব মুক্ত হয়ে অত্যধিক মুঘলগন্ধী হয়েছিল তেমনি অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কুন্দন-মিনাকারির অঙ্গ থেকে মুঘলগন্ধ আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এ প্রভাব লোকায়ত সমাজের ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে।

মুঘল আমলের মূল ধাতু অলঙ্কার কিন্তু এদেশের প্রাচীন শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এই কারণে বিচ্ছিন্ন নয়, যে মোটিফগুলো প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মন্দিরগাত্রে, দৈনিক ব্যবহারের সামগ্রীতে ও অন্যান্য হাজারো বস্তুতে প্রতিফলিত তার প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। তবু ধর্মীয় অনুশাসনানুসারে যখন শিল্পীকে ফুল-লতা-পাতার কেয়ারির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে তখন কিছু কিছু চক্রজাতীয় নতুন মোটিফ সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই মোটিফের ঢেউ মসজিদে পড়েছে, হিন্দু মন্দিরেও দেখা গেছে, দেখা গেছে প্রতিদিনের ব্যবহার সামগ্রীতে। পিতৃপূজার মোটিফ, হাঁটু মোড়া মোটিফ, চক্র মোটিফ এবং নাগ ও ড্রাগন মোটিফের বিচিত্র মিলনে এগুলি জন্ম নিয়েছে।

মুঘল অলঙ্কারে তাজ আর ঝাপ্টা প্রথম ঝলকেই আমাদের চমকিত করেছিল। এই চমক থিতিয়ে দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনের অভিধান্তর ঘটেছে, পরিবর্তন সামান্য কিছু এসেছে ওজনে ও ধাতু ব্যবহারে।

মাথায় নতুন করে এল চৌক্ক, শিসফুল ও ছোটি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলি। ছোটদের মাথায় বোড়া এবং অন্যান্যদের শিরমার্গ শোভা পেতে লাগল। কপালে দৌনি বা দম্‌নি, কুটবি, টিকা, চাঁদ, তাওইট, ঝুমর, গুছই, বিন্দলি ও বারওয়াটের প্রচলন হল। কানে উঠল গোসওয়াড়া, বাহাদুরি, ঝাঁমকা, বালা, খুংরিদার, মছলিয়ান, পতং, তানদুর এবং মোর ফুলওয়ার। নাকের অলঙ্কার নথ, বুলক, লট্‌কান এবং লং একেবারে নতুন বস্তু হিসাবে দেখা দিল। দাঁতের ক্ষেত্রেও রখন অভিনবত্ব আনল। হার জাতীয় শ্রেণীতে এল চন্দন, চম্পাকলি, জুগনু, মোহরন, হাউলদিল, হাঁসলি, গুলুবন্ধ, ইতরাদন, কান্দি, শিলওয়াটা, লরি (পাঁচ, সাত)—অবশ্য এ সবই প্রাচীনের নতুন অভিধা মাত্র। হাতের গহনায় বাজুবন্ধ, জৌশন, তাওয়িজ, অনন্ত, ভাওট্টা, এলাচি, কঙ্কন, গোখ্‌রু, কারা, চুড়, গইরা প্রভৃতির আকৃতি ধারানুসারী, তক্ষণকর্মেও পুরনো মোটিফ পর্যন্ত রয়ে গেল। আংটির ক্ষেত্রে সামান্য অভিনবত্ব দেখা গেল ছল্লা ও আরশিতে। কটিদেশে এল পাহ্‌জেব, চঞ্জর, ঘুংরু ও জাঞ্জিরি। ঔরঙ্গজীবের দরবারের চিকিৎসক ভিনিসবাসী মানুচ্চি মুঘল অন্তঃপুরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বিবিধ অলঙ্কারের কথাও জানা যায়। শাহজাদীরা চাদরের মত করে গাঁথা মুক্তোর জাল দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। পুরুষেরা অঙ্গাভরণ ব্যবহার থেকে নিরত ছিলেন না। মোহনমালা জড়োয়া বৈচিত্র্যে এ সময়ে এক নতুন রূপ নিয়েছিল। মানুষের অঙ্গ থেকে জড়োয়া এবার এল পরিধেয়ে, জুতোয়, লাঠিতে, ছড়িতে, অস্ত্রের খাপে ও হাতলে, হাতি-ঘোড়ার অঙ্গে ও বেল্টে, পতাকাদণ্ডে, পানপাত্রে, আলবোলায়, ফুলদানি, মুরাট্টা ও পিকদানি প্রভৃতিতে। বলাবাহুল্য, অনেকক্ষেত্রে প্রাচুর্য থেকে এই অলঙ্করণ এসেছে শুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির তাগিদে নয়।

মুঘল শাসনের অবসানের দিনেও মুঘল প্রভাব অলঙ্কারক্ষেত্র থেকে মুছে যায় নি। দেশীয় রাজারা ঐ ধারা অনুসরণ করেছেন, এঁদের পৃষ্ঠপোষণায় জয়পুর ও বারাণসীতে নতুন করে কুন্দন ও গুলাবীশৈলী শিল্পদক্ষতার চরমে উঠেছে। সামন্তরাজা ও জমিদারশ্রেণী কিছু শিল্পীকে আশ্রয়দান করে আঞ্চলিক এক একটা বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলেন। এই সূত্রে শিল্পীর যে স্থানান্তর ঘটল তাতেও কিছু কিছু মিশ্রিত শৈলীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

পরবর্তীকালে ইংরেজের প্রভাবে ভারতীয় অলঙ্কারের অনেকগুলি সনাতন ধারণা পরিবর্তিত হয়। নতুন গড়ে ওঠা শহরের রুচিতে ভারি

ওজনের অলঙ্কার সম্পর্কে একটা অনাগ্রহ দেখা দেয় নতুন নাম এক্ষেত্রে যা শোনা গেল তা ঐ আঞ্চলিক মিশ্রণের অবদান। মুঘল চিত্রের আঞ্চলিক কলমের মত নতুন ঘরানার অলঙ্কার এল।

বাঙলার অলঙ্কারের ইতিবৃত্ত: আদি ও মধ্যযুগ

ভঙ্গ মুঘল ঐতিহ্য, নবাগত পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও আঞ্চলিক দেশীয় ধারার বিচিত্র সংমিশ্রণে আধুনিক অলঙ্কার রীতি প্রথমে কলকাতা ও বাঙলাদেশের অন্যান্য শহরে এবং পরে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার পারিপার্শ্বিক অনুপ্রবেশের পথ ধরে ক্রমে সারা বাঙলাদেশে আসর জাঁকিয়ে বসল। বাঙলার নিজস্ব অলঙ্কার বলতে যদি কিছু নির্দেশ করা যায় তবে তা দানা বেঁধে উঠল এই পর্বে এসে। তাই বাঙালীর অলঙ্কারের আলোচনায় এই পর্বে আগমন ও পরবর্তী সমন্বয়ের পর্বে উত্তরণের ইতিবৃত্ত—দুই-ই স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। আমরা এ যাবৎ ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতের অলঙ্কার কোন্ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছিল তার একটি সাধারণ ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। বস্তুত বাঙালীর আদি ও প্রাক্-মধ্যযুগের ইতিহাসের স্বল্পলভ্য উপাদান থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা চলে তা হল এই যে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বাঙলার অলঙ্কার, অন্তত অভিজাতকুলের প্রথাবদ্ধ রীতিনির্ভর অলঙ্কার, মুখ্যত উত্তর ভারতীয় নাগর আদর্শের দ্বারা বরাবর আচ্ছন্ন ছিল।

পটভূমি

প্রাগুক্ত কথা স্মরণে রেখেই সংক্ষেপে বাঙলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের অলঙ্কারধারার গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আমাদের আদিযুগের অলঙ্কারের ইতিহাস উদ্ধার করতে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও মূর্তিবিচার ছাড়াও প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে পারি। তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন এ আলোচনার পূর্বশর্ত: মণিমুক্তা ও মূল্যবান্ ধাতুনির্মিত অলঙ্কারের সামাজিক প্রচলন সামাজিক ধনোৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। আর্থনীতিক ঋদ্ধি ও বন্টনব্যবস্থায় সমতার অভাব থাকলে সমাজে বিক্ষিপ্ত ঐশ্বর্যচর্চার নিদর্শন মিললেও ব্যাপক অলঙ্কারাভ্যাস তজ্জনিত অলঙ্কারশিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি অসম্ভব। বাঙলায় খৃঃ ১ম থেকে ৪র্থ/৫ম শতক পর্যন্ত অনুকূল বহির্বাণিজ্যের কল্যাণে সমাজদেহে আর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনের স্বল্পকালীন এক জোয়ার আমরা দেখতে পাই। তার আগে

বা পরে এই অঞ্চলের ধনোৎপাদনের উৎস ছিল মুখ্যত কৃষি এবং ঐশ্বর্য ছিল মুষ্টিমেয় ভূস্বামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত। এর অবশ্যম্ভাবী ফল বিপুল ধনবৈষম্য। এই বৈষম্যের ঢেউ অলঙ্কার-জগৎকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। তাই প্রাচীন সাহিত্যের সর্বত্র দুটি বিপরীতধর্মী চিত্র আমরা পাই—একদিকে উত্তরাপথের অনুকরণে ধনী বিলাসীমহলে অভিজাত গহনার ছড়াছড়ি, আর অন্যদিকে সংখ্যাগুরু দরিদ্র ও পল্লীবাসীদের অঙ্গে অনাড়ম্বর প্রকৃতিজ অলঙ্কারের প্রাধান্য।

ধাতুসমৃদ্ধি

তবে সংখ্যায় নগণ্য হলেও এবং উত্তর ভারত থেকে ধার করা নমুনা ব্যবহার করলেও বাঙলার অভিজাত অলঙ্কার-বিলাসীরা যে পরিমাণ মূল্যবান্ ধাতু ও রত্নপ্রস্তর ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রাচীন বাঙলার খনিজ সম্পদের তালিকা থেকে অনুমান সম্ভব যে দেশের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির জোয়ার না এনে দিতে পারলেও অতগুলি মহার্ঘ উপাদান ঘরে বসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত বলে তা স্থানীয় একটি ঘরানা গড়ে উঠতে কম সহায়ক হয়নি। প্রাচীন সাহিত্যে বাঙলাকে হীরা, রৌপ্য ও মুক্তার দেশ বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি ভাষ্য অনুসারে পৌণ্ড্রক ও ত্রিপুর (ত্রিপুরা) হীরামণি প্রাপ্তিস্থানের অন্যতম। অবশ্য যুক্তিকল্পতরুর মতে কেবল দ্বাপর যুগেই নাকি পৌণ্ড্রদেশে হীরা মিলত। পৌণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গের এই হীরকখ্যাতির সমর্থনে রত্নপরীক্ষা, বৃহৎসংহিতা, নবরত্নপরীক্ষা ও রত্নসংগ্রহে অগণিত উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহমিহির এবং গরুড়পুরাণের মতে যে আটটি অঞ্চলে হীরা মিলত, পৌণ্ড্র তার মধ্যে অন্যতম। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, বজ্রভূমি অর্থাৎ উত্তররাঢ়ের নামকরণেই প্রকাশ যে এখানে বজ্র বা হীরা পাওয়া যেত। আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী আবার দক্ষিণ রাঢ়ের মদারণ বা মন্দারণে হীরা পাওয়া যেত। বজ্রভূমি বোধহয় একদা বাঙলা-বিহার সীমান্তে অবস্থিত কোথ্রার কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এই কোথ্রায় জাহাঙ্গীরের আমলেও অনেকগুলি হীরকখনি ছিল। কয়লাখনি অঞ্চলের হীরাপুরের নামটি এই সূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। অগস্তিমত অনুসারে বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ববাঙলায় প্রচুর হীরা পাওয়া যেত। গৌড়িক নামে অগুরু ফুলের মত স্বচ্ছবর্ণ একরকম রূপো গৌড়দেশে পাওয়া যেত বলে

কৌটিল্য বলেছেন। গঙ্গানদীর মোহনার কাছে সোনা পাওয়া যেত এবং এদেশে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার অস্তিত্ব ছিল। এ তথ্য পেরিপ্লাসেও রয়েছে। স্বর্ণসমার্থক তেলেগু শব্দ 'বাঙ্গারা' থেকেই 'বাঙলা' নামের উৎপত্তি এমন অনুমানও করা হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বে ও রত্নপরীক্ষা গ্রন্থে পূর্বভারতীয় উপকূলবর্তী দেশসমূহে মুক্তার প্রাচুর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পেরিপ্লাসেও গাঙ্গেয় উপত্যকায় মুক্তার অস্তিত্বের কথা আছে।

প্রাচীন বাঙলার খনিজ সম্পদের এই উদার চিত্রের সঙ্গে অতি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় পুরাতাত্ত্বিক খননলব্ধ দেবমূর্তি ও যক্ষ-যক্ষিণীমূর্তির অলঙ্কার-বাহুল্য। আগেই বলা হয়েছে এইসব অলঙ্কারের মধ্যে কিরীট, কুণ্ডল, টিকা, হেমসূত্র ও রত্নজালিকার প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

সমৃদ্ধির সাহিত্যিক বিবরণ

চর্যাপদ ও দোঁহাকোষে যেসব অলঙ্কার ও মাণিক্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল কাঙ্কাণ বা কঙ্কণ, কানেট অর্থাৎ কর্ণভূষণ, কুণ্ডল, নেউর অর্থাৎ নূপুর, মণি, রঅণ বা রঅণা বা রয়ণ অর্থাৎ রত্ন। বিজয়সেনের নৈহাটি শাসনে রাজপুরাঙ্গনাদের মুক্তাহার ও মহানীলরুদ্রাক্ষমালা নামক হার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামচরিত ও পবনদূত গ্রন্থের বর্ণনায় যথাক্রমে রামাবতী ও বিজয়পুর নগরের রত্নৈশ্বর্যের আড়ম্বর চোখে পড়ে। রামচরিতে শুধু সুদৃশ্য অলঙ্কারমণ্ডিত সোনার বিচিত্র আসবাবপত্রের উল্লেখ নয়, হীরকখচিত ও বিচিত্র রত্নপ্রস্তরসমৃদ্ধ নয়নাভিরাম অলঙ্কারের কথাও আছে। এছাড়া উল্লেখ পাওয়া যায় রত্নখচিত ঘুঙ্ঘুরের, মুক্তা-মরকত নীলকান্তমণি, চুনী প্রভৃতির বিলাস-বহুল প্রয়োগের। সোনা-রূপোর ছড়াছড়ি তো ছিলই। প্রকৃতপক্ষে, ১০ম-১১শ শতক পরবর্তী লিপিগুলিতে ও নাগরসাহিত্যে মণিরত্নখচিত ধাতব অলঙ্কার ও সোনা-রূপোর তৈজসপত্রের প্রাচুর্য সহজেই নজরে আসে। ঐশ্বর্যের এমনই ঘটা যে রাজপ্রাসাদের ভৃত্যকুলের রমণীদের অঙ্গেও শোভা পেত হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, স্বর্ণবলয়, মল প্রভৃতি, এ সমাচার পাওয়া যাচ্ছে দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে। সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি শুভাঙ্কের শ্লোকে আছে একটি বাঙ্ময় বর্ণনা—রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত চত্বরে যুবতীরা যখন খেলার ছলে নিজেদের মধ্যে লড়াইতে মেতে উঠল তখন তাঁদের কণ্ঠহার ছিঁড়ে মুক্তোর গুচ্ছ ছড়িয়ে পড়ে এখানে ওখানে। নৈষধচরিতে ধনীর দুলালীর বিবাহসজ্জায় স্থান

পেয়েছে মণিকুণ্ডল, সাতলহর মুক্তামালা, শাঁখা ও সোনার বালা। কর্ণকুণ্ডল, কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠাহার, বলয়, কেয়ূর, মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরতেন। মধ্যযুগেও এই একই প্রথার অনুসৃতি চোখে পড়ে।

সাধারণ্যে অলঙ্কারাভ্যাস

সাধারণ গৃহস্থ ও পল্লীবাসীরা কিন্তু এই রত্নবিলাস থেকে নিতান্তই বঞ্চিত ছিলেন। চিরদারিদ্র্যের মধ্যে তাঁরা প্রসাধনী সামগ্রীর জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে সন্তুষ্ট থাকতেন। নগরবাসিনী বিলাসীর চালচলনও তাঁদের অপছন্দ ছিল। কবিচন্দ্র এই পল্লী প্রসাধনের মনোরম চিত্র এঁকেছেন। পল্লীবধূর কপালে কাজলের টিপ, হাতে জ্যোৎস্নার চেয়ে সাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি ঝিঠে ফুলের ভূষণ আর তিলপল্লবে শোভিত কবরী। পবনদূতের বর্ণনা অনুসারে রসময় সুহ্মদেশে ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গনা কানে পরতেন নবচন্দ্রকলার মত স্নিগ্ধ কোমল কচি তালপাতার কর্ণাভরণ। ফুলের মালার চলন ছিল খুব। উমাপতিধর বিরচিত বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ শ্লোক আছে। গ্রামের ব্রাহ্মণকন্যারা মণিরত্নের মুখ কখনো দেখেন নি, তাঁরা চিনতেন লাউকুমড়ো ফুল, দাড়িম-বীচি, তুলোর বীজ আর সবুজ শাকপাতা। বিজয় সেনের দৌলতে যখন তাঁরা শহরে বসবাস করে ধনশালী হলেন, তখনও মুক্তো ও কার্পাসবীজে, মরকত ও শাকপাতায়, রূপো ও লাউফুলে, রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়ো ফুলে পার্থক্য কি তা জানতেন না। চর্যাপদে অন্যান্য সংসারবন্ধনহীন শ্রেণীর অলঙ্কারের কথা আছে। কাপালিকেরা গলায় হাড়ের মালা পরত, অরণ্য-পর্বতবাসী শবরের পরিধেয় ছিল ময়ূরের পাখা, তার গলায় থাকত গুঞ্জাবীচির মালা, কানে বজ্রকুণ্ডল।

মধ্যযুগের বাঙলা অলঙ্কার

মধ্যযুগ বলতে আমরা চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছি। যদিও এই কালবিভাজন অনেকাংশে স্বেচ্ছামূলক ও রাজনৈতিক ইতিহাসনির্ভর, অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এরকম কোন সন্ধিপর্ব লক্ষ্যগোচর নয়, তবু সাধারণভাবে একথা হয়ত বলা চলে যে বাঙলার রাজনৈতিক যুগপরিবর্তন ক্রমশ সামাজিক পরিবর্তনের প্রবর্তক হয়েছিল

এবং সকলেই জানেন যে শিল্প ও কারুকলার পরিবর্তন সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে বহুদিন পর্যন্ত এই মধ্যযুগ প্রাচীন ঐতিহ্যকেই বহন করে চলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বহুস্তরে মুঘলদরবার থেকে আগত বিবিধ প্রভাবকে আত্মসাৎ করে সেই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করার প্রস্তুতিও চলেছে তলায় তলায়। এই বিস্তীর্ণ কালের মধ্যে আবার প্রাক্‌চৈতন্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলা চলে, প্রধানত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বন্ধ্যাত্বের জন্য। চৈতন্যযুগ ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বাঙলায় যে নবজাগরণ দেখা দেয়, সমসাময়িক সাহিত্যে অলঙ্কারের বহুল বর্ণনায় মনেহয় মানুষের সৌন্দর্যসাধনার অঙ্গস্বরূপ রূপসাধনচর্চার এই শাখাটি তা থেকে বাদ পড়েনি।

এই যুগের অলঙ্কার সম্পর্কিত উল্লেখের উৎস মুখ্যত দুটি—মঙ্গলকাব্য-সমেত সাহিত্য এবং বৈদেশিক বিবরণ। এ-ছাড়া বাদশাহী দলিল ও ইতিহাস আছে। প্রধান প্রধান সাহিত্যকর্মে সনাতন অলঙ্কারের পুনরাবৃত্তিই যেন শুনতে পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গান, মনসামঙ্গল (যথাক্রমে পুরুষোত্তম, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, গঙ্গাদাস সেন, কেতকা-দাস, জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজরসিক প্রণীত), দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, চণ্ডীকাব্য (যথাক্রমে মাধবাচার্য, কবিকঙ্কণ ও ভবানীশঙ্কর দাস প্রণীত), রামায়ণ (কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য প্রণীত), কাশীরাম দাসের মহাভারত ও শঙ্কর দাসের ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে যেসব অলঙ্কারের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায় তার একটা তালিকা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে: ১. শিরোভূষণ—সিঁথি, (রত্ন) মুকুট, সোনার চিরুনী, কনকফুল, কনক-চাঁপা, ঝাঁপ ও পঞ্চফুল। ২. কর্ণাভরণ—কুণ্ডল, কর্ণফুল, কানবালা, চাকা ও বলি বা চাকি বৌলি, হীরাধর কড়ি, বীর বৌলি, মাকড়ি। ৩. নাসিকাভরণ—বেসর বা বেশর। ৪. কণ্ঠাভরণ—হার, গ্রীবাপত্র, সাতেসরি বা সতেশ্বরি বা সাতলহর হার, মুকুতার বলী, কণ্ঠমাল, সুতলি হার, সুবর্ণের পাঁতিহার ও সরস্বতী হার। ৫. বাহুভূষণ—অঙ্গদ, কেয়ূর, বাজু বা বাজুবন্ধ, মাদুলি ও তাড়। ৬. নিম্নবাহুভূষণ—রত্নচুড় (ওপরের অংশের নাম সরল, মধ্যাংশ চুড় এবং সামনের দিকের নাম কঙ্কণ), বালা, বলয় ও চুড়ি, কনক বাহুটি, শঙ্খ (বিভিন্ন রূপান্তরের নাম লক্ষ্মীবিলাস, রামলক্ষ্মণ, গজদন্ত ইত্যাদি)। ৭. অঙ্গুষ্ঠাভরণ—অঙ্গুঠী, রামুদড়ী, রত্ন অঙ্গুরী ও সুবর্ণ অঙ্গুরী। ৮. পৃষ্ঠভূষণ—থোপনা। ৯. কটিভূষণ—কিঙ্কিণী,

বাঘাম্বর, নীবিবন্ধ ও রশনা। ১০. পদাভরণ—খাড়ু, মগর বা মকরখাড়ু, মল্ল-তোড়র, বাঁকপাতা মল, উঁচুট বা উজ্ঝাটিকা বা পাশুলি, নূপুর ও ঘুঘুর :

কিছু কিছু বৃত্তিমূলক অলঙ্কারের উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে মেলে। যেমন, যোদ্ধার অঙ্গে থাকত রণটোপ, টোপর বা হেলমেট, তাড় বা আর্মলেট, বালা বা ব্রেসলেট, নূপুর ও কিঙ্কিনী। ব্যাধের গলায় ঝুলত লোহার কাঠির মালা, তাতে থাকত বাঘনখের পেণ্ডেন্ট আর কানে থাকত স্ফটিকের কানফুল। রাখাল ছেলেরা পরত তাড়, বালা ও কুণ্ডল, বনফুলের মালা, বিশেষ করে গুঞ্জার মালা ছিল তাদের খুব প্রিয়। চন্দনের অলকা-তিলকা কাটতেও তারা খুব উৎসাহী ছিল। যোগী কিংবা যোগিনীকে চেনার সব চাইতে সহজ উপায় ছিল এই যে এঁরা তামার তৈরি কুণ্ডল পরতেন কানে। চাঁদ সদাগরের মত বিলাসী বণিকেরা রজত-পাদুকা ব্যবহার করতেন। মুসলমান রাজপুরুষেরা বাঙালী ও অবাঙালী উভয় প্রকারের নর্তকী ও গায়িকাদের সমাদর করতেন, তার মধ্যে আবার এঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন লুলিয়ানী ও কলাবন্তরা। পৃথক পল্লীতে বাস করলেও বারবনিতাকুলও এই শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। নটী ও নর্তকীকুল রঙবেরঙের পোষাক পরে ফুলসাজে সেজে নানাবিধ অতিমূল্যবান্ অলঙ্কার পরত। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে সেই সেনযুগের বাররামা ও দেবদাসী জাতীয় রাজকায় পৃষ্ঠপোষকতাধন্য সভাকামিনীদের সময় থেকে মধ্যযুগের নর্তকী, বাঈজী ও নটীদের মধ্য দিয়ে সবশেষে ভাঙ্গা নবাবী আমলের শহরের বারবনিতারা অলঙ্কার, প্রসাধন ও সাজসজ্জার ব্যাপারে সমাজে রুচি পত্তনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে।

কৃষ্ণকীর্তনে সোনা, হীরে এবং অন্যান্য রত্নপ্রস্তরের উল্লেখ বর্তমান তা নিঃসন্দেহে সবিশেষ সমৃদ্ধির পরিচায়ক। 'দই চাই' বলে হেঁকে যায় যে গোয়ালিনী রাধা, তারও হাতে সোনার চুবড়ী, রূপোর ঘড়ী। খাট-পালঙ্ক তাও সুবর্ণমণ্ডিত। তবে সাধারণভাবে মধ্যযুগে বিত্তশালী ব্যক্তিরা দরিদ্রদের তুলনায় অলঙ্কারের পেছনে ঢের অর্থব্যয় করতেন, প্রভূত পরিমাণে সোনার গহনা ও হীরা-জহরৎ ব্যবহার করতেন: ধনীর দুলাল মাত্রেই মূল্যবান্ গহনা পরত, পায়ে মগর-খাড়ু ছাড়াও পরত রত্নখচিত হার, বালা, তাড় ও কর্ণাঙ্গুরী। সাধারণ গৃহস্থকে অবশ্য কম দামের এমনকি শাঁখের গহনা পরে সাধ মেটাতে হত। কাঁসা ও কলাইকরা গহনা, রূপোর বলি, তামার

মল এবং হাতীর দাঁতের আংটিতে সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

এ সময়কার বিদেশী পর্যটকের বিবরণীর মধ্যে ইবন বতুতার কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর বিবরণীর আরেক জায়গায় দেখা যায়, এদেশ থেকে তখন সোনা, রূপো ও লোহা রপ্তানী হত। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে আগত ভেনিসীয় বণিক নিকলো কন্তি জানাচ্ছেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা, রূপো, মূল্যবান্ রত্নপ্রস্তর ও মুক্তো পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজ বণিক দুয়ার্তে বারবোসা বলেছেন যে সম্ভ্রান্ত মূর বা মুসলমানরা কোমরে রাখে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত ছোরা ও আঙুলে পরে রত্নখচিত আংটি। এঁদের অন্তঃপুরিকারা রত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কার পরেন। পঞ্চদশ শতকের চীনা পর্যটক শিঙ চা শেঙ লান্ দেখেছিলেন যে মুসলমান রমণী প্রস্তরখচিত স্বর্ণনির্মিত মাকড়ি কানে পড়ত, গলায় ঝোলাত পেণ্ডেণ্ট। কব্জী ও গোড়ালিতে থাকত সোনার ব্রেসলেট, হাতে ও পায়ের আঙুলে আংটি। ষোড়শ শতকের আর এক চীনা পর্যটক শি ইয়াঙ্ চাও কুঙ্ তিয়েন্ লু একই রকম বর্ণনা রেখে গেছেন। ঐ সময়কার ব্রিটিশ পরিব্রাজক র‍্যালফ্ ফিচ্ বাকলা অঞ্চলে মেয়েদের রূপোর বলি এবং রূপো, তামা ও হাতির দাঁতের অন্যান্য অলঙ্কার পরতে দেখেছেন। প্রায় শতবর্ষের ব্যবধানে টমাস বাউরে যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে হীরা ও মুক্তাখচিত সোনা ও রূপোর অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। ফরাসী পরিব্রাজক জে. বি. ট্যাভার্নিয়ের ঢাকা ও পাটনায় দেখেছিলেন দু' হাজারের বেশি কারিগর পাথরের জিনিস বানাচ্ছে. তার মধ্যে কচ্ছপের হাড় ও সামুদ্রিক প্রাণীর হাড় দিয়ে তৈরি ব্রেসলেট ও প্রবালের মাল্যদানা আছে। শেষোক্ত বস্তুগুলি ত্রিপুরা ও আসামে রপ্তানী হত তার বিনিময়ে ত্রিপুরা থেকে আসত নিকৃষ্ট মানের সোনা। ত্রিপুরা আবার চীনে সোনা রপ্তানী করে রূপো নিয়ে আসত। রিয়াদ্-আল্-সলাতিন এবং তারিখ-ই-ফিরিশ্তাহ্ অনুসারে, বাঙলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সোনার থালায় খেতেন, এক সময়ে উৎসব-পার্বণে কে কতগুলো সোনার থালা বার করতে পারেন তাই দিয়ে সামাজিক মর্যাদার বিচার হত। এইভাবে পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়েই বাঙলার মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার ধীরে ধীরে তৎকালীন সর্বভারতীয় ফ্যাশনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে দেশীয় ভূস্বামী, বিদেশী শাসককুল, বাঈ ও নর্তকীবৃন্দ এবং বণিক-সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

বঙ্গীয় অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য

সর্বভারতীয় অলঙ্কার শিল্পের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশের আলঙ্কারিক ইতিহাসের কয়েকটি দিক আমাদের আলোচ্য ছিল। বাঙালীর চিত্ত বরাবরই সনাতন ভারতীয় ধারানুযায়ী স্বভাবত অলঙ্কারপ্রিয় তবে এখানকার আর্দ্রোঞ্চ জল-হাওয়া, নরম মাটি, সুকুমার রুচি, সংবেদনশীল শিল্পানুভূতি ও সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে অলঙ্কার-শিল্পের বিকাশ কালক্রমে সর্বভারতীয় রীতি থেকে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এমনটি কল্পনা করা সঙ্গত নয় যে, অলঙ্কারশিল্পের এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাশ্রয়ী ঈষৎ স্বতন্ত্র বিবর্তনের ধারাটি মূল সর্বভারতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙলার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন কালপর্বে তীব্র থেকে তীব্রতর বাঁক নিয়ে সর্বদা দ্রুতগতিতে ক্রমান্বয়ে প্রবল হতে প্রবলতর স্বাতন্ত্র্যযুক্ত চেহারা নিয়ে প্রকট হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখিয়েছে। ইতিহাসে সাধারণ ও স্বতন্ত্র এই দুটি রূপই পাশাপাশি ও পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় অধিকাংশ সময় দেখা যায় তদুপরি সেই স্বাতন্ত্র্যও কদাচ মুখ্যস্বরূপে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ বাঙলার অলঙ্কারের প্রকৃত রূপ হল, সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর পাঁচটি অনুরূপ জনপদের সাহচর্যে বিলীন একীভূত একটি মূর্তি যার গায়ে মাখানো আছে এক অনিবার্য, অনির্দেশ্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রলেপ। অলঙ্কারের জগতে প্রকৃত যুগান্তর এক লহমায় ঘটে না, তার অন্তরালে একযোগে যদিচ ভিন্নগতিতে কাজ করে চলে দিক পরিবর্তনের প্রবণতাসম্পন্ন কার্যকারণসমূহের বিচিত্র ও জটিল সমাবেশ। সামাজিক আর্থনীতিক, শৈল্পিক, নান্দনিক, ধর্মীয় বা আচারগত পরিবর্তনের নানাবিধ গূঢ়সঞ্চারী যৌথ রাসায়নিক চাপে সমাজের অলঙ্কারভাবনায় ধীর, অলক্ষ্য-গতিতে যুগ পরিবর্তনের আয়োজন চলতে থাকে। অন্যান্য কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি পুরাতনকে কদাচিৎ নিঃশেষে বিধ্বস্ত বা বিলুপ্ত করে দিয়ে নবীনের আবির্ভাব ঘটে। অলঙ্কাররুচির ক্রান্তিপর্বে বহিরাগত বা অন্তঃপরিণত নবীন প্রভাবকে স্থান করে দিতে গিয়ে সনাতনকে অল্পবিস্তর ভাঙতে হয় বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সুকৌশলে সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনের অভিষেক হয়। বিবর্তনের ধারায় নব নব উন্মেষ সত্ত্বেও ঐতিহ্যের এই নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্নতা শুধু বাঙলা নয় সারা ভারতের অলঙ্কারশিল্পের চরিত্রে নানা বহিরঙ্গ পরিবর্তনের সাময়িক চাঞ্চল্যকে অতিক্রম করে এক

উত্তুঙ্গ সনাতন স্থৈর্য, ঐক্য ও সমতা আরোপ করেছে। বাঙলাসমেত ভারতের সর্বত্র আকরস্থানীয় অলঙ্কারগুলির মৌলস্বরূপ প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি একই রয়ে গেছে, যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে তা মুখ্যত ঐ আকরসম্ভারের সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিদেশাগত নব নব রীতিপদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে মিশ্ররীতির উদ্ভব, দেশী বিদেশী বিবিধ নকশা ও মোটিফের পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা নতুন সংযোজনের সাহায্যে সামান্য রকমফের এবং সর্বোপরি পুরাতন অলঙ্কারের নতুন নতুন নামকরণ।

বাঙলার আলঙ্কারিক স্বাতন্ত্র্যের এবম্বিধ লক্ষণ স্মরণে রেখে বাঙালীর নিজস্ব অলঙ্কার বলতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর গহনাকে বোঝায় কিনা, বোঝালে তা কোন্‌গুলি, বিবর্তনের ধারায় ঠিক কোন্ পর্বে এসে এবং কেন এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দানা বেঁধেছে এবং কতিপয় অলঙ্কারকে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক মর্যাদায় চিহ্নিত করেছে—এই ধরণের প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিক উত্তর পাওয়া যায় কিনা খতিয়ে দেখা দরকার: বস্তুত যে অর্থে আমাদের আরো কয়েকটি মুখ্য চারু ও কারুশিল্প সর্বভারতীয় পটভূমিকায় নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক খ্যাতি অর্জন করেছে, সে অর্থে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কোন বাঙালীয়ানার সন্ধান বাতুলতা। কারণ এক্ষেত্রে বাঙালীর নিজস্ব প্রতিভা ও কল্পনা কাজ করেছে অপেক্ষাকৃত অনেক কম স্বাধীন প্রেরণার সঙ্গে। পটচিত্রের ক্ষেত্রে যেমন সর্বভারতীয় উৎকর্ষের নির্বাচনাত্মক স্বীকরণ সত্ত্বেও এক আশ্চর্য স্বতন্ত্র নৈপুণ্য, মেজাজ ও শিল্পবোধ বাঙলার এই চিরন্তন লোকশিল্পকে কালক্রমে ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ঘরানায় পরিণত করেছে, অলঙ্কারশিল্প কিন্তু সেরকম কোন সুনির্দিষ্ট ও পরাক্রান্ত স্বকীয়তা কোন পর্বেই অর্জন করেনি। মৃৎশিল্পে বিশেষ করে পোড়ামাটির অলঙ্করণে, সূচী ও বয়নশিল্পে, তক্ষণে বাঙলার যে অসামান্য রূপদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, ধাতু ও মণিরত্নখচিত বঙ্গীয় অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অনুরূপ আঞ্চলিক আভিজাত্য আমাদের নেই। এর অর্থ হয়ত এই নয় যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাঙালী স্বর্ণকাররা কম দক্ষ বা কুশলী। বরং অনুমান করা সঙ্গত যে, প্রথমত অনির্দেশ্য কারণে বাঙালীর মেধা, দক্ষতা ও রুচি উল্লিখিত শিল্পে অধিকতর অভিনিবেশ করে; দ্বিতীয়ত প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারের সঙ্গে যে রাজকীয় বৈভব ও সম্পন্ন রুচি অঙ্গাঙ্গী জড়িত বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে চিরকাল তার পরাকাষ্ঠা ছিল উত্তরাপথের নাগরসমাজ এবং বিশেষ করে দিল্লীর রাজদরবার। বাঙালী প্রতিভা অলঙ্কারে তাই স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা

যতটা না করেছে তার চাইতে বেশি চেয়েছে উত্তরভারতীয় নাগরিক আদর্শকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে।

কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য, বাঙালী অলঙ্কারশিল্পী বিশুদ্ধরীতিতে তেমন স্বস্তিবোধ করেননি যেমনটি করেছেন মিশ্রিতরীতির ক্ষেত্রে। মুঘল-পরবর্তী ভঙ্গ নবাবী ও বৃটিশপর্বের প্রাক্কালে যে ব্যাপক সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায় তাকে উপলক্ষ করেই বাঙলার নিজস্ব অভিজাত গহনা তার স্বকীয় রূপটি খুঁজে পায়। প্রথমত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে গড়ে ওঠা নতুন শহরে সংস্কৃতি ও রুচি বহুলাংশে স্থানীয় বণিক ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর বাবুসম্প্রদায়ের নিজস্ব মর্জি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, যেমন পুতুলশিল্পে বণিক বৌ-ঝির মুখ আরোপ করা রেওয়াজ হয়েছিল তেমনি গহনার ব্যাপারেও বণিক-গৃহিণীর অলঙ্কারাভ্যাস ও রুচি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কলকাতা শহরে যে উঠতি বাবুকালচার আসর জাঁকিয়ে বসেছিল, তা প্রকৃতপক্ষে নবাব-বাদশাহর ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যাড়ম্বরকে অনুকরণ করার দুর্বল ও অসফল প্রয়াস মাত্র। অতএব উত্তরভারতের মুসলিম বাবুসমাজ বিশেষত মুঘল দরবারের বিলাস প্রকরণ ও সৌন্দর্যসম্ভোগের আয়োজন ছিল এই অপকৃষ্ট সংস্কৃতির একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এই উত্তরভারতীয় মণ্ডন ও বিলাসসজ্জার আদর্শ আগেকার মত এই পর্বেও প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রধানত বাঈ, নর্তকী ও বারবনিতা মারফৎ। এই উচ্চকোটির বারাঙ্গনা ও পেশাদার নর্তকীদের অনেকেই ছিল হয় উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুসলিম রমণী অথবা উত্তর-ভারতের প্রচলিত জমকালো সাজসজ্জার মুঘলঘেঁষা আদর্শে দীক্ষিত। অতএব ক্রমে এই রুচি কলকাতা শহরের বাবুসমাজে সঞ্চারিত হয়েছে। শহর কলকাতার অলঙ্কার রুচিতে তৃতীয় সংযোজন হল বিদেশী প্রভাবের আওতায় দেশী কারিগরদের নিয়মভাঙা সংমিশ্রণের সাধনা। য়ুরোপীয় ধারায় শিক্ষিত কারিগরদের হাতে বিমিশ্র পদ্ধতিতে রচিত অলঙ্কার বিশেষত খাদযুক্ত ধাতুর গায়ে হীরেকাটা পালিশের জেল্লায় হাল্কা আপাত মনোহর গহনা মধ্যবিত্তজনের প্রিয় হয়ে উঠল। এই সঙ্গে যুক্ত হল অলঙ্কারশিল্পে নবাগত অন্যান্য কারুশিল্পীর পাঁচমিশেলী সংস্কার, রুচি ও অভিজ্ঞতা।

এইসব ভিন্নধর্মী বিচিত্র প্রভাবসমূহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে কলকাতা, হাওড়া, বিষ্ণুপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও অন্যত্র যে বিশিষ্ট ঘরানা

জন্ম নিল, তাদের তৈরি কোন কোন গহনাকেই আমরা বাঙালীর নিজস্ব প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার আখ্যা দিতে পারি। কারিগরীর দিক থেকে ঠোকাই, ছেলা ও দানার কাজে বাঙালী কারিগর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। এছাড়া সোনা ও রূপোর জালি কাজে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার শিল্পীরা অসাধারণ উৎকর্ষ ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমতানুসারে প্রাদেশিক গহনার তালিকা করতে হয় বলে মতভেদের অবকাশ এখানে যথেষ্ট। প্রায় একশো বছর আগে ত্রৈলোক্যনাথ বাঙালীর নিজস্ব অলঙ্কার বলতে চারটি শিরোভূষণ, পাঁচটি নাসিকাভূষণ, তেরোটি কর্ণভূষণ, বারোটি কণ্ঠভূষণ, চব্বিশটি বাহুভূষণ দশটি কটিভূষণ ও চারটি চরণভূষণ—এই মোট বাহাত্তরটি অলঙ্কার পেয়েছিলেন। তাঁর মতে আমাদের বাকি গহনা উত্তরভারতের অনুরূপ। বর্তমানে, এই শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাঙালীর নিজস্ব গহনার এক তালিকা সংগৃহীত হয়েছে। এই সূত্রে বলে রাখা ভালো, এই তালিকা অনুসারে বোঝা যায় গহনার অভিধা এখানে পুরনো আছে, পরিবর্তন ঘটেছে মোটিফে, মূল কারিগরীতে এবং অন্তিমস্পর্শ পর্বে। (১) নকাশী চুড়া (২) মাথার ফুল (৩) মাথার বাগান (৪) মাথার কাঁটা (৫) চিরুনি (৬) কানঝাপটা (৭) বাঁক (৮) ঠোকাই হার (৯) হাঁসলি হার (১০) কাটাই আর্মলেট (১১) জড়োয়া চুড়া (বাঙলা ঢঙ) (১২) কাটাই চেনহার (১৩) চিক ও রিস্টলেট (১৪) কানপাশা (১৫) মিনা টাব (১৬) কানবালা (১৭) টিকুলী (১৮) মাকড়ি (বাঙলা) (১৯) বাঙলা ইয়ারিং (২০) ঢেঁড়ি ঝুমকো (বাঙলা) (২১) কান ঝুমকো (২২) মণিপুরী মাকড়ি (২৩) কাটাই মাকড়ি (২৪) চুড় (২৫) বাঙলা চুড়ি (২৬) নকাশীবালা (২৭) মণিপুরী বালা (২৮) শীল ও ডাঁটি আংটি (২৯) মানতাসা (৩০) জড়োয়া ব্রেসলেট (৩১) তাগা ও জসম (৩২) বাঙলা পেণ্ডেণ্ট—এই বত্রিশটি গহনায় এখনকার বাঙালী কারিগরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে।

বঙ্গীয় লোকায়ত অলঙ্কার

লোকায়ত অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বাঙলার স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তালিকা এক বিরাট ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাবে তাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার যেমন শাঁখা, বলি ও রুলি দিয়ে

সুরু করা যেতে পারে। সোনার ধাতুক্ষয় বন্ধ করতে এবং বিবাহিতা হিন্দুনারীর হাতে বিচিত্র বর্ণ সৃষ্টি করতে শাঁখা ও রুলি একসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় শঙ্খশিল্পের আঞ্চলিক ঘরানাও সৃষ্টি হয়েছিল। বাশারেখি, কার্নিশদার, জলতরঙ্গ, হীরেকাটা এবং মকর চেহারা শাঁখা তখন বঙ্গললনার দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী ছিল। এছাড়া নানারকম গাছ ও লতাপাতার বীজ নির্যাস, কাণ্ড, বাদাম ইত্যাদি দিয়েও লৌকিক শিল্পীরা বিচিত্র অলঙ্কার তৈরি করে নেন। এই জাতীয় লোকায়ত অলঙ্কারের কোন কোনটি অবশ্য ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত। তবু বাঙালী-য়ানার দাবি অনুসারে, গাছের বীজ তক্ষণের সাহায্যে সুন্দর রূপ দেওয়ার বিবরণ আমাদের সাহিত্যে চিরকাল আছে। সেই কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ গুঞ্জা বা কুঁচ লাল সর্বজয়ার কালো বীজের সঙ্গে মিলিয়ে জপের মালা আজও গাঁথা হয়। গুঞ্জার মতই দেখতে হল রক্তবর্ণ রক্তকাঞ্চনের বীজ, যদিও ঈষৎ বৃহৎ, অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা ও কৃষ্ণবিন্দুরহিত। তবে রক্তকাঞ্চনের মালা ভারতের অন্যত্র চলে। সুগন্ধী তুলসীর বীজ ও কাঠ খোদাই করে যে কণ্ঠি বানানো হয় তা শুধু বৈষ্ণবের সাধন সহায়ক নয়. এক আশ্চর্য লোকশিল্পের নমুনাও বটে। তিসি বা মসিনা গাছের কাণ্ডের টুকরো দিয়ে রচিত নেকলেস একসময় কলকাতা থেকে রপ্তানী হত। শ্রীহট্ট অঞ্চলের 'বুড়ি' নামে পরিচিত ক্ষুদ্র কলসাকৃতি মটর দানা আকারের অতিকঠিন বীজকে সুকৌশলে সচ্ছিদ্র করে মালা পরানো হয় ছোটদের গলায়, এতে নাকি সার্বিক অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পদ্মবীজের মালা শুধু শিবের নয় সাধারণেরও কণ্ঠাভরণ। পুত্রঞ্জীব গাছের কালো বীচির মালা দীর্ঘজীবন কামনায় পুত্রদের গলায় পরানো হয়, ব্রাহ্মণেরাও পরেন। কাঠ ও আঠা দিয়ে নানারকম গহনা তৈরি হয়। বাসক গাছের কাঠ থেকেও সুন্দর মাল্যদানা তৈরি হয়। নিজেদের চিহ্নিত করার জন্য বেলগাছের ছাল ও কাঠ থেকে মাল্যদানা বানিয়ে ঘৃতকুমারীর আঁশের সুতো পরিয়ে মালা পরেন কেউ কেউ। শোলার টুকরো দিয়ে অজস্র গহনা তৈরি হয়। অবশ্য এ বস্তুর সর্বাধিক প্রয়োগ প্রতিমার ডাকের সাজে, কিন্তু মানুষের অঙ্গসজ্জাতে, জীবনের বিশেষ কোন মুহূর্তে কারো কারো কাছে এ বস্তু কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। সব শেষে সেই বিস্ময়কর গহনার কথা উল্লেখ করতে হয়। এককালে বাঙলার ধান্যসমৃদ্ধির চিহ্নস্বরূপ ধানের ছড়া দিয়ে মালা তৈরির রেওয়াজ আজও বর্তমান। প্রায় শতবর্ষ

আগে কলকাতায় আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বর্ধমানের গুশকরা অঞ্চল থেকে এ রকম একছড়া ধানের চেন পাঠানো হয়েছিল, তাই দেখে শহরের দেশী-বিদেশী মহল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

সাম্প্রতিক কালে অভিজাত এবং লোকায়ত উভয় অলঙ্কারের ক্ষেত্রেই অভাবনীয় পরিস্থিতি কিছু দেখা দিয়েছে। রত্নপ্রস্তর ব্যবহারের প্রতি ঝোঁক এবং গহনা-দোকানে জ্যোতিষীর অবস্থান আর এক দিকের ছবি তুলে ধরছে। তবু বলা যায়, কৃতী শিল্পীর অভাব আজও এই শিল্পে দেখা দেয়নি। বাঙলার অলঙ্কার শিল্প এখনো সমাজের বিকাশের ধারা ধরেই বয়ে চলেছে।

অঙ্গরাগ

খৃষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী আগের সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে জাতকের কাহিনীগুলোতে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, কুল্লবগ্‌গে, মহাবগ্‌গে, ব্রহ্মজাল সুত্তে এবং বিনয় পিটকে। উৎখননে পাওয়া সামগ্রী এবং এই সাহিত্যসম্ভার থেকে নরনারীর রূপসাধন ও অঙ্গরাগের বিচিত্র ইতিকথা আমরা জানতে পারি। মিশরে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, চার হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে সেখানে অঙ্গরাগ ও রূপসাধন প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে মাহেঞ্জদারো ও হরপ্পার খননে অঞ্জন, অঞ্জনশলাকা, অধররঞ্জনবর্তী (লিপষ্টিক), কপোলরক্ত-পিষ্টিকা (রুজপেষ্ট) প্রভৃতি রূপসাধনের উপাদান পাওয়া গেছে। মৌর্যপূর্ব ও মৌর্যযুগের বিত্তশালীর ঘরবাড়ির বিস্তারিত বর্ণনা, বিশেষ বিশেষ প্রকোষ্ঠের সাজসজ্জা ও সুরভিদ্রব্যের প্রসঙ্গ প্রাচীনসাহিত্যে দুর্লভ নয়। পালি ভাষায় তৎকালে একটি প্রচলিত কথা ছিল : 'মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ-ঠ্যাম '

রূপসাধন যুগে যুগে

ভারতবর্ষে চৌষট্টিকলার তালিকায় 'দশনবসনাঙ্গরাগ' একটি কলা-বিশেষরূপে স্বীকৃত। কামসূত্র, রতিরহস্য, অনঙ্গরঙ্গ, সঙ্গীত মকরন্দ, সঙ্গীত রত্নাকর, নাগরসর্বস্ব, পঞ্চসায়ক প্রভৃতি গ্রন্থে অঙ্গরাগ ও রূপসাধন বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। নানাবিধ দ্রব্যের মিশ্রণ ব্যবহারে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং উপাঙ্গ সুরভিত, সৌন্দর্যময় ও আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে বিলেপন ও অভ্যঞ্জনের যে প্রয়াস তাকেই বলা হয়েছে রূপসাধন ও অঙ্গরাগ। কখনো কখনো এর সীমানার মধ্যে রূপারোপও এসে গেছে। এই সূত্রে অঙ্গরচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—মুখ, হাত প্রভৃতিতে রঙ লাগানো হল অঙ্গরচনা। তখনকার দিনে রঙের সাহায্যে বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী বোঝাবার চেষ্টাও করা হত। সাধারণ দেবতা ও বিশেষ দেবতা অনুসারে যেমন গৌর ও

স্বর্ণবর্ণের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল তেমনি জাতি ও বর্ণ অনুসারে মর্ত্যবাসীদের বিভিন্ন রঙের সাহায্যে প্রভেদ নির্দেশ করা হত। এ ছাড়া গোঁফ-দাড়ির বৈচিত্র্য বড় কম ছিল না। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে যদি অভিলষিত ফল না পাওয়া যায় তখন মুখোশ ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটি মূলভাব অবলম্বন করে রূপসাধন ও অঙ্গরাগের যাবতীয় চিন্তা বর্ধিত হয়েছে। ভাবের হাত ধরে রসও এখানে এসে হাজির হয়েছে। যেমন, রাজা এবং তাঁর সমমানের ব্যক্তিকে সাত্বিক রূপদানের নির্দেশ আছে, এই রূপারোপের মূল রস বীর ও শৃঙ্গার।

ঐ তিনটি মূলভাবকে কেন্দ্র করে অঙ্গরাগের ক্ষেত্রসীমা ক্রমে বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। জীবিকা ও বৃত্তি অনুসারে রূপসাধনের কথা এসে গেছে। শুদ্ধ, বিচিত্র এবং মলিন এই তিন জাতি বিভাজন হয়েছে—আবরণ, আভরণ, অঙ্গরচনা ও রূপসাধনকে অবলম্বন করে। দেবপূজায়, মাঙ্গলিক রীতি পালনে, উৎসবে কর্মকাণ্ডে ও যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানে শুদ্ধ অঙ্গরাগের কথা বলা হয়েছে। দেব-দানব, যক্ষ-গন্ধর্ব, রাক্ষস-নৃপ প্রভৃতির অঙ্গরাগ হবে বিচিত্র। প্রমত্ত, উন্মত্ত, প্রবাসী, ব্যর্থমনোরথ এবং হতাশ পথিকের অঙ্গরাগ হবে মলিন।

ভরত কথা

পুরুষের বেশ ও অঙ্গরাগের সবিস্তার বর্ণনা রেখে গেছেন ভরত। রূপারোপে বর্ণ প্রয়োগ সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা আজকের দিনেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। তিনি বর্ণ, সংযোগজ বর্ণ এবং উপবর্ণ এই তিনটি প্রধান ভাগে যাবতীয় রঙকে বিভক্ত করেছেন। শ্বেত এবং নীলবর্ণ মিশ্রিত করলে হয় পাণ্ডুবর্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে পদ্মবর্ণ, পীত ও নীল সংযোগে হরিৎবর্ণ এবং নীল ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে হয় কষায় বর্ণ। এই সহজ মিশ্রণের বর্ণকে তিনি বলেছেন সংযোগজ বর্ণ। যখন দুটি বর্ণের মিশ্রণেও অভিপ্রেত বর্ণ পাওয়া সম্ভব হয় না তখন প্রয়োজন অনুসারে তিন বা চারটি বর্ণের সমাযোগ করা যেতে পারে এবং সেই মিশ্রিত বর্ণের অভিধা হয় উপবর্ণ।

ব্যক্তিগত রূপসাধন ও রূপারোপে মূলগত পার্থক্য থাকা সত্বেও বাস্তব-জীবনে সচরাচর যে অঙ্গরাগ প্রচলিত তারই বিশ্বস্ত অনুকরণ দেখা যায় রূপারোপের ক্ষেত্রে। রূপারোপে মুখচিত্রণ ভরতের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রসঙ্গত বর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর কথাও এসে গেছে। সবুজ

রঙ হয়েছে হরিতালের গুঁড়ো, নারকেল তেল এবং নীল মিশিয়ে, সিঁদুর চালের গুঁড়ো এবং নারকেল তেলের সংযোগে লাল এবং চালের গুঁড়ো ও খড়ি মিশিয়ে সাদা বা চুট্টি প্রস্তুত হয়েছে। বর্ণক বা রঞ্জক হিসাবে ব্যবহারের জন্য সোনা, রূপো, তামা, অভ্র, সীসে, লাক্ষা এবং হিঙ্গুল প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

রঙ্গদ্রব্যাণি কনকং রজতং তাম্রমেব চ।
অভ্রকংরাজবস্তং চ সিন্দুরং ত্রপুরেব চ॥
হরিতালং সুধা লাক্ষা তথা হিঙ্গুলকং নৃপ।
নীলং চ মনুজশ্রেষ্ঠ তথান্যে সন্ত্যনেকশঃ॥

রাজা বা সমমানের চরিত্রের মুখরঞ্জনে সবুজরঙের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখের সামনের দিক সবুজ এবং চোয়াল বরাবর সাদা রেখা বা চুট্টি দেওয়ার কথা বলা আছে। এই দুই বিপরীত বর্ণ আরো উজ্জ্বল করার জন্য ঠোঁট লাল এবং ভ্রূ কালো করতে হবে। কপালে থাকবে চাঁপা হলুদ রঙের তিলক। ইন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন এবং নল প্রভৃতির রূপারোপে এই রঞ্জক ব্যবহার্য। রাজা ও মহাপুরুষদের চক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত এবং তাঁদের হাত জালপাদের মত করতে হবে। ভ্রূ দুটির মধ্যে উর্ণা বা আবর্তচিহ্ন দেখানোর নির্দেশ দেওয়া আছে। দুটি হাতের মধ্যে তিনটি করে মনোহর রেখা দেখাতে হবে। কেশদাম হবে তরঙ্গের মত ভঙ্গিযুক্ত, সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রনীলমণির মতো বর্ণযুক্ত। চোখ মনোজ্ঞ, বিশাল, প্রসন্নতাব্যঞ্জক, কৃষ্ণবর্ণ তারাযুক্ত, পদ্মপাতার প্রান্তের মতো, ধনুরাকার, মাছের পেটের মতো ইত্যাদি নানা রকমের হতে পারে। এছাড়া রাজাদের গায়ে লোম হবে স্পষ্ট। মুনিঋষি হলে তাঁদের আকৃতিতে দুর্বলতা কিন্তু প্রকৃতিতে তেজস্বিতা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

শয়তান চরিত্রের মূল রস ধরা হয়েছে বীর ও রৌদ্র। এই চরিত্রের মুখে সবুজের ওপর লাল এবং তাকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য সাদা বহিঃরেখা দিতে হয়। রাবণ, শিশুপাল, কংস, কীচক প্রভৃতির রূপারোপে এই চিত্রণ হিংস্রতা ফুটিয়ে তোলে। মুখচিত্রণ শেষ হলে কখনো কখনো একটি লাল সরু কাপড় কপালের ওপর দিয়ে বেঁধে তার ওপরে আবার সাদা রেখা দেওয়া হয়। ভ্রূর ঠিক ওপরে লাল রেখা টানা হয়, নাকের মাঝখানে সাদা ও লালের নকশা করা হয়। গলায় লালরঙের চিত্রণ করা হয়।

রাক্ষসচরিত্র রূপারোপে সবচাইতে উজ্জ্বল এবং উৎকট রূপসাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য অনুসারে লাল, কালো এবং সাদা রঙের প্রয়োগ চলতে পারে। দুঃশাসন, বকাসুর প্রভৃতির জন্য লাল এবং ব্যাধ বা ঐ জাতীয় চরিত্রের জন্য কালোর ব্যবহার বিধেয়। এখানে মূল রস বীভৎস, রৌদ্র এবং ভয়ানক। কিন্তু হনুমান চরিত্রের বীর ও হাস্যভাব প্রকাশ করতে হলে চাই সাদা রঙ। পুতনা, তাড়কা, শূর্পনখা প্রভৃতি রাক্ষসীদের রূপারোপে রৌদ্র ও বীভৎস রস স্মরণে রেখে কালোরঙের ব্যবহার নিরাপদ।

দেবতাদের ক্ষেত্রে কোন উজ্জ্বল রঙ চলে না। এখানে মূল রস শান্ত ও শৃঙ্গার। কিছু কিছু উপকরণের সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ এক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। যেমন শিখাপাশ, শিখাজাল, পিণ্ডপাত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল, গবাক্ষক, বিচিত্র, শীর্ষজালক, শিখিপাত্র এবং বেণীকুণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা আছে। ললাটে তিলকরেখা, ভ্রূকক্ষার ওপর ফুলের অনুকারী গুচ্ছ দেওয়া কর্তব্য। গলায় তিলকা ও পত্ররেখা, চোখে অঞ্জন এবং অধররঞ্জন, পদতলে অঙ্গরচনা এই রূপারোপের বিশেষ নির্দেশ। তাছাড়া দুধ সাদা দাঁত ইত্যাদির কথা বলা আছে।

ভরত বলেছেন রূপসাধনে মাল্য একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাঁর মতে মাল্য হল পাঁচ রকমের—১। চেষ্টিত ২। বিতত ৩। সজ্ঘাত্য ৪। গ্রন্থিস এবং ৫। প্রলম্বিত। চেষ্টিত অর্থে সূক্ষ্ম ও হাল্কা, বিতত হল গ্রন্থিযুক্ত এবং প্রলম্বিত অর্থে লম্বমান বুঝিয়েছেন। আঞ্চলিক রূপসাধন সম্পর্কেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। অবন্তী যুবতীদের অলকযুক্ত কুণ্ডল, গৌড়ীয়াদের অলকের বাহুল্য, শিখাপাশ ও বেণী থাকবে, আভীর যুবতীদের দুটি বেণী এবং মাথা ঢাকা থাকবে। পূর্ব ও উত্তরদেশীয় পুরুষদের জুলপি এবং নারীর কেশগুচ্ছ থাকার কথা বলেছেন। রুদ্র, দ্রুহিণ ও স্কন্দ সোনা রঙে, বৃহস্পতি, শুক্র, বরুণ, সমুদ্র, হিমাচল, গঙ্গা এবং তারকাদের সাদারঙে রঞ্জিত করার কথা তিনি বলেছেন। নরনারায়ণ, বাসুকি, নগ, গুহ্যক, আকাশ, পিশাচ ও যমকে শ্যামবর্ণ করার এবং সপ্তদ্বীপের অধিবাসী পুরুষকে সোনালীরঙে রঞ্জিত করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। এরই সূত্র ধরে তাঁর আলোচনা ক্রমে আবরণ ও আভরণে প্রবেশ করেছে। এই দুটি বিষয়ই পৃথক এবং বিস্তৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

মুখচিত্রণের পর পুরুষের দাড়ি নিয়ে সনাতন শিল্পরসিক মাথা ঘামিয়েছেন।

যাবতীয় দাড়িকে তাঁরা শুক্ল, শ্যাম, বিচিত্র ও লোমশ এই চারটি ভাগে বিভাজিত করে দেখিয়েছেন। ব্রহ্মচারী বা তপস্বীর দাড়ি শ্বেতশুদ্ধ। মধ্য অবস্থায় উপস্থিত দীক্ষিত দিব্যপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, রাজা বা রাজকুমারের অনুজীবী, শৃঙ্গারী ও যৌবনোন্মাদের দাড়ি হল বিচিত্র। শ্বেত ও শ্যামের মিশ্রণে হয় বিচিত্র দাড়ি। দুঃখিত, হতভাগ্য, ব্যর্থ প্রভৃতির দাড়ি হল শ্যাম। ঋষি, তাপস, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদের দাড়ি লোমশ।

সঙ্গীত রত্নাকরে পাত্রের রূপসজ্জা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর ফুলে-ঢাকা চুলের ঢেউ আলুলায়িতভাবে পিঠে এসে পড়বে। তাথেকে কখনো কখনো সুনীল স্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠবে। কপালে থাকবে তিলকের বিচিত্র সমারোহ। চোখে অঞ্জনরেখা, কর্ণমূলে তালপাতার ভূষণ। তাঁর দাঁতের উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতা চতুর্দিক ধাঁধিয়ে দেবে। গলায় শোভাবর্ধন করবে কস্তুরীচিত্রিত পত্রভঙ্গরেখা। মুক্তাহারে বেষ্টিত থাকবেন তিনি। সঙ্গীত মকরন্দে কুসুমশোভিত মৃদুল বেণী রচনার কথাও বলা হয়েছে। চোখের কোণ দীর্ঘ দেখানো, গালে নানা চিত্রণ, মুখমণ্ডলে গন্ধদ্রব্য ঘষা, রেণু ব্যবহার, গাত্রচিত্রণ, হাত ও পায়ের আঙুলের ডগা লাক্ষারসে রঞ্জিত করা ইত্যাদি অঙ্গরচনার কথা মহাবগ্‌গে বলা হয়েছে

বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে খৃষ্টাব্দের প্রথম দিককার ওপরতলার মানুষের অঙ্গরাগ ও রূপসাধনের যে চিত্র উপহার দিয়েছেন তা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। ঘুম থেকে উঠে এক ভদ্রলোক দেখছেন তাঁর ব্যবহারের জন্য অঙ্গরাগের সামগ্রী নির্দিষ্ট আসবাবের ওপর রাখা আছে। এতে রয়েছে অনুলেপন, শিকত-করণ্ডক অর্থাৎ মালার বাক্স, সৌগন্ধিক-পুটিকা বা আতরদান, মাতুলুঙ্গৎবচহ অর্থাৎ জামির লেবুর খোসা এবং পান। প্রাতঃকৃত্য সেরে তিনি দাঁত মাজলেন এবং অঙ্গপ্রসাধনে লিপ্ত হলেন। প্রথমে তিনি গায়ে চন্দন অথবা অনুরূপ কিছু মেখে নিলেন, এবার পরিধেয় সুরভিত করলেন ধূপের ধোঁয়ায়, মাল্য ধারণ করলেন, চোখে দিলেন অঞ্জন এবং ঠোঁটে লাক্ষারস। এরপর তিনি আয়নার সামনে দাঁড়ালেন, আত্মপ্রসাধনে বোধহয় সন্তুষ্ট হয়েছেন—কয়েকটি পান মুখে দিয়ে কর্মস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন। কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে সুরু করলেন স্নান-পর্ব। একদিন অন্তর তাঁর সর্বাঙ্গ মর্দন ও উৎসাদন করা হয়, তিনদিন অন্তর তিনি ফেনক অর্থাৎ সাবান জাতীয় বস্তু ব্যবহার করেন। পুরুষের অঙ্গরাগের এই বর্ণনা আরো দীর্ঘ হতে পারে, এ থেকে নারীর রূপসাধনের ফিরিস্তি

কেমন হবে সহজেই অনুমেয়।

অঙ্গরাগ ও রূপসাধনে আবহমানকাল স্নান বা নহাপণম্ প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি অধিকার করে আছে। মৌর্যযুগ থেকে রাজনাপিতরা রাজাদের কেশপরিচর্যা ছাড়াও স্নানাদি রূপসাধনের দায়িত্ব নিতেন। সাধারণ মানুষ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যরক্ষার জন্য ধারাস্নানে অভ্যস্ত ছিলেন। স্নানের ঘাটে তেলমালিশের জন্য পেশাদার লোক ছিল। ঘাটে একরকমের জলচৌকি থাকত, তাতে সুগন্ধী রেণু ছড়ানো। লোকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে সেই চৌকিতে গড়াগড়ি দিতে পারত। স্নানের সময় গা রগড়াবার জন্য কাঠের-হাত-জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করত। এই যন্ত্রেও সুরভিত রেণুস্তর থাকত। পিঠ আঁচড়াবার জন্য কুমীরের দাঁত দিয়ে তৈরী 'মল্লক' নামে এক ধরণের চিরুনি ব্যবহার করা হত। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মল্লক ব্যবহার করতে পারত না।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে ও মৌর্যযুগে গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা যে প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ অপ্রতুল নয়। উষ্ণ স্নানের ব্যবস্থা যেখানে করা হত তার নাম জন্তাঘর। একতলায় অনেকটা উঁচু পাটাতনের ওপর থাকত স্নানঘর। কারুকাজ করা সিঁড়ি বেয়ে স্নানঘরে পৌঁছতে হত। সেখানে ধূমনেত্তম বা চিম্‌নি থাকত এবং জল গরমের সবরকম সুবিধা ছিল. উষ্ণস্নানের পর শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য 'পরিবেণ' নামে একটি আলাদাঘরের ব্যবস্থা ওর মধ্যে থাকত। স্নানের পর চুণম বা সুগন্ধী রেণু ব্যবহার করা হত।

গন্ধদ্রব্য এবং সুগন্ধী তেল নিয়েও তৎকালে চিন্তার অবধি ছিল না। এই ব্যাপারে 'কাশিকচন্দন' ছিল অন্যতম প্রধান উপাদান। চন্দন তেল এবং চন্দনরেণুর (চুন্ন) খুবই চাহিদা ছিল। অন্য ধরনের সুগন্ধীর মধ্যে প্রিয়ঙ্গু ফুলের সুগন্ধী ছিল খ্যাতির চূড়ায়। সাধারণ কাজে ব্যবহার হত অগুরু এবং টগর। তবে একথা ঠিক, সুরভি দ্রব্য হিসাবে চন্দনকাঠের কাছাকাছি গুরুত্ব আর কারো ছিল না। অর্থশাস্ত্রে চন্দনের গুণগত পার্থক্য অনুসারে যে জাতিবিভাগ দেখানো হয়েছে তাতে ষোল রকম চন্দনের কথা আমরা জানতে পারি। বর্ণরক্ষক, সুগন্ধ, তাপনিয়ন্ত্রক, তাপগ্রাহক এবং চর্মের পক্ষে অশেষ উপকারী হিসাবে এই ষোল রকম চন্দন বর্ণিত হয়েছে। ১. সাতন—বৃষ্টির পরে মাটি-ভেজা গন্ধ এই চন্দনে ২. গোশিরষক—এটির গাঢ় লাল রঙ এবং মাছের মত গন্ধ ৩. হরিচন্দন—শুকপাখির পালকের রঙ (সবুজ-হলুদ) এই চন্দনের ৪. তারণস—এটি সবুজে-হলুদ রঙের

চন্দন ৫. গ্রামেরুক—গাঢ় লাল রঙ, ছাগলের প্রস্রাবের গন্ধ ৬. দৈবসভায়ক—পদ্মগন্ধ, রঙ লাল ৭. জাপক—দৈবসভায়কের অনুরূপ ৮. জোঙ্গক—মোলায়েম, লাল অথবা গাঢ় লাল রঙ ৯. তৌরূপ—জোঙ্গকের মত রঙ ১০. মালেয়ক—লালচে-সাদা রঙ ১১. কুচন্দন—খসখসে গা, এখনকার দিনে লালচন্দন বলতে যা বোঝায় সম্ভবত তাই ১২. কালপর্বতক—বর্ণনায় আছে যে, অতি সুন্দর দেখতে ১৩. কোশাকারপর্বতক—কালোরঙের চন্দন ১৪. শীতদকীয়—কালো রঙ, নরম, পদ্মগন্ধ ১৫. নাগপর্বতক—নাগপর্বতে জন্মায় ১৬. শাকল—আগুনে-লাল রঙ।

গাত্রচিত্রণ

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন জনপদ ও অন্যত্র বসবাসকারী মানুষের মধ্যে সরাসরি গাত্রচিত্রণ বা গাত্ররঙ্গোলির প্রচলন আছে। এই চিত্রণ প্রথম কোথায় কোন্ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কি কারণে দেখা দেয় সে সম্পর্কে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছনো না গেলেও কয়েকটি অনুমানের ক্ষেত্রে সমাজশাস্ত্রীদের মতৈক্য লক্ষিত হয়। আদিম মানুষ যখন আবরণ ও আভরণের ব্যবহার জানত না তখনো অজ্ঞাত শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা, রোগমুক্তি এবং হয়ত আপন সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহজাত তাগিদে গাত্রচিত্রণে তারা অভ্যস্ত ছিল। বলাবাহুল্য, মানব-সভ্যতার বিবিধ ধারা অনুসরণ করেই গাত্রচিত্রণের মূলগত উদ্দেশ্য সন্ধান সমাজশাস্ত্রীরা সুরু করেন। সম্প্রতি লোমেলের 'প্রি হিস্টরিক এণ্ড প্রিমিটিভ ম্যান' এবং গার্বিনির 'দি এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে মুদ্রিত ও আরো কয়েকটি প্রতিলিপি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অন্ধকারময় যুগ থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পার্থক্য, কৌমগত পার্থক্য, যাদুক্রিয়া এবং আপন দেহের সৌন্দর্য-সাধনের জন্য আদিম মানব-মানবী দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চিত্রণ, গোদানি, উল্কি, শ্রীনামম্, ট্যাটু, রসকলি, বাণচিহ্ন তিলক, তিরুনামম্, ইনসিগনিয়া এবং হরিমন্দির প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রচলন ঘটিয়েছে। বিবর্তনের পথ ধরে গাত্রচিত্রণের ভূমিকা এদেশে ও বিদেশে যুগে যুগে যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে এর রেখাঙ্কন শৈলীর।

সাধারণভাবে আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বিবিধগ্রন্থে ও বিশেষভাবে ধনপালের তিলকমঞ্জরীতে রঙ্গোলির তৎকালীন পদ্ধতি বর্ণনাকালে বলা হয়েছে স্বস্তিকা ষষ্ঠীদেবী এবং অষ্টমাতৃকার মূর্তি আঁকা শেষ হলে চতুর্দিকে 'রক্ষাভূতিরেখা'

দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে এই রক্ষাভূতিরেখা জাদুতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের আলোচনায় গাত্ররঙ্গোলির যে প্রচ্ছন্ন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে তাতে নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের ব্যাপারেও গাত্রচিত্রণের ভূমিকা অপরিসীম বলে বিবেচিত। কখনো কখনো গাত্ররঙ্গোলির মধ্যে চিত্রশিল্পের শেষকথা 'ভাব'কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'সুবিশুদ্ধা রেখা সংযতানি ভূষণানি উচিতক্রমাবর্ণ বিচ্ছিত্তিঃ পরিস্ফুটো ভাবাতিশয় ইতি। দুষ্করং চ চিত্রে ভাবারধনং...।' মানব-মানবীর দেহমণ্ডলে অভিপ্রেত ভাব ফুটিয়ে তুলতে রঙ্গোলির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের দেশে আদিবাসী সমাজ আবহমানকাল ধরে বহু প্রথা ও রীতির ধারক। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী উপজাতিদের মধ্যে গাত্ররঙ্গোলি কখনো বিবাহের প্রাক্ শর্ত, কখনো সামাজিক মর্যাদার একমাত্র চিহ্নস্বরূপ, আবার কখনো বা গর্ভবতীর অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত।

রঙ্গোলিরেখা স্থায়ী ও অস্থায়ী এই দুই রঙে বরাবর আঁকা হয়েছে। আদিবাসী সমাজে স্থায়ী রঙ্গোলিকে একমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরপক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন চিত্রণে অস্থায়ী রঙের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে। স্থায়ী রঙ্গোলিরেখায় নীল বা ভুষো রঙের রেখাঙ্কনের পর সামুদ্রিক প্রাণীর কাঁটা, গাছের কাঁটা বা সজারুর কাঁটা দিয়ে অঙ্কিত স্থান ছেঁদা করার প্রথা আছে। পরে সামান্য দুধ ক্ষতস্থানে লাগানো হয়। সম্প্রতি ব্যাটারিচালিত যন্ত্রে রেখাঙ্কন এবং ছিদ্রণ দুটি কাজই একসঙ্গে করা হয়। স্থায়ী রঙ্গোলিরেখার সর্বভারতীয় পরিচিতি উল্কি নামে। উল্কির প্রাথমিক অঙ্কনের সঙ্গে বাঙলাচিত্রধারার নৈকট্য সহজে চোখে পড়ে। বর্তমান আলোচক বছর দশেক আগে দধের বৈরাগীমেলায় বিষ্টু হাঘোরে নামে এক আদিবাসী উল্কিশিল্পীর সংস্পর্শে আসেন। উক্ত শিল্পী একটি খাতায় প্রায় পঞ্চাশটির মত প্রাথমিক রেখাঙ্কন করে দেন। চিত্রগুলি বিষয়ভাবনা এবং লিখনশৈলী উভয় দিক থেকেই বাঙলার সনাতন চৌকশ পটের স্বগোত্র।

অস্থায়ী রঙ্গোলিরেখায় চন্দন, নদীর পলি মাটি, খড়ি, এ্যালা, গেরি ও রাঙামাটি ব্যবহৃত হয়। অস্থায়ী গাত্রচিত্রণে মেহেদিপাতার রস আরেকটি দিকের ছবি তুলে ধরে। মেহেদি বা হেনার গাত্ররঙ্গোলি বাঙলাদেশে

তেমন জনপ্রিয় না হলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এর সামাজিক ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতে বিবাহের ঠিক আগের দিন পাত্রপাত্রী দুজনকে হেনা দিয়ে রঙ্গোলিরাগের প্রথা চালু আছে। উত্তর ভারতে কিন্তু কেবলমাত্র পাত্রীকে মেহেদিরেখায় সাজানো হয়। রাজস্থানে গর্ভবতী নারী অবশ্যই এই মেহেদির গাত্রচিত্রণে চিত্রিত হবেন। মেহেদির অস্থায়ী রঙ্গোলিরেখায় চন্দ্র, সূর্য, স্বস্তিকা ও সাপ হল প্রধান চিত্রবিষয়। উত্তর ও দক্ষিণভারতের সামাজিক গাত্ররঙ্গোলিতে রেখাগত পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার। উত্তর ভারত যখন চক্রাকার মোটিফের বিবিধ জটিল দিক নিয়ে ব্যস্ত তখন দক্ষিণ ভারত একটি বৃত্ত দিয়ে সূর্য এবং তার চারপাশে পিতৃপূজার মোটিফ কয়েকটি বিন্দু প্রয়োগ করে ক্ষান্ত হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মেহেদি বা হেনার প্রচলন মিশরে ঘটেছিল এবং এখনো বিশ্বের সেরা মেহেদি হিসাবে মিশরীয় মেহেদি বন্দিত।

ভারতবর্ষে আর্যধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় গাত্ররঙ্গোলির এক নতুন অভিজাত-ধারার প্রবর্তন ঘটে। বৈদিক যাগযজ্ঞের ভস্ম কপালে ধারণের মধ্যে এর সূত্রপাত এবং বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুদের বিভিন্ন শাখার সাম্প্রদায়িক চিহ্নের মধ্যে এর চরম বিকাশ ঘটে। অভিজাত এই ধারার যাত্রা অস্থায়ী রঙের জয়তিলক কপালে দিয়ে সুরু হয়। এক্ষেত্রে বিষ্ণুর ভক্তরা যে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যসৃষ্টি করেন তার তুলনা মেলা ভার। ১৮৮০-তে প্রকাশিত জি সি এম বার্ডউডের 'দি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল আর্টস অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে আমরা বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুর ধর্মীয় চুয়াত্তরটি চিহ্নসহ এক মনোজ্ঞ আলোচনা পাই। এ বিষয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পরে ওয়্যালি সাহেব ৪৩টি চিহ্নের প্রতিলিপিসহ একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা রাখেন। তাঁর আলোচনাটি একাধিক সরকারী গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এর কিছু পরে আঞ্চলিক কোষগ্রন্থগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। অবশ্য বার্ডউড থেকে সুরু করে কোষগ্রন্থ পর্যন্ত গাত্রচিত্রণ বা রঙ্গোলি সম্পর্কিত সবকটি আলোচনার রসদ জুগিয়েছে পাল ও পালোত্তরকালের মূর্তিভাস্কর্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় তন্ত্রপুরাণ-সাহিত্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারণের যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাতে হিন্দুশৈবের ত্রিপুণ্ড্রধারণ সম্ভবত প্রাচীনতম। চর্যায় বাণচিহ্নের সঙ্গে বর্ণনা বর্ণলিঙ্গ জড়িত এ প্রশ্নের সদুত্তর আজও পাওয়া যায়নি। হিন্দু নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠদিবসে তার মাথার তলায়

নতুন কাপড়ে কলুদচূণে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর লিখনের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক চিহ্নের গন্ধ রয়ে গেছে। পদ্মপুরাণে এই নামই স্নানান্তে দেহের দ্বাদশাঙ্গে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। সূর্যোপাসকদের চিহ্ন বেশ সরল। একটি দীর্ঘরেখা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আরেকটি রে মহারাষ্ট্রে গণপতির ভক্তরা যে চিহ্ন ধারণ করেন সেটি কিন্তু বল্লভপন্থী বৈষ্ণবদের চিহ্নের অনুরূপ। দুটি সরলরেখা জ্রর কাছে এসে ছোট বক্ররেখার দ্বারা যুক্ত হয়ে এই চিহ্ন তৈরি হয়েছে। আবার বড়কলৈ বৈষ্ণবের চিহ্ন হল দুটি সরলরেখা কোণাকুণি এসে একটি অলিখিত বিন্দুতে মিলন। শাক্তচিত্রণে যেমন শৈব প্রভাব স্পষ্ট তেমনি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শাক্তবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। যেমন শাক্ততন্ত্রের ধারণতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে শক্তিবাদীর রঙ্গোলি রেখায়। বিন্দু হল এই তত্ত্বের মূল। অন্যদিকে এই বিন্দুকে বিশ্বের শিল্পরসিক পিতৃপূজার মোটিফ হিসাবে গণ্য করেছেন। শাক্তদের আরেকটি জনপ্রিয় চিহ্ন হল ক্ষুদ্র মাত্রাযুক্ত স্বস্তিক। এই স্বস্তিকের মাত্রা আবার দীর্ঘ হয়ে জৈনদের চিহ্নে পরিণত হয়েছে। চক্র, ত্রিশূল, ক্রুশ এবং পদ্ম হয়েছে বৌদ্ধদের সবচাইতে প্রিয় ধর্মীয় চিহ্ন। এছাড়া কুলচিহ্নের দীর্ঘ তালিকা তো আছেই। তীর্থঙ্করদের লাঞ্ছনও এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। অভিজাত এই চিহ্নে প্রাচীন জাদুক্রিয়ার বেশকিছু রহস্যরেখার অধিগ্রহণ ঘটেছে। আদিবাসী ও লোক-সমাজের স্থায়ীরেখা এখানে অস্থায়ী রঙ্গোলিরেখায় পরিণত হয়েছে।

ভাস্কর্যের মুখাবয়বে রঙ্গোলি লাঞ্ছন কুষাণপূর্ব যুগে বিশেষ নজরে আসে না। কুষাণ ও বিলম্বিত আন্ধ্রধারায় কয়েকটি গান্ধার ভাস্কর্যে বুদ্ধের কপালে যে স্থায়ী বিন্দুতিলক ক্ষোদিত করা আছে তাকে নির্দ্বিধায় তিলক আখ্যা দেওয়া চলে না। এই বিন্দুতিলক গুপ্তযুগের ধাতুনির্মিত বুদ্ধ মূর্তিতেও দেখা গেছে। সম্ভবত শিল্পীর চোখে জ্রযুগলের মধ্যবর্তীস্থান এই বিন্দুতিলকের সাহায্যে সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে। বরবোদুরের বুদ্ধমূর্তিতে চক্রমোটিফ স্থায়ী রঙ্গোলির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র পাল ও পালোত্তর যুগের ভাস্কর্যে পুরাণ বর্ণিত সাম্প্রদায়িক স্থায়ী রঙ্গোলির লাঞ্ছন সর্বাধিক দেখা যায়। গুপ্তযুগের প্রাণীমূর্তির দেহে যে গতিশীল চক্রমোটিফ দেখা যায় পরবর্তীকালের ধর্মীয় লাঞ্ছনভাবনায় তার অবদান নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

রাঢ়বঙ্গের প্রায় সর্বত্র পার্বণ স্নানান্তে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বলরাম, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ ও কল্কির চন্দনছাপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ধারণ আজও প্রচলিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, সম্ভবত দশাবতারী তাস বা গঞ্জিফার অনুকরণে অবতারদের প্রতীকগুলি অঙ্গে চিহ্নিত করা হয়। কাঠের বা পিতলের ছাপে মীন, শঙ্খ, চক্র, কমণ্ডলু, পদ্ম, তরবারি এবং তীর চন্দন-তিলকে নরনারীর শোভা বর্ধন করে। এক্ষেত্রে সৌন্দর্যবৃদ্ধির ওপর নজর বেশী দেওয়া হয়েছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। যদি দশাবতারের প্রতীক ধারণই মূল কথা হত তাহলে কূর্ম প্রতীক কচ্ছপ, বলরাম প্রতীক গদা এবং রামের প্রতীক পরশু কিছুতেই বাদ পড়ে না। নান্দনিক কারণেই এদের ভুলে যাওয়া হয়েছে।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বের প্রাণীজগতে বা গৃহপালিত প্রাণীর দেহে প্রকৃতির খেয়ালে যদি ধর্মীয় চিহ্নের সামান্যতম যোগসূত্রও লক্ষিত হয় তাহলে সেই পশুপাখি বা মৎস্যাদিকে কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য করার রেওয়াজ আজও চালু আছ। এই সংস্কারের ফলে পরিচিত অগণিত মাছ, পাখি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব আখ্যায় প্রতিনিয়ত আখ্যাত হয়। গ্রামাঞ্চলের রেখাদার মাছ বোষ্টম মাছ হয়েছে এই নিয়মে যেমন শহরাঞ্চলে ষষ্ঠীর বাহন বেড়ালও শাক্ত বা শৈব আখ্যা পেতে বাধ্য হয়েছে।

গাত্ররঙ্গোলি বা চিত্রণ মানুষের অলঙ্কার চিন্তার প্রাথমিক স্তরে বিশেষ সহায়তা করেছিল এমন অনুমান অমূলক নয়। প্রকৃতির কোলে লালিত নরনারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত সৌন্দর্যচেতনা যদি গাত্রচিত্রণে সূচিত হয়ে থাকে তাহলে যুগে যুগে তার অভিলষিত পরিণতি ঘটেছে নিত্যনব অলঙ্কার ব্যবহারে। গাত্রচিত্রণের সূচনান্তর থেকে তার ঋদ্ধি এসে আত্মসমর্পণ করেছে অলঙ্কারের কাছে। আজ তাই সৌন্দর্যচেতনার যাত্রাপথে গাত্র-রঙ্গোলি আর নতুন প্রেরণা নয়। ধর্মীয় সংস্কারের বিধিনিষেধে সে বদ্ধ অস্তিত্বে বিরাজিত। প্রকৃতির কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে গাত্রচিত্রণের যাত্রা সুরু হয়েছে পরে প্রকৃতির দান ফুল ও লতাপাতা অলঙ্কারকে সরাসরি প্রেরণা জুগিয়েছে। আজও দারিদ্র্যলালিত লোকসমাজ মৃণাল বালা, কচি রিটের ভূষণ, লাউ-কুমড়োর ফুল, দাড়িম বীচি, তুলোর বীজ সগর্বে আপন শোভাবর্ধনে কাজে লাগান। তুলসী, ঘুর্ণি ও রুদ্রাক্ষের চন্দনছাপ গাত্রচিত্রণ ও অলঙ্কারভাবনার মিলনসেতু হিসাবে এখনো কাজ করে চলেছে। বিবাহের পাত্রপাত্রীকে চন্দনচর্চিত করতে গাত্ররঙ্গোলির আজও প্রধানতম সহায় লবঙ্গ।

শিল্পভাবনা

প্রাথমিক স্তরে আদিম ভয়ভাবনা গাত্রচিত্রণকে যেখানে পৌঁছে দিয়েছিল সেখান থেকে বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত নান্দনিক চেতনা তাকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে যায়, মধ্যযুগে এসে সৌন্দর্যবোধ মাথা নত করতে বাধ্য হয় সর্বগ্রাসী ধর্মচেতনার কাছে এবং সবশেষে ধর্মীয় লাঞ্ছনের সঙ্গে চিরায়ত সৌন্দর্য-চেতনার এক স্বস্তিকর বোঝাসন্ধি ঘটে। আমাদের গাত্রচিত্রণের ধারা যথাযথ অনুসরণ করলে এই অতি সরলীকৃত পর্ববিভাজন সম্ভবত স্বেচ্ছামূলক বলে বিবেচিত হয় না।

তিলক

সহজাত সৌন্দর্যচেতনা ও জাদুতন্ত্রের প্রতি একান্ত পক্ষপাতিত্বের ফলে গাত্ররঙ্গোলির যে বিচিত্র ধারা আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছিল মধ্যযুগের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সে শুধু স্তব্ধ হয়ে গেল তা নয়, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচ্ছন্ন নির্দেশে লোকমানস থেকে সংস্কৃত মানসলোকে উত্তরণের এক স্বৈরাচারী প্রবণতা তাতে আরোপিত হল। অস্থায়ী ভাল-চিত্রণ এবার লোকসমাজকে প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে পৌরাণিক বিধিনিষেধের ছত্র ছায়ায় লালিত হতে লাগল। এই নতুন পরিবেশে নবীকৃত ধর্মীয় অঙ্গরাগের নাম হল তিলক। ওদিকে ইতিহাসের মধ্যপর্বে পা দিয়ে ভীতত্রস্ত লোকসমাজ নিজেকে সহায়-সম্বলহীন মনে করে আবার যেন সেই জাদুতন্ত্রে মোহাবিষ্ট হল। অস্থায়ী গাত্রচিত্রণে সে আর তৃপ্ত হতে পারছে না, আত্মতুষ্টির আয়োজনে তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হল আদিম স্থায়ী চিত্রণের পথে। সংস্কৃত সমাজে তখন শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খলের অবাধ নৃত্য চলেছে, জাতিপ্রথা পরিণত হয়েছে জাতিভেদে। কবিকঙ্কণের ভাষায় বলা যায়:

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে, শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে, চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥'

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সূর্যোপাসক সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যযুগীয় শাস্ত্রনির্দেশের অন্যতম ছিল তিলকধারণ। পাপ-পুণ্যের নিরিখে তিলকবিধির কর্তব্যাকর্তব্য তখন নির্ধারিত হয়েছে। শিবধর্মে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ ভস্ম দ্বারা কপালে ত্রিপুণ্ড্রক রচনা করে সে সর্বপাপমুক্ত হয় এবং শেষপর্যন্ত শিবধাম প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যপুরাণের মতে, সমস্ত সাধকই যজ্ঞভস্ম দিয়ে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করবে, যজ্ঞভস্মের অভাবে মাটি, চন্দন এবং জল দিয়ে

তিলক পরা কর্তব্য। গৌতমীয়ে লিখিত আছে, তিলক রক্তবর্ণ গন্ধ বা চন্দন দ্বারা করা উচিত। কপালে ইষ্টদেবতার অস্ত্রাকৃতি তিলক, হৃদয়ে শ্রীং বীজ এবং কণ্ঠে হ্রীং বীজ লেখা কর্তব্য। ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ না করে স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি কোন বৈদিক কাজের অনুষ্ঠান করেন তাহলে তা বিফল হতে বাধ্য। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর মতে যে শিবসাধক অসম্পূর্ণ ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করেন তাঁর ধর্মাদি চতুর্বর্গলাভ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ত্রিপুণ্ড্রকের পরিচিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শব্দকল্পদ্রুমের বক্তব্য হল, ভস্মাদি দ্বারা কৃত কপালের তির্যক রেখাত্রয়ের নাম ত্রিপুণ্ড্রক। ভস্মত্রিপুণ্ড্র এবং রুদ্রাক্ষমালা ছাড়া মহাদেবও যদি পূজিত হন তবে তা অসিদ্ধ হয়। সুতরাং অন্তত মাটি দিয়ে কপালে ত্রিপুণ্ড্রক করা কর্তব্য, তির্থাদিতত্ত্বে এই কথাই বলা হয়েছে। মাটি দিয়ে উর্ধ্বপুণ্ড্র এবং ভস্ম দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র করা উচিত। নাগোজীভট্টধৃত সুতসংহিতায় বলা হয়েছে, শিবদীক্ষিতরা তির্যক-ত্রিপুণ্ড্র এবং বিষ্ণুদীক্ষিতরা উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করবে।

তিলক প্রসঙ্গে শব্দকল্প বলেছেন, চন্দনাদি দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গকর্তব্যের চিহ্নের নাম তিলক। অমরের মতে তমালপত্র, চিত্রক এবং বিশেষক হল তিলকচিহ্নের পর্যায়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বলা হয়েছে স্নানান্তে বিষ্ণু-উপাসক দেবের দ্বাদশনাম দ্বাদশ অঙ্গে তিলক হিসাবে ধারণ করবে। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ পাশে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কাঁধে ত্রিবিক্রম, বামে পাশে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম কাঁধে হৃষীকেশ, পিঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর তিলক বিধেয়। আবার হরিভক্তিবিলাসে এই দ্বাদশাঙ্গ তিলক প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পদ্মপুরাণের সঙ্গে স্থানে স্থানে তার পার্থক্য রয়েছে। দ্বাদশাঙ্গে ললাটাদৌ তিলকং হরিমন্দিরম্। স্নানান্তে বৈষ্ণবঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং কৃষ্ণনামভিঃ॥ বামে বক্ষসি নেত্রান্তে গণ্ডেহংসে শঙ্খচিহ্নিতম্। তথৈব দক্ষিণে কুর্য্যাদ্ধরেশ্চক্রাঙ্কিতং মুনে॥ ললাটে কেশবং বিন্দ্যাৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্। বামবাহৌ বাসুদেবং সব্যে দামোদরস্তথা॥ নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব মাধবং হৃদয়ে তথা। গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে বামে চৈব ত্রিবিক্রমম্॥ বিষ্ণুং সব্যে কর্ণমূলে দক্ষিণে মধুসূদনম। শিরোমধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ॥ হরিমন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিলকস্তূর্দ্ধ-পুণ্ড্রাখ্যাং মধ্যছিদ্রে হি নারদ। যদি কুর্য্যাল্ললাটে তদ্বিজ্ঞেয়ং হরিমন্দিরম্।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংশোধিত হরকুমার ঠাকুরের হরতত্ত্বদীধিতিঃ গ্রন্থের

তৃতীয় সংস্করণে তিলক প্রসঙ্গে যে বিস্তারিত বিবরণ রাখা আছে তাতে তিলকধারণ বিধি, ব্রাহ্মণাদিভেদে তিলকভেদ, উধ্ব´পুণ্ড্র লক্ষণ, স্ত্রীলোকের তিলকবিধি, তিলকের বর্ণভেদ, ফলাতিশয়, ত্রিপুণ্ড্রের প্রকারভেদ, ধারণফল, ত্রিপুণ্ড্র সাধন এবং দ্বিজেতরের উধ্ব´পুণ্ড্র নিষেধ সম্পর্কিত প্রায় যাবতীয় আর্যাচার একত্রিত করা হয়েছে। লোকসমাজ থেকে অস্থায়ীচিত্রণ কেমনভাবে সংস্কৃতসমাজের আধিপত্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বে দেখার চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের এই পর্বে এসে দেখা গেল তিলকধারণ ব্যাপারে জাতিভেদে কি প্রবল আকার নিয়েছে। বর্ণভেদ অনুসারে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে ব্রাহ্মণেরা উধ্ব´পুণ্ড্র, ক্ষত্রিয়রা ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্ধচন্দ্রপুণ্ড্র এবং শূদ্র বর্তুলাকার তিলক ধারণ করবে। ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ না করে যে যে কাজ করে তা নেহাৎই অফলপ্রসূ শ্রম বলে বিবেচিত হয়।

মৎস্যসূক্তে উধ্ব´পুণ্ড্রের লক্ষণ বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঐ সূক্তমতে নাক থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তিলককে উধ্ব´পুণ্ড্র বলা হয়। এখানে হরিমন্দিরের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং সামন্তরাল হরিপদাকৃতি অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। এর অভাব নিশ্চিত দোষাগম সূচিত করে। দ্বিজাধম করবেন নিরন্তরাল উধ্ব´পুণ্ড্র। স্ত্রীলোক শুভদর্শনে দণ্ডাকার সছিদ্র উধ্ব´পুণ্ড্র ধারণ করবেন। উধ্ব´পুণ্ড্রের বর্ণভেদ এবং ফল বিষয়েও ঐ সূক্তে বলা হয়েছে। শ্যামবর্ণ উধ্ব´পুণ্ড্র শান্তিকর, রক্তবর্ণ বশ্যকর, পীতবর্ণ শ্রীবৃদ্ধিকর এবং শ্বেতবর্ণ মোক্ষপ্রদ। ত্রিপুণ্ড্রের রেখার ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর অধোরেখা তামসী, মধ্যরেখা রাজসী এবং উধ্ব´রেখা সাত্বিকী।

প্রাচীন, মধ্য ও পরমধ্যযুগের সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে প্রসঙ্গ এলেই তিলকতত্ত্ব বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে। তবে মধ্যযুগে বর্ণভেদের ওপর শাস্ত্রশাসন যে গুরুত্ব দান করেছিল তিলকের মধ্যে সহজেই তা ধরা পড়েছে। শিবার্চনচন্দ্রিকা যামলে ও শাশ্বততন্ত্রে এই ভেদতত্ত্ব স্পষ্ট ও মুখর হয়েছে। একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্র এই ভেদবাদকে গ্রহণ, লালন ও সঞ্চারণের দায়িত্ব মধ্যযুগে হাতে তুলে নিয়েছিল। অবশ্য এই ভেদবাদকে অঙ্গীকার করেই সম্প্রদায়গত লাঞ্ছন-বৈচিত্র্য তিলকে দেখা দেয়। বিষ্ণুদীক্ষিতদের তিলকবিধির বিচিত্রতা যেমন অনন্ত তেমনি সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে ধর্মচেতনার মেলবন্ধনের প্রয়াস পরম বিস্ময়কর।

তাই অলকা-তিলকায় 'সুমনোহর' কথাটি পর্যন্ত এসে গেছে। অনাসামূল-মাশ্রিত্য শিরোমধ্যগতং মুনে। হরিপদাকৃতং নাসামূলমারভ্য যত্নতঃ। হরিমন্দিরবৎ সর্বংতদ্রাধাবল্লভীয়কম্। শ্রীরাধাবল্লভীয়ং যত্তিলকং সুমনোহরম্॥ রামানুজ সম্প্রদায় আবার তিলকের মধ্যে পীত রেখা দিয়ে সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে থাকেন। ওদিকে শ্রীরামোপসনা যস্ত তিলকং তূর্দ্ধপুণ্ড্রকম্ ভ্রুবোর্মধ্যে সবিন্দু স্যাদ্ যদি বিপ্র মনোহরম্॥ হরেঃ সর্বাবতারাণাং মৎসাদীনাং বিশেষতঃ। তিলকধারণ ব্যাপারে যে শাশ্বততন্ত্র জাতি ও বর্ণভেদের কঠোর নির্দেশ রাখল সেখানেও মজার ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। একবার বলা হল নারী, পতিত শূদ্র অথবা অন্ত্যজরা যদি উধ্বর্পুণ্ড্র ধারণ করে তবে নরকপ্রাপ্ত হবে। আবার পরমুহূর্তে বলা হচ্ছে, যাঁর ঋজু সৌম্য ললাটে উধ্বর্পুণ্ড্র আঁকা থাকে সেই ব্যক্তি চণ্ডাল হলেও শুদ্ধাত্মা এবং পূজ্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একেবারে স্পষ্ট করে চণ্ডালের উধ্বর্পুণ্ড্র ধারণের কথা বলা হয়েছে। ইতিহাস ধারায় এই ইঙ্গিত পালযুগোত্তর ভঙ্গবৌদ্ধ শৈবসিদ্ধা ও কাপালিক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে করা হয়েছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। আরো একটু এগিয়ে বলা যায়, পৌরাণিক ধর্মান্ধতার বহু আগে থেকে এখানকার বেশ কিছুসংখ্যক ভূমিসন্তান প্রতীকী তিলকধারণে অভ্যস্ত ছিলেন। চর্যায় সেই বাণচিহ্ন প্রাচীন প্রতীকী তিলকের কথাই স্মরণ করায়।

দেবদেবীর অঙ্গরাগে তিলক কখনো কখনো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি ধর্মপূজায়ও তিলকবিধি প্রসঙ্গ হয়েছে। হরিদাস পালিত সংগৃহীত ধর্মপূজা পদ্ধতিতে তিলকের জন্য চন্দন ঘষার এক গান দেওয়া আছে। পুরোহিত বা ভক্তরা চন্দন ঘষতে ঘষতে এই গান গেয়ে থাকেন। এই গান বাদ দিয়ে চন্দন ঘষলে সেই চন্দন ধর্মঠাকুরের তিলকে চলেনা। গানটির সূত্রপাত এই রকম :

বসুদান পবিত্র পবিত্র কর টিকা।
যাহা হৈতে হৈল প্রিয়ে শিবের অম্বিকা॥
পাষাণের পীঠখানি বিশ্বকর্মার নির্মাণ।
তাহাতে চন্দন ঘষে পণ্ডিত চারিজন॥

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সব শাখাতেই কোন না কোনভাবে তিলকের কথা এসে পড়েছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, শাস্ত্রশাসন এক্ষেত্রে যে পুরোপুরি মানা হয়েছে এমন নয়। বরং বলা যায় বেশিরভাগ

ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শোভাবৃদ্ধি কবিদের তিলক বর্ণনায় উৎসাহিত করেছে। দ্বিজ কালিদাস কালিকামঙ্গলে শিবের সন্ন্যাসীবেশে গৌরী-ছলনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

আজানু লম্বিত জটা কপালের রুধির ফোঁটা
রুধিরের অর্ধচন্দ্র ভালে।
খুলে ফেলে বাঘাম্বর পরিলেন রক্তাম্বর
রুদ্রাক্ষের মালা পরে গলে ॥

কিংবা বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে দেবীর গোয়ালিনী সাজ স্মরণ করা যেতে পারে : চন্দন লেপিয়া অঙ্গ, কপালে তিলক রঙ্গ…ইত্যাদি। গঙ্গাদাস সেন পদ্মাকে সাজাতে গিয়ে বলেছেন :

কপালে তিলক শোভা ময়ূরপুচ্ছের আভা
যেন দেখি পূর্ণ চান্দ্রিমা।

শাস্ত্রীয় নির্দেশকে একরকম অগ্রাহ্য করেই এই তিলক বর্ণনা। বিশেষ করে, মধ্যযুগে বাঙালী কবিদের তিলকতত্ত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ হয় সজ্ঞানে শাস্ত্রনির্দেশ অগ্রাহ্য অথবা তৎসম্পর্কে অজ্ঞতা সূচিত করে। এই প্রসঙ্গে কাশীরাম দাসের একটি মনোরম চিত্রোপহার স্মরণ করা যেতে পারে : মোহিনীবেশী শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের মিলনে হরিহর রূপচিত্রণে বলা হয়েছে,

কৌস্তুভ তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধগলে হাড়মাল অর্দ্ধ বনমালা ॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলি কুণ্ডল।
শ্রীবৎস লাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল ॥
অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ কটি পীতাম্বর ॥

আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে আপাত সম্পর্কহীন হওয়া সত্বেও জ্যোতিষশাস্ত্রের তিলকতত্ত্ব (তিলতত্ত্ব নয়) সম্ভবত প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। বাহ্যিক উপাদান ছাড়া কপালে প্রকৃতিদত্ত যে রেখা নিয়ে শিশুর বয়োবৃদ্ধি ঘটে কোন কোন ভারতীয় জ্যোতিষগ্রন্থ সেই রেখাগুলিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহতিলক হিসাবে গণ্য এবং ঐ তিলকগত ফলাফলও বর্ণনা করেছে। ১. চুলের নিচে কপালের প্রথম রেখাটি শনিতিলক। ২. পরেরটি বৃহস্পতিতিলক। ৩. তার পরের রেখা মঙ্গলতিলক। ৪. ডান ভ্রূর ওপরে হল রবিতিলক। ৫. বাঁ ভ্রূর ওপরে চন্দ্রতিলক। ৬. দুই ভ্রূর

মধ্যবর্তী রেখা শুক্রতিলক। ৭. নাকের মাঝের রেখাটি বুধতিলক। শনিতিলক স্পষ্ট ও ঋজু হলে জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা বোঝায়, বৃহস্পতি ইঙ্গিত করে সততা ও সরলতা, মঙ্গল যুদ্ধক্ষেত্রে যশ, রবি কাজে সফলতা, চন্দ্র কল্পনাশক্তি ও ভ্রমণ, শুক্র ইঙ্গিত করে মধুর প্রকৃতি এবং বুধ তিলক বাগ্মিতা সূচিত করে। বলাবাহুল্য, এই তিলকরেখা অস্পষ্ট ও বাঁকা হলে বিপরীত ফলাফলের সম্ভাবনার কথাই বলা হয়েছে।

শিশুতোষ শিল্পসম্ভার

শিল্পকলা প্রসঙ্গে আমাদের কল্পনায় যে জগতের ছবি ভেসে ওঠে, বিবর্তনের ইতিহাস ও রূপসংগঠনের বিচারে তার আবশ্যিক অনুষঙ্গরূপে কেবলমাত্র পরিণতবয়স্ক মানুষের প্রয়াস, ধ্যানকল্পনা, অভীপ্সা ও প্রয়োজনের কথা আমাদের মনে জাগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে শিল্প ও কারুকলার নির্মাণ, পরিকল্পনা ও ভোগের বিষয়ে বয়স্কদের ভূমিকা মুখ্য এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্র হলেও এমন এক ধরণের শিল্পসম্ভার চিরকাল তৈরি হয়েছে যার উদ্দীষ্ট ভোক্তা বয়স্করা নয়, পরন্তু শিশু, বালক ও কিশোরের দল এবং সেই সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, সেই সব বয়স্ক মানুষ বা বয়স্ক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মন যার বয়স চিরদিনই বাড়তে নারাজ।

ধূসর অতীত থেকে মহাকাশ অভিযানের সময় পর্যন্ত কত বিচিত্র ও বিপুলসংখ্যক শিশুতোষ শিল্পসম্ভার যে মানুষ রচনা করেছে তার কোন শেষ নেই। ব্যক্তিগত ও প্রজাতিগত বৃদ্ধি বা অগ্রগতি সত্বেও মানুষ যে তার অনভিজ্ঞ, বিস্মিত-মুগ্ধতাপ্রবণ ও সারল্যময় শিশুকাল ভুলতে কিংবা ভাল না বেসে থাকতে পারেনা, পূর্ণতাকামী পরিণতবয়স্ক মানবসমাজের শিশু চিত্তাকর্ষক শিল্পসামগ্রী রচনায় সনাতন আগ্রহ ও প্রয়াস তার অকাট্য প্রমাণ। আমাদের গুহাবাসী আদিম পূর্বপুরুষ হয়ত শিশুসন্তানের মনোরঞ্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়ে গুহাগাত্রে গতিময় চিত্রগুলি এঁকেছিলেন, কাঠকুটো, পাথর, হাড় কিংবা কাদামাটি দিয়ে যে প্রতিমূর্তি গড়েছিলেন হয়ত তা-ই আমাদের আদিমতম ক্রীড়নক বা পুত্তলিকা। মানুষের শিল্পকলার অগ্রগতি, বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদ্যা ও নির্মাণকৌশলের প্রভূত উন্নতির ফলে কালক্রমে যে সব আশ্চর্যজনক শিশুতোষ শিল্পসম্ভার সৃষ্টি হয়েছে তা সেই সনাতন প্রয়াসের ক্রমপরিণতি। স্থান-কাল-জাতি নির্বিশেষে শিশুপ্রকৃতির (ও শিশুপ্রেমা স্নেহের) যে এক চিরায়ত ও বিশ্বগত রূপ আছে তার কোন মৌল পরিবর্তন ঘটেনি। সমস্তরকম বহিরঙ্গ বিবর্তনের অন্তরালে শিশুপ্রেম, শৈশবপ্রীতি ও বাল্যকেন্দ্রিক কল্পনার প্রভাব

শিল্পীদের একাংশকে আবহমানকাল এই ধরণের শিল্পরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ভোক্তার দিক থেকে দেখলে খেলনা ও পুতুল নিছক ছেলে-ভুলোনো সামগ্রী নয়; প্রিয়শিশুর আনন্দবিধান ও চিত্তবিনোদনের এক অত্যাবশ্যক ও অদ্বিতীয় সাধন হওয়া ছাড়াও এর এক নিগূঢ় তাৎপর্য রয়েছে, এবং তা নিহিত আছে বিগত শৈশব ও মুগ্ধসারল্যের প্রতি মানুষের অনির্বচনীয় মমত্ব ও করুণ পিছুটানের মধ্যে। পৃথিবীর বুকে আগন্তুক নবীন প্রাণের সোপকরণ ক্রীড়াভ্যাসের মূলে গভীর অর্থবহ সংস্কার, প্রেরণা ও প্রবণতা কাজ করছে, যার প্রভাব বয়স্কচিত্তেও প্রগাঢ়। মানুষের চিরন্তন স্বপ্নকল্পনার যে জগৎ কেবল দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায় অথচ ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে, অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনা দিয়ে গড়া শিল্পবস্তুর অতীন্দ্রিয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সেই জগতের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভের জন্য আমাদের রঙ্গপ্রিয় ও লীলাপ্রবণ অস্তিত্ব দুর্মর ব্যাকুল; সাধের জগৎকে সাধ্যের সকরুণ আয়ত্তে আনার জন্য আমাদের প্রয়াস এক প্রতীকী চেহারা নেয়; অনুকরণজনিত অনুকূল পরিবেশ রচনার দ্বারা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্মত সংযোগস্থাপন ও পরিচয়লাভের জন্য সে নিরন্তর প্রয়াস করে থাকে। এইসব দীর্ঘকালীন অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা মানুষকে চিরকাল ক্রীড়নক ও পুত্তলিকার নিজস্ব জগতের মায়ায় বেঁধে রেখেছে ও রাখবে। যতদিন শিশু আছে মানুষের শিশুমন ও শিশুপ্রীতি আছে, ততদিন পুতুল ও খেলনা থাকবে।

শিশুতোষ শিল্পসম্ভারের লক্ষণ ও ধর্ম

অল্পবয়সে মানুষ খেলনা বা পুতুল পেয়েই খুশি, তার তত্ত্ব বা তাৎপর্য তার কাছে স্বভাবতঃই তখন অবান্তর। কিন্তু কোন কোন বয়স্ক ব্যক্তির মনে তাঁর ক্রম-অপস্রিয়মান মোহময় শৈশবের জন্য যে বিষণ্ণ বেদনা ও সকরুণ অভাববোধের সঞ্চার হয়, তার ফলে শৈশবসঙ্গী ঐসব তুচ্ছ কিন্তু আবেগমূল্যে গরিয়ান্ শিল্পসামগ্রী এক নতুন তাৎপর্য ধারণ করে। অজ্ঞান, মুগ্ধ শিশুর কাছে ক্রীড়াবস্তুর যে মূল্য বা গুরুত্ব তা অবহেলার না হলেও, জগতের অভিজ্ঞতায় জর্জর, সময়ের পলায়নপটুতায় খিন্ন এবং স্বভাবের অনায়াস সারল্যের স্মৃতিপীড়িত অথচ নষ্ট-বিস্ময়ের পুনরুদ্ধারে অক্ষম বয়স্কজনের কাছে তার অর্থ ও ঐশ্বর্য অবশ্যই ভিন্নতর ও গুরুতর। ক্রীড়নক ও পুত্তলিকা সম্পর্কে বয়স্কগোষ্ঠীর একাংশ যেমন আজীবন কাতরতাভোগী, তেমনি আবার এই বিষয়ে বয়স্কচিন্তা নানাবিধ বিশ্লেষণ ও তত্ত্বাবিষ্কারে ব্যাপৃত।

পুত্তলিকা ও ক্রীড়নকের ধর্মে একদিকে যেমন আছে বিনোদক শক্তি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে উদ্ভটকল্পনা ও অনুকরণস্পৃহার এক বিচিত্র সমাবেশ। শিশুর নিরুদ্বেগ ও আত্মমগ্ন জগতে পুতুল ও খেলনা হল নিত্যসঙ্গী, সেই জগতের তারা স্রষ্টা এবং সৃষ্টবস্তু, এক পরম আনন্দময় ও মনোরঞ্জক উপচার, অবসরের বিশ্বস্ত বন্ধু। ক্রীড়ননকের লক্ষণ বিচারে বলা যেতে পারে, শিশুর কল্পনাকে নাড়া দিয়ে তাকে ক্রীড়োৎসাহে উদ্দীপ্ত করতে পারে এমন যে কোন বস্তুই ক্রীড়নক পদবাচ্য।

পুতুলখেলায় অনুকরণ ছাড়া প্রশিক্ষণের ভূমিকা রয়েছে। কেউ কেউ এমন কথা বলেছেন যে, আদিতম খেলার উৎপত্তি হয়েছিল আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। পশুজগতে উদ্বর্তনের জন্য অপরিহার্য শারীরিক কসরৎ ও চর্চা হল তাদের স্বভাবজ ক্রীড়া। মানুষের সমাজেও যুগে যুগে খেলা ও খেলনার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বরক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেবার প্রয়াস পাওয়া হয়। মেয়েদের পুতুলখেলায় নারীসুলভ গার্হস্থ্য ধর্ম বা কৃত্যের হাতেখড়ি ঘটে।

সত্যিকারের শিশুতোষ শিল্পসম্ভারের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে মোট তিনটি শ্রেণী বিভাজনের মধ্যে এরা পড়ে। ১. বিল্ডিং ব্লকস জাতীয় যেসব খেলনা শিশুর কল্পনাকে সহজেই উদ্দীপ্ত করে ও তার মধ্যে উদ্যমের সঞ্চার করে। ২. ছুরি, কাঁচি, জাঁতি প্রভৃতি যেসব খেলনা তাকে বয়স্কজনোচিত দক্ষতা অর্জনে সহায়ত করে। ৩. গঠনমূলক শিল্পসম্ভার যা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে লৌকিক শিশুতোষ সামগ্রীর গুরুত্ব স্মরণে আসা স্বাভাবিক। উপকরণের বাহুল্য ও ঐশ্বর্য, নির্মাণকৌশলের পারিপাট্য, বিস্ময়কর যন্ত্রনৈপুণ্যের ঘটা ইত্যাদি বিবিধ গুণগরিমায় সমৃদ্ধ অভিজাত সামগ্রীর তুলনায় লৌকিক সৃষ্টি যে বহিরঙ্গ বৈভব ও নির্মাণচাতুর্যে দীন হয়েও অনেকক্ষেত্রে শিশুচিত্ত অধিকতর আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তার কারণ শিল্পসম্ভারের উদ্দীপন সামর্থ্যের আসল বিচার বহুলাংশে নির্ভর করে আন্তর সম্পদ বিশেষত ভাবকল্পনার সাবলীল সংক্রমণে স্রষ্টার দক্ষতার ওপর। লোকায়তশিল্পীর অকৃত্রিম কল্পনা, অনাড়ম্বর প্রয়াস, সহজ নির্মাণ-রীতি ও সরল আবেদন অনায়াসেই শিল্পীর অন্তর্নিহিত শিশুমনের সঙ্গে উদ্দীষ্ট ভোক্তার শিশুসুলভ কল্পনার এক পরম উদ্দীপক সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়।

মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব

শিশুতোষ শিল্পসম্ভারের সঙ্গে শিশুর কল্পনার নিবিড় যোগের ব্যাপারটি নিয়ে বহুদিন ধরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলছে। সব রহস্যের মর্মোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু মানুষের জীবনবিকাশে এই শিল্পসামগ্রীর নিগূঢ় তাৎপর্যময় ভূমিকা বিশ্লেষিত হলে এগুলিকে যে ক্ষণিক মোহের মনোরঞ্জক বস্তুমাত্র বলে বর্ণনা করা যায় না, সে সত্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আত্মাভিব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন্ পথে হচ্ছে এবং সেইহেতু ভাবী আচার-আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কী রূপ নিতে চলেছে—এসব জটিল ও গোপন মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ও পরিণাম বোঝবার পক্ষে শিশুর ক্রীড়াভ্যাস ও ক্রীড়ার উপকরণ সংক্রান্ত আন্তর উদ্দীপনা ও বাহ্য প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি হল অপরিহার্য চাবিকাঠি।

চিরায়ত শিল্পনমুনা

সামাজিক বা গোষ্ঠীগত আচার, রীতি, প্রথা, পরিবেশ, প্রবণতা, বিশ্বাস প্রভৃতির পার্থক্য অনুযায়ী কোন শিল্পের ঢঙ, বিষয়বস্তু ও অভিব্যক্তি গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘকালীন খাতপ্রবাহের ফলে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে তা কালক্রমে এক নতুন শিল্প-ঐতিহ্যের জন্ম দেয়। শিশুরঞ্জনী প্রয়াসেও দেশ-কাল-জাতি-গোষ্ঠী ভেদে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য স্বভাবতই প্রত্যাশিত। সভ্যতার, বিশেষত প্রযুক্তিবিস্তার, অগ্রগতিতে এবং দেশকালগত বৈষম্য, উপকরণ, উপাদান, তরুলতা ও পশুপক্ষী ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, শিল্প-রীতি ও প্রবণতার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির গুণে শিল্পের অন্যান্য ধারার মতো শিশুতোষ শিল্পও বিবিধ বৈচিত্র্য লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পনমুনার এই বহিরঙ্গ অভিব্যক্তিক পার্থক্য সত্ত্বেও শিশুদের স্বপ্ন ও কল্পনার এমন এক আছে যা মূলত চিরায়ত এবং অপরিবর্তনীয়। শিশুর অন্তর্জগতের প্রতি সার্বকালিক ও সার্বজাগতিক রূপ অভিনিবেশই যেহেতু শিশুতোষ শিল্পের মূল প্রেরণা, অতএব সেই চিরন্তন শিশুমানসের রহস্যলোকের অভীপ্সাসমন্বিত শিশুশিল্পবিষয়ক ধ্যানকল্পনা স্বভাবত একই কেন্দ্রীয় ধারণার উপলব্ধি ও রূপ-কল্পের সাধনায় ব্যাপৃত হতে চেয়েছে। তার পরিণামে খেলনা ও পুতুলের বিবর্তনধারায় দেশ-কাল-জাতিগত বৈচিত্র্যকে ছাপিয়ে কতকগুলি সার্বভৌম বুনিয়াদী বা মৌলিক রূপ নিদর্শনের পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ঘটেছে।

সর্বকালে, সর্বদেশে ও সভ্যতায় জনপ্রিয় হয়েছে এমন ধরণের শিল্প হল

ঝুমঝুমি ও বল। এই দুটিই ফল, বাদাম বা লাউ জাতীয় উদ্ভিজ্জের সরল গোলকাকৃতি থেকে উদ্ভূত। বল তৈরি করতে গেলে গোল করে কেটে নিতে হয়, আর ঝুমঝুমির বেলায় শুকনো বীজগুলি ভেতরে রেখে দেওয়া হয়। প্রাচীন ও আধুনিক উভয়যুগের ঝুমঝুমির মধ্যে এমন সাদৃশ্য বর্তমান যে একে সম্ভবত সবচেয়ে পরিবর্তনহীন ক্রীড়াসামগ্রী বলা চলে। আমাদের দেশে উৎখননে পাওয়া পুরাসামগ্রীর প্রাচীনতম নমুনার মধ্যেও শিশুতোষ শিল্পের উপস্থিতি লক্ষ্য করার বিষয়। সিন্ধু সভ্যতায় এবং পরবর্তী মৌর্য যুগের শিল্পসামগ্রীর মধ্যে দুচাকাঅলা গাড়ী, ভেড়া, বাঁদর, হরিণ, নানা জাতের পাখি, উট ও ভাল্লুক, জীবজন্তুর মুণ্ডে চাকা লাগানো ঝুমঝুমি পুতুল, বাঘের পিঠে মন্দিরের আকৃতিযুক্ত খেলার রথ, হাতির মাথায় ফাঁপা ঝুমঝুমি খেলনা গাড়ী, এবং অগণিত নাম-না-জানা পাখির মাথায় খেলনা-রথ প্রভৃতি পোড়ামাটির পুরাবস্তু রয়েছে। শুঙ্গ ও শুঙ্গ-কুষাণ আমলের অসাধারণ শিশুরঞ্জক শিল্পসামগ্রী পাওয়া গেছে কলকাতার কাছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে।

ঝুমঝুমি ও বলের মতো সবদেশে সর্বকালে শিশুপ্রিয় ক্রীড়নক হল লাট্টু জাতীয় বস্তু। পৃথিবীর প্রায় সবদেশে অসংখ্য ধরণের লাট্টু দেখা গেছে। লাট্টুর জন্ম কোন্ দেশে এবং কবে তা নিয়ে বিবিধ অভিমত প্রচলিত আছে। তবে চীন এবং জাপানের দাবী এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি। ভারতীয় পুরাসামগ্রীর মধ্যে খেলার গাড়ী ও রথজাতীয় যে পুতুল এগুলিরও বিশ্বব্যাপী শিশুরঞ্জক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। গৃহপালিত জন্তুজানোয়ারের প্রতিরূপাত্মক পুতুল কিংবা টানা খেলনা সর্বকালের, সর্বদেশের স্বীকৃত শিশুবিনোদক শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে। সওয়ার সমেত বা একাকী ঘোড়া ও ঘোড়ায় টানা রথ সমর-ঐতিহ্য সমন্বিত ভূমিখণ্ডে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। গৃহাশ্রিত অথবা মুক্ত প্রাকৃতিকপরিবেশে স্বচ্ছন্দবিহারী পাখি শিশুর কল্পনার মধ্যে বিস্ময়মিশ্রিত আগ্রহের সঞ্চার করেছে। তাই খেলনা বা পুতুল হিসাবে পাখির প্রচলিত আকৃতি ও গঠনসৌকর্য বরাবর শিশু মনোরঞ্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে পাখির আকৃতি এক মূল আদর্শ হিসাবে কাজ করে অগণিত সদৃশ আকৃতির জন্ম দিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা থেকে সুরু করে পাঁচমুড়োর আজকের পুতুলে, পোটোদের জো-পুতুলে এই মূল আদর্শ কার্যকর রয়েছে। অহিছত্রের পুরাসামগ্রীতে রয়েছে এর নমুনা, রয়েছে পূর্বভারতের প্রায় সব কয়টি পুরাতীর্থে লব্ধ সামগ্রীতে।

লোকায়ত ধারা

শিশুর প্রকৃতি সর্বত্র ও সর্বকালে মূলত এক, শিশুসুলভ সারল্য ও অকৃত্রিমতা যাদের স্বভাবের সহজাত বৈশিষ্ট্য সেই লোকসমাজ তেমনি এক অদৃশ্য, আত্মিক, মানসিক ও প্রাণিক ঐক্য ও সৌষম্যের বন্ধনে আবদ্ধ। বিভিন্ন দেশের ও একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগের লোকায়ত শিল্পপ্রয়াসের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ও কেন্দ্রীয়ভাবের পৌনঃপুনিক আবির্ভাব দেখা যায়। যে সামান্য পার্থক্য কখনো কখনো নজর আসে তা নিঃসন্দেহে স্থানিক ধারার বিশিষ্ট প্রভাবের পরিণাম। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, বিদূষক জাতীয় কয়েকটি আঞ্চলিক ক্রীড়নকের কথা বাদ দিলে যাবতীয় প্রধান প্রধান ভারতীয় লোকায়ত শিশুতোষ শিল্পের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পসম্ভারের এক প্রবল সাদৃশ্য বর্তমান। শুধু আমাদের দেশ নয়, চীন, জাপান, মেক্সিকো, পর্তুগাল, পেরু, আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে ও সাধারণভাবে অনগ্রসর আদিবাসীদের মধ্যে এখনো যে পুতুল ও খেলনা দেখতে পাওয়া যায় তার বৈচিত্র্য, কল্পনাসমৃদ্ধি, শিল্প আবেদন ও নির্মাণ নৈপুণ্যের পেছনে ঐ সাদৃশ্য তত্ত্বের সমর্থন মেলে।

যন্ত্রবিজ্ঞান নির্ভর শিল্পসভ্যতার প্রভাব যেখানে তেমন পড়েনি, সেইসব লৌকিক শিল্পসৃষ্টি যে নির্মাণশৈলী ও বিষয় নির্বাচনে এক আদিম ও অকৃত্রিম সারল্যপ্রসূত আত্মীয়তার বন্ধনে সাদৃশ্যলাঞ্ছিত হবে তা অস্বীকারের উপায় নেই। কিন্তু লোকশিল্পের প্রকৃত ঐক্য বহিরঙ্গ সাদৃশ্যনির্ভর ততটা নয় যতটা আন্তর ভাবনির্ভর। আদিম সারল্য যেখানে যে পরিমাণে পারিপার্শ্বিক ব্যবধান বা বৈষম্যমূলক বিকাশের প্রভাবে বিনষ্ট ও কৃত্রিমতাযুক্ত, লোক-শিল্পও সেখানে ঠিক তদনুপাতে উক্ত মৌলিক ও সহজাত ঐক্যের ভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। কোনরকম বাহ্যসংযোগ ছাড়া যে রহস্যময় প্রণালীতে লৌকিক পুরাণগাথা বা ধর্মীয় ঐতিহ্যসমূহ পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে আবির্ভূত বা তিরোহিত হয়ে এক বিশ্বব্যাপী অভিন্ন লোকমানসের রূপ ফুটিয়ে তুলেছে, পুতুল ও খেলনার সার্বত্ব তারই অনুরূপ এক প্রক্রিয়া।

ভারত তথা পূর্বভারতীয় ঐতিহ্য

শিশুতোষ শিল্পসম্ভারে যা মুখ্য ভূমিকা নিয়ে আছে সেই পুতুল বলতে আমাদের দেশে ছোট মূর্তিমাত্রকে ধরা হয়েছে। এই শ্রেণীতে মুখোশ বা মুখা থেকে সুরু করে মন্দিরের গায়ের ফলক পর্যন্ত এসে পড়ে। মাটি, কাঠ,

ধাতু, কাপড়, ঘাস, শোলা, কাগজ ও কাগজের মণ্ড, পাথর, পিটুলি, সর-ননী, সন্দেশ ও গোবর যুগে যুগে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ পুতুল যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি আবার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পুতুল অজস্র জন্ম নিয়েছে। সাহিত্যের পাতায় পুত্তলিকার উল্লেখ পুরাতাত্ত্বিক খননকে সমর্থন জানিয়েছে অসংখ্যবার। কথাসরিৎ-সাগরের শিশু সোমপ্রভ ক্ষেপে গিয়ে এক সাধুকে ছুঁড়ে মেরেছিল তার অতিসাধের মাটির পুতুল হাতিটি। জাতকের কাহিনীতে কোশল রাজকুমার তার মামাবাড়ি থেকে পুতুল উপহার না পেয়ে মার কাছে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কালিদাসের নাটকে রয়েছে মাটির পুতুলের একাধিক প্রসঙ্গ। নাচের পুতুলের কথাও বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্বভারতীয় পুতুলের মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণী বিভাজন করা হয়। ১. ক্ষুদ্রাকার দেবদেবী পুতুল—এগুলি পূজোর জন্য তৈরি না করে খেলার উদ্দেশ্যে করা হয়। সাধারণত কৃষ্ণ, রাধা, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গৌরনিতাই, কালী, গণেশ এবং কখনো কখনো লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি গড়া হয়। ২. ক্ষুদ্রাকার মানুষ পুতুল—আহ্লাদী-পেহ্লাদী, মা, মা ও ছেলে, বরবৌ, বেনেবৌ, বুড়োবুড়ী, বেহাই-বেয়ান প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। ৩. পশু মূর্তি—গৃহপালিত পশুপাখি থেকে সুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশে মুক্ত যাবতীয় প্রাণী, উদ্ভট কল্পনার প্রাণী এই শ্রেণীর পুতুলের অন্তর্ভুক্ত। ৪. নাচা-দোলা মূর্তি—এই শ্রেণীর পুতুলে শরীরের বিশেষ অঙ্গের নড়চড়া, মাথা দোলানো, কোমর দোলানো প্রভৃতি দেখা যায়। মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুরের নাচের পুতুল কিন্তু নৃত্যভঙ্গীমায় স্থির থাকে, নড়ে চড়ে না। ৫. সাজসজ্জার পুতুল—এই শ্রেণীর পুতুল সবসময়ে যে অভিজাত উৎসের তা নয় অনেকক্ষেত্রে লোকায়তধারার পুতুল দিয়ে গৃহসজ্জার কাজ সমাধা করা হয়। বাঁকুড়ার পাঁচমোড়া, রাজগ্রাম, মুরলী, মেদিনীপুরের নাড়াজোল, চব্বিশ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর, বীরভূমের রাজনগর, মুর্শিদাবাদের কাঁটালিয়া প্রভৃতি স্থানের লৌকিক পুতুল গৃহসজ্জার সূত্রে আধুনিক পরিমণ্ডলে ঠাঁই পেয়ে যায়। এছাড়া বৃহৎপ্রাণীর মাটির তৈরি মাথা এবং অঙ্কিতচিত্রের মৃণ্ময় সংস্করণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৬. বিবিধ—পশুর চামড়া, ঝিনুক, শিং, হাড়, হাতির দাঁত, গালা, বাঁশ ও বেত প্রভৃতি দিয়ে নানারকম পুতুল তৈরি হয়।

প্রতীকী মূর্তি ও শিশুতোষ শিল্প

শিশু যেমন পুতুল ও খেলনার ওপর প্রতীকী অর্থ আরোপ করে তেমনি আবার প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুসমূহ বয়স্কসৃষ্ট ও মূলত বয়স্কব্যবহার্য হয়েও অনেকক্ষেত্রে ভক্তিবিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্য হারিয়ে ঘটনাচক্রে বা অনুষ্ঠানান্তে শিশুদের হাতে পড়ে নিছক শিশুভোগ্য ক্রীড়াসামগ্রীতে পর্যবসিত হয়েছে। মেক্সিকোতে মৃতের স্মরণার্থে অনুষ্ঠিত এক পার্বণে করোটি, সমাধিস্তম্ভ ও দেবদূতের আকারে চিনি দিয়ে অনেক শ্রম ও যত্নে যে সুন্দর সুন্দর ধর্মীয় প্রতীক নির্মাণ করা হয়, শিশুরা সেগুলিকে ব্যবহার করে খেলনা হিসাবে এবং শেষপর্যন্ত তা উদরস্থ করে ফেলে। এই সূত্রে স্মরণে আসে বাঙলার দোলপার্বণে নির্মিত চিনির তৈরি দেবদেবীর মূর্তি ও মঠমন্দির। ক্রিস্টমাস ট্রি-র সাজসজ্জা, ঈস্টারের উপহার ছেঁদা কৃত্রিম ডিম, নেপলসের শ্রমসাধ্য মূর্তির সম্ভারে সুসজ্জিত ক্রেশ বা শিশুভবন, হোপি ইণ্ডিয়ানদের একশ্রেণীর পরম্পরাগত প্রাচীন পুতুল এবং বাঙলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রত ও পালপার্বণে ব্যবহৃত পুতুল, সরঞ্জাম, বৃক্ষ কাণ্ডপত্রাদি নির্মিত বিভিন্ন আধার ও আকৃতিসমূহ হল ধর্মীয় বা জাদুতন্ত্র সম্পর্কিত ক্রীড়াসামগ্রীতে রূপান্তরের নিদর্শন। কোন কোন ধরণের ঝুমঝুমিকে অতীতে শব্দের সাহায্যে ভূতপ্রেত তাড়াবার কাজেও নাকি ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও তাতে তাদের ক্রীড়ামূল্য মোটেও কমেনি।

বিদেশে কেউ কেউ বলেছেন, পুতুলের তথাকথিত সংরক্ষিত প্রাচীনতম নমুনাগুলি আজকের ধারণা অনুযায়ী আগের কালে মোটেও খেলার সামগ্রী ছিল না, বরং মুখ্যত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পৃক্ত ধর্মীয় মূর্তি ছিল। শিশুর ক্রীড়াসঙ্গী হতে এদের সহস্র সহস্র বছর সময় লেগে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক কোন শিশুসমাধি থেকে পুতুলের সন্ধান না পাওয়ায় এবং জাদুক্রিয়ায় ছোট মূর্তি বা প্রতিরূপের ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এই পণ্ডিতবর্গের ধারণা হয়েছে যে, কৃত্রিম মনুষ্যাকৃতির জাদুগুণে ব্যাপকভাবে বিশ্বাসী প্রাচীন যুগে বয়স্ক অভিভাবকেরা নিশ্চয় ঐ রহস্যময় বস্তুকে শিশুক্রীড়ার আওতার বাইরে রাখাটা নিরাপদ ও শ্রেয় মনে করেছেন। অবশ্য মানবাকৃতি পুতুলকে শিশুদের কাছ থেকে বেশি দিন দূরে রাখা হয়ত সম্ভব হত না। শিশুর ক্রীড়াপ্রবণতা ও উদ্ভটকল্পনা এত প্রবল যে পুতুল ও প্রতিমা তার কাছে একাকার হতে কতক্ষণ? বয়স্কদের পক্ষে তেমনি ধর্মীয় বা আনুষ্ঠানিক কাজ মিটে গেলে কয়েক ধরণের মূর্তি খেলার জন্য শিশুদের হাতে তুলে

দেবার আবদার প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। ইতিহাসের প্রথমযুগেই পুতুল শিশুর ক্রীড়া তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। মিশরের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র থেকে পুতুলের প্রাচীনতম সংরক্ষিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। অবশ্য পেরুতে শিশুদের সমাধিক্ষেত্রে পাওয়া উজ্জ্বল পোশাক পরা ছোট ছোট মাটির পুতুল এবং ছোট ছোট মিশরীয় মূর্তিগুলি সচরাচর ভৃত্যবাচক প্রতিকৃতি হত।

মৃতের প্রতিরূপ যেমন অভিজ্ঞানস্বরূপ, জীবন্তব্যক্তির প্রতিরূপ তেমনি জাদুক্রিয়া ও নানাবিধ অন্ধ সংস্কারমূলক গুহ্যক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সাধন। বাস্তবব্যক্তির পৌত্তলিক প্রতিনিধির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করলে রক্তমাংসের মানুষটিও আঘাতের বেদনা ও পরিণাম ভুগবে, এ বিশ্বাস নানাদেশে নানাবিধ জাদুক্রিয়ার কারণ হয়েছে। আবার বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে চীন ও জাপানে নিজ পরিবারের সকলের নাম করে কাগজের প্রতিরূপ তৈরি করে দুনিয়ার তাবৎ ব্যাধি তাতে আরোপ করা হত এবং শেষে সেগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হত এই বিশ্বাসে যে এর ফলে উদ্দীষ্ট স্বজনবর্গ ঐসব রোগের বালাই থেকে চিরটাকাল মুক্ত থাকবে। অবশ্য জাপানে পুতুল বা খেলনা নিছক ক্রীড়াবস্তু হিসাবে কদাচ ব্যবহার হত, জটিল ধর্মীয় আচার ও উৎসব অনুষ্ঠানের এরা অঙ্গস্বরূপ। জাপানের অনেকগুলি প্রাচীন বা পরম্পরাগত পুতুল কোন না কোন জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। দূরপ্রাচ্যের প্রাচীন পুতুলের যে নিদর্শন মিলেছে তাও ধর্মীয় তাৎপর্যময়। চীন ও কোরীয় ভাষায় পুতুল শব্দটির মূল আর প্রতিমা বা ভক্তিযোগ্য বস্তুবাচক শব্দের মূল একই।

শিশুতোষ শিল্পের ঐতিহাসিক বিবর্তন

শিশুরঞ্জক শিল্পসামগ্রীর ঐতিহাসিক বিবর্তন একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক অন্বীক্ষার বিষয়। এই প্রসঙ্গে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার যেসব নিদর্শন রয়ে গেছে তার কথা প্রথমেই এসে পড়ে। হাতির দাঁত থেকে সুরু করে সোনা, ব্রোঞ্জ, মাটি, কাঠ ও মিশ্রণজাত উপাদান দিয়ে তৈরি বল, লাট্টু, জন্তুজানোয়ারের আকৃতিমূলক টানা খেলনা ও পুতুল প্রভৃতি নানারকম ক্রীড়া উপকরণে সমৃদ্ধ ও আনন্দোচ্ছল ছিল মিশরীয় শিশুদের জীবন। কাঠের তৈরি রঙীন গরু এবং কাঠ ও পোড়ামাটির সাদামাটা ঘোড়া মিশরে পাওয়া যেত। প্রাচীন যুগের মাটির ঘোড়া এবং কাঠের তৈরি আধুনিক লৌকিক খেলনার মধ্যে আশ্চর্য মিল বর্তমান, হয়ত মধ্যযুগের

টুর্নামেন্ট ঘোড়া এদের যোগসূত্র রচনা করেছে। মিশর থেকে আরো যেসব খেলনা পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আছে পালিশ করা মিশ্রকাচের হাল্কা নীল অত্যন্ত মনোজ্ঞ একটি ইঁদুর, চুণাপাথরে তৈরি রথচালনায় নিরত এক বানর, সোনার গলবন্ধযুক্ত একটি হাতির দাঁতের কুকুর ও বাঘ, বিড়াল, কুমীর প্রভৃতি। আমাদের সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে অগণিত পশুপাখির মূর্তি পাওয়া গেছে যার কিছু অংশের উদ্দীষ্ট ভোক্তা ছিল সেযুগের শিশুরা। কয়েকটি মুখোশের সন্ধানও এইসঙ্গে পাওয়া গেছে।

স্থির প্রাণীর পরবর্তী স্তরে এল গতিশীল প্রাণী। প্রাচীনতম সরল আকৃতিযুক্ত প্রাণীকে চাকার ওপর বসিয়ে সচল করা হল এবং এই সঙ্গে এল দড়ি দিয়ে টানা খেলনা। সিন্ধু সভ্যতায় চাকাঅলা দড়ি টানা গাড়ীর নমুনা পাওয়া গেছে। অক্ষদণ্ড ও কীলকযুক্ত বা বেরিয়ে আসা টাবযুক্ত চাকার ওপরে বসানো ঘোড়ার খেলনা আলেকজান্দ্রিয়া ম্যুজিয়ামে রাখা আছে এবং তার বয়স কাল ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। মিশর ও অন্যান্য সমুদ্রঘেরা প্রাচীন জাতির শিল্পীরা খেলার নৌকো তৈরি করত, তবে মিশরে বোধহয় এটি ছিল ধর্মীয় প্রতীক।

গ্রীক ও রোমক সভ্যতা শিশু, বালক ও তরুণদের আনন্দবিধানের জন্য যেমন তেমনি সমর ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের শরীরচর্চা, শারীর দক্ষতা ও তৎপরতাবৃদ্ধি প্রভৃতির উদ্দেশ্য নিয়েও খেলা ও আমোদপ্রমোদের সুপরিকল্পিত আয়োজন করত। এই দুই দেশে হাড়, কাঠ, সীসে, ব্রোঞ্জ, চামড়া ও মাটি প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে নানা ধরণের খেলনা তৈরি করা হত। গ্রীস ও রোমে বয়ঃসন্ধিকালে শৈশবের পুতুল ও খেলনা বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত, আর শৈশবে মৃত্যু ঘটলে তা নিবেদিত হত পাতালের দেবতাদের উদ্দেশ্যে। গ্রীক ও রোমান শিশুরা গৃহপালিত জন্তুর খুব ভক্ত ছিল, সম্ভবত সেই কারণে তাদের খেলনায় আসেপাশের জান্তব আকৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। পোড়ামাটির ঘোড়া ছিল বিশেষ প্রিয়, তাছাড়া ছিল খরগোশ, হাঁস, ঘুঘু, মোরগ, গরু, ষাঁড়, ছাগল, ভেড়া, শূয়োর, হরিণ প্রভৃতি পশ্বাকৃতি খেলনা। পেঁচা, শূয়োর এবং কচ্ছপের আদলে তৈরি ঝুমঝুমিও ছিল, যেমন ছিল দোলনায় শিশু ও হংসারূঢ় বালকের মূর্তিসমন্বিত ঝুমঝুমি। পোড়ামাটির তৈরি প্রাচীন গ্রীক পুতুলের সঙ্গে আজকের জোড়া দেওয়া পুতুলের মিল সহজেই চোখে পড়বে। দড়ি ও তার দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি স্বতন্ত্রভাবে এঁটে দেওয়া হত। আমাদের

সনাতন নাচের পুতুলে এই ধারাই অবলম্বিত হত। রোমের পুতুল সাধারণত মাটির তৈরি হত, কখনো কখনো তাতে রঙ করা থাকত। সে যুগের কিছু কাপড়ের পুতুল আজও টি'কে আছে। রোমান আমলে ক্ষুদ্রাকৃতি আসবাবের অস্তিত্ব থেকে কেউ কেউ খেলাঘরের বাড়ীর প্রচলন অনুমান করেছেন। রোমান যোদ্ধৃ-সদৃশ অতি ক্ষুদ্র মূর্তি স্পেন, জার্মানি, ব্রিটেন ও আবিসিনিয়াতে পাওয়া গেছে। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি গ্রীকসাম্রাজ্যে নৌকো খেলনার মধ্যে সহজে স্থান পেয়েছে। শান্ত রসের খেলনার মধ্যে ছিল ওবুলি কাঠের ছাউনিঅলা গাড়ী, নাকে ছ্যাঁদা টানার ঘোড়া, পিঠে ঝুলিসমেত ঘোড়া ও বানর। গ্রীস ও রোমে বলের প্রচলন ছিল। চামড়ার মোড়কে পশম দিয়ে তৈরি হত তাদের বল। শিশুপ্রিয় খেলনার মধ্যে লাট্টু ছিল অন্যতম। অদ্ভুতদর্শন বস্তু দিয়ে শিশুচিত্ত বিনোদনের প্রয়াস তখন যথেষ্ট ছিল। এই যুগের প্রাচীর চিত্রে মুখোশ হাতে শিশুর ছবি প্রায়ই দেখা যায়। পুতুলনাচের প্রচলনও ছিল এই যুগে। রোমের অদ্ভুত পর্যায়ের মূর্তিগুলি ছিল একান্তভাবে হাস্যোদ্দীপক। ভাবীজীবনের প্রস্তুতি, শরীরচর্চা, জান্তব সাহচর্যের প্রতিরূপ প্রভৃতির দিকে নজর দিয়ে শিশুচিত্ত বিনোদনে অদ্ভুত দর্শন খেলনা পর্যন্ত নিবেদিত হত।

আমাদের দেশে কমবেশি খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের শিল্পনমুনা হিসাবে যে পুতুলগুলি স্বীকৃত তার অধিকাংশ সরলীকৃত এবং অনায়াস কারুকর্মের নমুনা। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান, বেলুচিস্থান, মাহেঞ্জদারো-হরপ্পা এবং ঝোব ও কুল্লি থেকে এগুলি সংগৃহীত। এই আদিম চেহারার পুতুলগুলি মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ পর্বে এসে যেন সম্পূর্ণ ভোল পাল্টিয়ে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল। পূর্ব ভারতের প্রায় সব কয়টি পুরাতীর্থ থেকে এই সময়কার পোড়ামাটির অগণিত পুতুল পাওয়া গেছে। নিরেট ও ছাঁচে গড়া এই ক্ষুদ্রাকার মূর্তি যেন ভাবীকালে বড়ো আকারে মূর্তি আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করতে এসেছিল। বস্তুত ক্ষুদ্রাকার পুতুল ও বড়ো আকারের মূর্তির মধ্যে আমাদের দেশে কোন শিল্পশৈলীর প্রভেদ ছিল না। দেবদেবীদের বাহনগুলির প্রতি এক পলক নজর দিলে মনে হবে খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের সেই প্রাণীমূর্তিগুলি যেন বড়ো হয়ে এখানে বাহনের ভূমিকা পালন করেছে। গুপ্তযুগে এসে বাঙলার পুতুলের ডৌল আরও অনেক পরিণত হয়েছে, ওজনে এগুলি হয়েছে অনেক হাল্কা। পাল-সেন যুগে পরিণত হাতের পুতুলশিল্প দেবায়তনিক শিল্পে বহিরঙ্গ সজ্জায় উপকরণে দাঁড়িয়েছে।

দূর প্রাচ্য ও শিশুতোষ শিল্প

পৃথিবীর শিশুতোষ শিল্পসম্ভারে দূর প্রাচ্যের অবদান প্রসঙ্গত স্মরণীয়। মিশরের মতোই জটিল সভ্যতার নিলয় চীনদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা ধরণের খেলনা প্রচলিত ছিল। চীনে তরুণদের জীবন ছিল বৈচিত্র্যময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। লেত্তি দিয়ে ঘোরানো লাট্টুর জন্ম চীনে, কেউ কেউ অবশ্য জাপানে বলে মনে করেন। প্রাচ্যে লাট্টু ঘোরানোর পদ্ধতি হল দড়ি দিয়ে, আঙুলের সাহায্যে নয়। দড়ি দিয়ে টানা জন্তুর খেলনার উৎপত্তি সম্ভবত এশিয়ায়, এই সংক্রান্ত নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবনের এক স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল এশিয়াবাসীর।

চীন ও জাপানে ঘুড়ির চিরায়ত জনপ্রিয়তা ও বিবিধ প্রয়োগ এই সূত্রে প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। জাপানে পুতুল ও খেলনার ইতিহাস যেমন প্রাচীন তেমনি দীর্ঘ। তবে জাপানে তথাকথিত শিশুতোষ শিল্প শুধু ক্রীড়াবস্তু ছিল না, জটিল ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান ও উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রাচীনতম জাপানী খেলনা হল পৌরাণিক উৎস সমন্বিত সোমিন-শোরাই নামক একটি সরল কাঠের খেলনা। এর আকৃতি সুতো কাটার তকলির মতো, এর ছয়টি মুখের প্রত্যেকটিতে সোমিন-শোরাই কথাগুলি খোদিত। এর মূল উদ্দেশ্য হল অশুভ আত্মার বিতাড়ন বা নিবারণ। দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে ধর্মীয় বা জাদু সম্পর্কিত পুতুলের প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। হিনা মাৎসুরি নামক জাপানী পুতুল উৎসবের কেন্দ্র হল এমন একগোছা আনুষ্ঠানিক পুতুল যা পুরুষানুক্রমে বংশধরগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে আসছেন। এইসব উৎসবের বয়েস কমপক্ষে হাজার বছর, আর এই সম্পর্কিত কিংবদন্তী আরো পুরনো। উৎসবগুলি যে প্রারম্ভে সম্রাটের পূজার অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষণীয় যে, আজও জাপানের দুটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুতুল হল সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্তি (এই সূত্রে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ভাদু ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজারাণী পূজা স্মরণে আসে)। জাপানে জাদুশক্তিসম্পন্ন ঐতিহ্যাশ্রয়ী খেলনা অঢেল, কোনটি দীর্ঘায়ুপ্রদ, কোনটি হাম প্রভৃতি ব্যাধি থেকে শিশুদের রক্ষাকারী, কোনটি নির্দিষ্ট অমঙ্গল নিবারক, কোনটি বা মায়েদের দেওয়া হয় সন্তানদের আধিব্যাধি থেকে রক্ষা করার জন্য। উর্বরতার দেবের উদ্দেশ্যে বন্ধ্যা নারী কর্তৃক মন্দিরের বেদীতে নিবেদিত হত উত্তর

জাপানের যে কাঠের তৈরি শিশু পুতুল তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। গ্রামবাঙলার 'থান'গুলিও এই সূত্রে স্মরণে আসে।

মধ্যযুগ ও শিশুতোষশিল্প

শিশুদের ক্রীড়নকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকলেও মধ্যযুগের শিশুতোষ শিল্প হয়ে পড়েছিল নিতান্ত খাপছাড়া ও নিষ্প্রভ। আগের মতো দ্যুতিমান্, চরম উৎকর্ষ সম্পন্ন, বীরত্বব্যঞ্জক, মর্যাদা সম্পন্ন বা প্রত্যয়শীল খেলার সামগ্রীর দেখা তেমন মিলছিল না। পাশ্চাত্যভূখণ্ডে গ্রীস ও রোমের স্বর্ণযুগের পর নেমে এল অন্ধকারময় বিষণ্ণ যুগ। মায়ের জাতি অবজ্ঞার পাত্রীতে পরিণত হওয়ায় শিশুদের অবস্থার ওখানে অবনতি ঘটে। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল অমার্জিত এবং নিম্নমান। বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্ত নির্বাসনে এই সময়কার শিশুরঞ্জক শিল্প হয়েছিল সংখ্যায় স্বল্প এবং নেহাৎই সাদামাটা। অষ্টম ও নবম শতকে কাপড়ের তৈরি পুতুলের উল্লেখ ঐসময়ে মেলে। সমাধিস্থানে সাদাসিধে ভাবে তৈরি যে মাটির পুতুল পাওয়া গেছে তাকেই মধ্যযুগের প্রাচীনতম নমুনা বলা চলে। আরো পাওয়া গেছে মাটির ঘোড়া, সশস্ত্র নাইট বা যোদ্ধা, খেলনার গৃহস্থালী সরঞ্জাম, টিন ও সীসের তৈরি ছোট ছোট জিনিস ইত্যাদি। কাঁচের খেলনাও মধ্যযুগের আদিপর্বে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধবিদ্যার মর্যাদাময় শিভ্যাল্রির যুগে স্পষ্টত ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ার যোদ্ধার মূর্তি ছিল প্রধান আকর্ষণ। সন্তযোদ্ধা সেন্ট মার্টিনের মূর্তি মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শিশুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাজসভাগুলিতে ও অভিজাতমহলে সোনা, রূপো বা সীসের তৈরি ঘোড়সওয়ার মূর্তি থাকত। হবি হর্স বা খেলার কাঠের ঘোড়া হল মধ্যযুগের আরেকটি বিশিষ্ট খেলনা।

আমাদের দেশে গুপ্তযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেন আয়তচোখের সেই ভাবময়তা কোথায় উধাও হল। কিন্তু মন্দিরসজ্জার ক্ষেত্রে এল অভূতপূর্ব উদ্যম। এর অব্যবহিত পরে পূর্বাধারার মূর্তিশিল্পে দেশপ্লাবী জোয়ার এল। সিন্ধু সভ্যতা থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত উৎপন্ন শিশুতোষ শিল্প এবার সার্বজনিক রূপগ্রহণ করল দেবায়তনিক শিল্পে এবং দেবদেবীর মূর্তির অংশে ব্যবহৃত হয়ে। পুরাণের কাহিনী থেকে বিষয় ভাবনা গ্রহণ করে লোকায়ত শিল্পীরা অসংখ্য পোড়ামাটির পুতুল গড়তে লাগলেন। অবশ্য এ পুতুল শিশুদের হাতে পৌঁছল না, দেবায়তন সজ্জায় সামগ্রী হিসাবে

ব্যবহৃত হল। মধ্যযুগে পাশ্চাত্যদেশে শিশুতোষ শিল্পে উৎকর্ষহীনতা যেমন প্রকট হয়ে উঠেছিল আমাদের দেশে বোধহয় তা হয়নি।

পরমধ্যযুগে নবাব-বাদশাহদের প্রভাবে যেমন মূল্যবান্ শিশুতোষ শিল্প তৈরি হয়েছে, তেমনি লোকায়ত শিল্পও পাশাপাশি সমান তালে এবং প্রায়শ অধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে। নৌকাবিহার, নৃত্যরতা মহিলা জাতীয় দরবাররঞ্জক পুতুলগুলি এই সময়ে চিরায়ত ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

পশ্চিমে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক থেকে শিশুতোষ শিল্প নিয়ে ব্যবসায়িক চিন্তা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময়ে আনন্দের ঢেউ জাগাতে যে ব্যাপক ধর্মীয় মেলা বসত তা ছিল শিশুরঞ্জক শিল্পের বাণিজ্যকেন্দ্র ও মিলনমেলা। এই শিল্পশাখার সামাজিক গুরুত্ব এল তখন, যখন এর বাণিজ্যিক প্রসারে বিভিন্ন দেশের ব্যবধান প্রায় ঘুচে গেল। বাণিজ্যের পসরায় শিশুতোষ শিল্প নিঃসঙ্কোচে গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যবহারিক সওদার পাশে ঠাঁই করে নিল।

এইসঙ্গে পশ্চিমের নানাদেশে বিশেষ করে ইতালিতে শিল্পগুণসমন্বিত ক্রিসমাস ক্রেশ বা ক্রিব্ নামক ধর্মীয় মূর্তিসজ্জিত দোলনাবিশেষ বসানোর এক রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। ক্রীড়নকের বিকাশসাধনে এর পরোক্ষ প্রভাব আছে। এই নয়নাভিরাম ভক্তিপ্রসূত ক্রিব্‌গুলির ঠিক বিপরীত মেরুতে রয়েছে কিছু অদ্ভুতজাতের পুতুল। ন্যুরেমবার্গের হাস্যোদ্দীপক পুতুলগুলির ভেতরে থাকত জীবন্ত পাখির দল। পাখিরা ভয় পেয়ে ছটফট সুরু করলে মূর্তিগুলি দমকে দমকে আন্দোলিত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

রেনেসাঁস যুগ আমাদের শিশুতোষ শিল্প বিষয়ক প্রত্যাশাকে বিফল করে। এই দুই শতকে খেলনার ইতিহাসে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে বৈকি, এর আগে কখনো খেলনার এত ব্যাপক সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। কিন্তু এগুলি ঠিক শিশুতোষ শিল্প নয়, বড়োদের খেলনা। আসলে এই যুগের শিশুদের মধ্যে উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্য ও ক্রীড়াপ্রবণতার অভাব ছিল বলে শিশুতোষ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে ধীরগতিতে। মনে হয় এই যুগ যেন শিশু নয়, পূর্ণবয়স্ক মানুষের বিকাশেই আগ্রহী। তাই এর শিশুতোষ শিল্পসম্ভার হল মিয়েট, কেজো, শিক্ষামূলক ও ক্রিয়ানির্ভর, অর্থাৎ রেনেসাঁসের ধর্মের সঙ্গে প্রত্যাশিতভাবে তাল রেখে গগনবিহারী, মহান্, কল্পনাসমৃদ্ধ নয়।

শিশুতোষ শিল্প ও আধুনিক ধারা

আধুনিক ধারা বলতে আমরা অষ্টাদশ শতক থেকে সুরু হয়ে যা আজও বহমান সেই ধারাটিকে বোঝাতে চেয়েছি। অবশ্য আমাদের দেশের শিশুরঞ্জক শিল্পে এই সময়কাল যে কোন একটি বিশেষ পর্বের সূত্রপাত করেছিল এমন কথা বলা যায় না। তবে এই সময় থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ আমাদের বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফলত সেইসব দেশের শিল্পসম্ভার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণালাভ সম্ভব হয়। আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এই সময়ে শিশুতোষ শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে কারুকর্মীরা শিশুর সত্যিকারের চাহিদা এবং পছন্দের দিকে নজর দিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় লাল গরুর চামড়ায় তৈরি চাকায় চাপা দোলনা ঘোড়া আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মন জয় করে বসল। তাছাড়া বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করে পুতুলনাচ, হার্লেকিন এবং স্কারামুশ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অবদান। কাগজ ও কার্ডবোর্ডের সাহায্যে ছোটবড়ো মূর্তি তৈরি এই সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আধুনিক পর্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, শিশুতোষ শিল্প নির্মাণে স্বক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ। পুতুল বাড়ী তৈরির ব্যাপারে সমকালীন প্রায় সব খ্যাতনামা স্থপতি অংশ নিয়েছেন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো শিল্পী তৈরি করেছেন স্বতশ্চল সিংহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন নতুন শিশুতোষ সামগ্রী পৃথিবীর কোন না কোন দেশে তৈরি হয়ে এসেছে। এই সূত্রে শিশুদের রাজ্যে এক পরমবন্ধুর আবির্ভাব ঘটল। শিশুতোষ শিল্পে এই বন্ধু টেডি বেয়ার নামে পরিচিত। মিসিসিপি ও লুইজিয়ানা রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ চলা কালে রকি পর্বতে শিকাররত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট টেডি রুজভেল্ট আইনের প্যাঁচে পড়ে যাবার আশঙ্কায় সামনে তেড়ে আসা এক ভালুকছানাকে গুলি করতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে পদপ্রান্তে ভালুকছানাসহ তাঁর এক আলোক-চিত্র সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় এবং ক্লিফোর্ড বেরিম্যান এই তথ্যের ভিত্তিতে এক রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেন। টেডির এক ভক্ত ও একটি শিশুতোষ শিল্পের উৎপাদক প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিয়ে ঐ ভালুকছানার অনুকরণে টেডি বেয়ার আখ্যা দিয়ে এক নরম পুতুল বানান। আজ সেই

উৎপাদক নেই, সেই সময়কার সব কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু টেডি বেয়ার আজও বিশ্বের সর্বত্র উৎপন্ন হয় এবং সেই আগেকার আকর্ষণ তার সমানই আছে। ঘড়ির কৌশলে চালিত নানাধরণের পুতুল এই সময়ে বাজার ছেয়ে ফেলে। বিংশ শতকের সুরুতে ইংলণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত শিশুপ্রিয় খেলা মেকানো পদ্ধতি বাজারে আসে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাজার মাৎ করে ফেলে। এডওয়ার্ডীয় যুগের ম্লান ঘরবাড়ীগুলি মেকানো পদ্ধতির উদ্ভাবক ফ্রাঙ্ক হর্নবির উদ্যমে যেন একেবারে চাপা পড়ে যায়।

আমাদের শিশুতোষ শিল্প আধুনিক পর্বে এসে মহা সঙ্কটের সামনাসামনি হয়েছিল. বস্তুত মধ্যযুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে ব্যাপক চিন্তা ও উদ্যম এই ব্যাপারে দেখা দিয়েছিল তার কণামাত্র আমাদের ছিলনা। আদি পর্বের শিল্পসম্ভারে যে নিখিল বিশ্বগত ঐক্য দেখা যায়, মধ্যযুগে সেখানে সম্পূর্ণ ছেদ পড়ে। আধুনিক পর্বে পাশ্চাত্যভূমির কর্ষণা একরকম জোর করে আমাদের মন কেড়ে নেয়। আদি পর্বের ধারা তখন লোকায়ত শিল্পীর শিল্পকৃতির আওতায় চলে যায় এবং লোকায়ত শিল্পীর আঞ্চলিক বিশিষ্টতা শিশুতোষ শিল্পে প্রতিফলিত হয়। অভিজাত ধারায় যদিও মহান্ সৃষ্টি জন্ম নেয়নি কিন্তু বেশ কিছু বিদেশী সামগ্রীর অনুকরণ সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো কোন খ্যাতকীর্তি সৃষ্টিশীল ব্যক্তির স্পর্শে আমাদের শিশুতোষ শিল্প যখন ধন্য হতে পারেনি তখন বিদেশের অনুকরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। অভিজাত ও লোকায়ত এই দুই ধারার শিশুতোষ শিল্প যখন পাশাপাশি বাজারে চালু রয়েছে এমন সময়ে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এই দুই ধারার সংমিশ্রণে বেশ কিছু শিশুরঞ্জক শিল্প জন্ম নেয়। ঐগুলির বাণিজ্যিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিল্পকেন্দ্রগুলি উৎপাদনে আঞ্চলিকতা চিহ্নিত হতে থাকে। বস্তুত এই আঞ্চলিকতা শুদ্ধ ঐতিহ্যের অবদান নয়, আধুনিক যুগে কাঁচামালের সুবিধা, সুলভে দক্ষ কারুকর্মী পাওয়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক কারণে ঐ আঞ্চলিকতার জন্ম।

আধুনিক পর্বে সারা বিশ্ব জুড়ে শিশুতোষ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। উনিশ শতক থেকে পুতুলের ভূমিকা ও নক্শা প্রভৃতি নিয়ে তত্ত্বের পাহাড় জমে ওঠে। জার্মানীর আর্নস্ট ফ্রোবেল এবং ইতালির মারিয়া মন্তেসরির আলোচনায় ক্রীড়নক বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষক প্রভৃতি বয়স্কদের প্রভাব ও পছন্দ কতোখানি গ্রাহ্য হওয়া উচিত ইত্যাদি প্রশ্ন সবিশেষ গুরুত্ব পায়। এই প্রসঙ্গে রুগ্ন, পঙ্গু ও মানসিক বিকাশের দিক থেকে অনগ্রসর শিশুদের

চিকিৎসার ব্যাপারে পুতুলের সাহায্য নিয়ে যে বিপুল আরোগ্যকর কাজ হয়েছে সেকথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মূক শিশুকে কথা বলতে শেখানোর ব্যাপারেও পুতুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

শিশুতোষ শিল্পসামগ্রী তৈরির সূত্রপাত কী করে হল সে ইতিহাস আজ আর স্পষ্ট নয়। কেন যে একই খেলনা বা পুতুল নানা আকৃতি নিয়ে বিভিন্ন দেশে বারবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এক প্রহেলিকা। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে আর্থনীতিক উত্থান পতনের প্রভাব শিশুতোষ শিল্পে তেমন প্রকটভাবে পড়েনি। হয়ত এর কারণ এই যে এই শিল্পের মূল খুব গভীরে প্রোথিত, এর শিশু গ্রাহকদের চাহিদা অভিভাবকের আয়ের সূত্রে আদৌ স্থিতিস্থাপক নয়। অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা তাই এই শিল্পের পক্ষে সহজ হয়েছে। এই শিল্পের পারিবারিক ভিত্তিও হয়ত তার একটি কারণ।

শিশুতোষ শিল্প নির্মাণ ও ভোগের আর্থনীতিক যোগসূত্রের বিবরণ অষ্টাদশ শতকের আগে স্পষ্টভাবে পাওয়া একরকম অসম্ভব। যতদূর জানা যায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জার্মানদেশে প্রথম এই শিল্পের বিকাশ ঘটে। জার্মানিতে প্রচুর সংখ্যায় ও পূর্ণ উদ্যমে খেলনা তৈরি হলেও নির্মাতা বা ব্যবসায়ীদের হাত থেকে তা বেরিয়ে যাবার পর ঐ শিল্পসম্ভারের ভাগ্যে কি যে ঘটত তার খবর পাওয়া যেত না। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সরাসরি যোগ স্থাপিত হয়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিশুতোষ শিল্পের সচিত্র বর্ণনাত্মক তালিকা প্রকাশ পেতে থাকে। বিভিন্ন বৃত্তির সম্মেলন ও সহযোগিতার ফলে এই শিল্প সংক্রান্ত বাণিজ্যিক উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং উন্নততর শিল্পসম্ভার তৈরির পথ খুলে যায়। এইভাবে জার্মানিতে লোকায়ত খেলনা শিল্প এক বিরাট শিল্পে পরিণত হয়।

আমেরিকায় এই শিল্প তখনি বিকশিত হতে শুরু করেছিল যখন য়ুরোপ থেকে আমদানীর ঝোঁক কাটিয়ে ওঠা খানিকটা সম্ভব হয়। আমেরিকার শিশুতোষ শিল্পে লোকায়ত ধারার অবদান নেই বললেই হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় য়ুরোপ থেকে আমদানী বন্ধ হওয়ার পর আমেরিকায় এই শিল্প কেঁপে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি রীতিমতো একটি বাণিজ্যিক উদ্যমে পরিণত হল এবং শিল্পের কলেবর বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। ফ্রান্সে আবার ব্যাপক উৎপাদনের থেকে বিলাসবহুল মূল্যবান্ ক্রীড়নক উৎপাদনের দিকে ঝোঁক বেশি। ব্রিটেনে এই শিল্প মোটামুটি আমেরিকার

ধাঁচে বিকাশলাভ করেছে। রাশিয়ায় কিন্তু জার্মানির মতো রপ্তানীর উদ্দেশ্যে শিশুতোষ শিল্প ঋদ্ধ হয়েছে এবং কালক্রমে লোকায়ত খোলস ত্যাগ করে ব্যবসাভিত্তিক রূপ নিয়েছে। কিছু কিছু রাশিয়ান বিমান কারখানা অবসর সময়ে শিশুতোষ শিল্প উৎপাদন করে।

জাপানে এই শিল্পটি নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে। এরও মূল ছিল প্রাচীন জাপানী পুতুলের ঐতিহ্যে। এমন একটা সময় এসেছিল যখন শ্রমিকদের স্বল্প পারিশ্রমিকের সুযোগ নিয়ে জাপান নিকৃষ্ট ও সস্তা খেলনা দিয়ে বিশ্বের বাজার ছেয়ে ফেলেছিল এবং শেষপর্যন্ত কেবল বদনাম কুড়িয়েছিল। ইদানীং অবশ্য জাপান ও হংকং শিশুতোষ শিল্প যা উৎপন্ন করে তা সুলভ বা নিকৃষ্ট নয়। উদ্ভাবনশক্তির চাতুর্য জাপানী পুতুলের মূল কথা। বিশেষ করে হংকংয়ের ব্যাটারিচালিত খেলনাগুলি চলিষ্ণু খেলনার ধারায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্তে আমাদের দেশেও রপ্তানী ও আভ্যন্তরীণ বাজার পাওয়ার আশায় বিভিন্ন রকমের পুতুল উৎপাদনের উদ্যম আধুনিক পর্বে দেখা যায়। চিরায়ত লোকায়ত ধারার সঙ্গে দেশী ও বিদেশী অভিজাতধারার সংমিশ্রণে এই উৎপাদন কেন্দ্রগুলি আকর্ষণীয় শিশুতোষ শিল্প উৎপন্ন করে চলেছে। এই উদ্যমের প্রথম দিকে রাজস্থানের কাপড়ের পুতুল, গোয়ালিয়রের কাঠের এবং নরম পাথরের পুতুল, দক্ষিণের চন্দনকাঠ এবং ধাতুর তৈরি পুতুল, বাঙলা ও উত্তরপ্রদেশের পোড়ামাটির পুতুল বিশেষ সহায়ক-ভূমিকা নিয়েছিল। রঙকরা মাটির পুতুলের ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, কুমারটুলি, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বেলগাঁও, বারাণসী, তাঞ্জোর, নাসিক, লক্ষ্ণৌ, মথুরা এবং মহীশূর প্রভৃতি স্থানের শিল্পসম্ভারের রীতিমতো চাহিদা হয়। বাঙলায় লৌকিকধারার গতি অব্যাহত থাকে বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ো, রাজগ্রাম, মুরলী, চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর, মেদিনীপুরের নাড়াজোল, বীরভূমের রাজনগর, মুর্শিদাবাদের কাঁটালিয়া, বর্ধমানের নতুনগাঁ প্রভৃতি স্থানের শিশুতোষ শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে।

সাম্প্রতিককালে সরকারী ও বেসরকারী উৎসাহে সারাভারত জুড়ে অনেকগুলি উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ধাতুনির্মিত পুতুলের ক্ষেত্রে তাঞ্জোর, মোরাদাবাদ, রাজস্থান, হায়দরাবাদ; পাথুরে পুতুলে উদয়পুর, বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, আজমীর, ভরতপুর, আগ্রা, মথুরা, মির্জাপুর, বারাণসী, গোয়ালিয়র, পুরী, ভুবনেশ্বর, গয়া, মুঙ্গের, আমেদাবাদ, সোম-

নাথপুর, গোলকোণ্ডা ; কাঠের পুতুলে কাশ্মীর, অমৃতসর, আলীগড়, আজমগড়, বুলন্দশহর, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, শাহরানপুর, গুজরাট, শিমোগা, ত্রিবাঙ্কুর ও কোণ্ডাপল্লী ; হাতির দাঁতের তৈরি পুতুলে সুরাট, আমেদাবাদ, পুণা, যোধপুর, বিশাখাপত্তন, তিরুপতি, ভরতপুর, ত্রিপুরা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য। আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে পুতুলের মাধ্যমে অগণিত মোটিফ ও গঠনাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু কালক্রমিক সংগ্রহ ও তথ্যপ্রদান প্রায় হয়নি বললেই চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরু থেকে বিদেশে যখন পুতুল নিয়ে তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে, ভারতবর্ষ তখনো নীরব দর্শক। আজও যে খুব সচেতন তা নয়, এই সত্য স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় মধ্যযুগের বিদেশে পরিত্যক্ত পুতুল আজকের দিনে এদেশে অতি সমাদরে অনুকৃত ও বিকৃত হচ্ছে। লোকায়ত ধারাকে দীর্ঘদিন অবহেলা করার সঙ্গে এই ছন্নছাড়া ও দৈন্যের বোধহয় কোথাও যোগসূত্র রয়েছে। তবে চরমকথা বলার সময় এখনো আসেনি।

কলকাতার কারুকৃৎ

কলকাতা গড়ে ওঠার পেছনে বিদেশী বণিকের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা হয়ত কোনদিনই সর্বথা পূরণ হত না যদি না নবাবী আমলের ক্রিয়াকলাপ অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিত। চৈতন্যোত্তর কালেও সামন্তপ্রভুরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামান্য ক্ষমতা নিয়ে লোকসমাজের ভরসাস্থল ছিল। সুখে দুঃখে দাঁড়াবো কোথায়? —প্রভুর কাছে। কিন্তু দিল্লীর মসনদে যখন কম্পন সুরু হল তখন বাইরের শত্রু ঘরের শত্রু চতুর্দিক থেকে ব্যস্ত করে তুলল। শুধুমাত্র মারাঠাদস্যু ঠেকাতে গিয়ে আঞ্চলিক সামন্তপ্রভুরা একে একে ধরাশায়ী হল, তার ওপরে এল আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যু। সমাজচক্রের তিন দিগন্ত কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্প ততক্ষণে থমথমে ভাব নিয়ে কর্মহীন দর্শক সেজে গেছে। এই সুযোগে পর্তুগীজের অনুসরণে এসে পড়ল ডাচ এবং ইংরেজ।

১৫১০-এ আলবুকের্ক গোয়া জয় করলেন। এর বেশ কিছুদিন পরে পর্তুগীজরা হুগলী ধরে কলকাতার দিকে যাতায়াত সুরু করে। একসময়ে তারা সপ্তগ্রামে এসে হাজির হল এবং ঐশ্বর্যময় বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে নিজেদের তৎপরতা বাড়িয়ে তুলল। পরে তারা স্থানচ্যুত সপ্তগ্রামের তন্তুবায় পরিবারদের গড়া গোবিন্দপুরের (গার্ডেনরিচ এলাকা) সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে এল।

কলকাতার জন্ম

পুরোনো 'কালীক্ষেত্র' অথবা কলি চুনের কাতা (ডিপো) পরবর্তীকালে কলিকাতা নাম নিয়েছে। কালীক্ষেত্র পরমধ্যযুগে উত্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে দক্ষিণে বেহালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার গঙ্গার পূবতীরে বাঁকের মুখে প্রাচীন কালীমন্দির দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্যে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সরস্বতী মজে যেতে সুরু করে এবং ফলে সাতগাঁ তার পুরনো সমৃদ্ধি সর্বাংশে হারিয়ে ফেলে। সেই সময়ে ভাগীরথীর তীরে চিত্রপুর,

হুত্রলুট বা হাতানুট, কলিকাতা, গোবিন্দপুর এবং দক্ষিণে দুটি গ্রাম ভবানীপুর ও কালিঘাট গড়ে ওঠে। আদিগঙ্গা তখন পুবে সরে এসেছে, কলকাতা থেকে কালীবিগ্রহ চলে গেছে কালিঘাটে। এই অঞ্চলে তখন সাবর্ণ চৌধুরীদের পাকা কাছারি এবং তার পুবে দীঘির কাজ শেষ হয়েছে। দীর্ঘ রাস্তা একটি উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে। কয়েকটা খাল তখনো গঙ্গাকে পুবের খালের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। প্রথম খালের উত্তরে চিত্রপুর, প্রথম ও দ্বিতীয় খালের মধ্যে হাতানুট, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খালের মধ্যে ছিল তখনকার 'কলিকাতা'। তৃতীয় খালটির দক্ষিণে গোবিন্দপুর, আরো দক্ষিণে ভবানীপুর ও কালিঘাট।

কেউ কেউ বলেছেন গোবিন্দপুরের সেই তন্তুবায়দের উৎসাহেই সুতানুটির বাণিজ্যকেন্দ্র গজিয়েছিল। এদিকে তখন ইংরেজ বণিক উড়িষ্যায় কুঠি গড়ে ফেলেছে। ১৬৫৮-তে চার্নক হুগলিতে কুঠি করলেন কিন্তু ঝামেলা হল ১৬৮৬-র যুদ্ধে। নবাবের তাড়া খেয়ে ইংরেজ আশ্রয় নিল সুতানুটিতে। সুতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রামের আকর্ষণে বণিক ইংরেজ ক্রমে শাসক ইংরেজে রূপান্তরিত হল।

কলকাতার চেহারা

লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন ও মস্কোর মতো কলকাতা শহরও নদীর তীর ধরে প্রথম গড়ে উঠছিল। কিন্তু বিদেশের ঢঙে কলকাতা নদীর দুই তীর ধরে গোল হয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। ১৭৮৫-তে কতকগুলো নৌকো ভাসিয়ে গঙ্গার ওপর সেতু তৈরি হয়েছিল। গঙ্গা যদি কলকাতার সদর দরোজা হয় তাহলে পুবের খাল ছিল তার খিড়কির দরোজা। এই দুই দরোজার মাঝখান দিয়ে লম্বাটেভাবে শহর কলকাতা রূপ নিয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও বিদেশের শহর-চারিত্র্য কলকাতা কখনো পায়নি।

নতুন শহর, নতুন আকর্ষণ

বঙ্গীয় সাম্রাজ্যব্যবস্থার সনাতন বিন্যাস বিদেশী আক্রমণে একাধিকবার দুলে উঠেছে। হিন্দু পৌরাণিকতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোকজীবনের কর্ষণা প্রায় হাত ধরাধরি করে চলেছিল। সামন্তপ্রভুর প্রতাপ ও দাক্ষিণ্যের পরিবেশে সম্ভবত সেইটাই ছিল স্বাভাবিক। কোন নির্দিষ্ট জনপদের সমগ্র অধিবাসীর মানসিক তানপুরা মূলত প্রায় একই সুরে বাঁধা ছিল।

মধ্যযুগে তুর্কী আক্রমণকালে এই সমাজবিন্যাস যে আঘাত পায় তা অতি স্বল্পকালের মধ্যে কাটিয়ে উঠেছে কিন্তু স্থিতাবস্থা রক্ষার তখন সময় পাওয়া যায়নি, পাশ ফিরতে না ফিরতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের আঘাত এসে পড়ল। গ্রামকেন্দ্রিক যাবতীয় উদ্যম এবার নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হল। সমস্ত সমাজদেহ খণ্ডিত হয়ে শহর নামক নতুন গড়ে-ওঠা জনপদের সঙ্গে যখন পাল্লা দিতে উৎসুক ততদিনে গ্রাম ও শহরে ফারাক হয়ে গেছে আসমান-জমিন। এই পার্থক্য শেষ পর্যন্ত শুধু যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটালো তা নয়, সমাজের নিম্নতম স্তরে মানুষের পায়ের তলা থেকে জমিটুকু পর্যন্ত সরিয়ে দিল।

গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালী নেহাৎই ছোটগণ্ডীর মানুষ, কিন্তু মোটামুটি স্বয়ংভর ছিল। এই বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিকতার সঙ্গে মধ্যযুগীয় যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। দরবারী শাসনের কর্তৃপক্ষ সনাতন সামন্তপ্রভুর কায়দায় প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্য আদায় করত, কিন্তু ইংরেজ সেটি ব্যবসাদারের ব্যাপারে দাঁড় করতে লাগল। এই ব্যবসার সূত্রে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় সামন্তপ্রভুকে তারা নিজেদের পথে টেনে নিল। নতুন গড়ে-তোলা শহরের আকর্ষণে, বেনিয়ানশিপের প্রলোভনে সামন্তপ্রভুরা দলে দলে আসতে লাগল। বিদেশী বণিক ততদিনে সাম্রাজ্যবাদের চেহারা মেলে ধরেছে। স্থানিক কর্ষণার বিশিষ্টতা থেকে যে যে সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সংবর্ধন সম্ভব হয়েছিল তাদেরও বিপর্যয় দেখা দিল। বিদেশীর চোখ ধাঁধানো চমকে পুরনো মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটতে লাগল। গ্রামবাঙলার তথাকথিত অভিভাবকরা একে একে নতুন শহরের দিকে ছুটে আসতে লাগল। অনাথ লোকসমাজ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি

তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে হিন্দু পৌরাণিকতন্ত্রের চার বর্ণ ব্যবস্থায় একরকম শিথিলতা এসে গিয়েছিল। শাসিত লোকসমাজের কুলগত বৃত্তিনির্ভরতা তখন থেকে ধাক্কা খেতে সুরু করে। সনাতন এই কুলগত বৃত্তির মূল স্তম্ভটি দাঁড়িয়েছিল অপ্রতিযোগিতার ওপর। আধুনিক উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা যে সময় একটু একটু করে সমাজদেহে দেখা দিচ্ছিল ঠিক তখন থেকেই পুরনো অর্থনীতি ও উৎপাদন-কাঠামো নড়বড়ে হয়ে ওঠে এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক ব্যবস্থার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের নির্বাসন ত্বরান্বিত ও অবধারিত হয়।

নতুন শহরে লোকশিল্পী

শহর কলকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে ধরণের কারুশিল্পী এই নব জনপদবাসীর পৃষ্ঠপোষণা আশা করে এখানে এসে ভিড় জমান তাঁদের মধ্যে তন্তুবায়, পটুয়া, কুম্ভকার, অলঙ্কার ও হাতির দাঁতের শিল্পী, জীবজন্তুর হাড়ের শিল্পের কারিগর, শঙ্খবণিক, প্রস্তরভাস্কর, সূত্রধর, বেতের ও বাঁশের কারিগর, ধাতুশিল্পী, চর্মকার, মালাকার, ফুলকারি শিল্পী, গন্ধিক শিল্পী এবং স্থপতি প্রধান। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে গতশতকের শেষাশেষি পর্যন্ত কৌলিকবৃত্তির বাঙালী কারুকৃৎ পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে কখনো দলবদ্ধভাবে অধিকসংখ্যায় আবার কখনো বা স্বল্পসংখ্যায় নতুন শহর কলকাতার দিকে ছুটে এসেছেন। এই আজব শহরের দাক্ষিণ্য যতদিন পর্যন্ত এঁদের প্রতি অবারিত ছিল ততদিন এঁরা এখানে অস্তিত্ব রাখতে পেরেছেন। ওদিকে যারা রয়ে গেলেন গ্রামাঞ্চলে, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এসে তাঁরা দোটানার মধ্যে পড়ে গেলেন। কৌলিকবৃত্তি রক্ষা না চাষবাস? সঠিক জীবিকার পথ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সমগ্র বাঙলাদেশে, এই সময়ে বহুসংখ্যক কুলবৃত্তির দক্ষ কারিগর পুরোপুরি চাষে মেতে গেলেন। শাসক ইংরেজ তখন খালবিলের সংস্কার ইত্যাদি দ্বারা চাষের দিকে নজর ফেলেছে। ১৮৫০-৭০ বাঙলার চাষবাসে নতুন জোয়ার এনেছিল।

যন্ত্রের যন্ত্রণা ও লোকশিল্পী

কারুকৃৎ শুধু চাষের লোভে মাঠের দিকে ছুটেছিলেন এমন নয়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতির আবির্ভাবের ফলে তাঁদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগল। এই বিষম পাল্লা-পাল্লিতে দেশীয় কারিগর দেউলে হয়ে যেতে লাগলেন। এহেন ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কুলবৃত্তির শিল্প রক্ষা করা একমাত্র তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল যাঁদের ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্র কোন প্রতিযোগিতা বা ব্যবসায়িক উৎপাত ডেকে আনে না। যেমন, মৃৎশিল্পীর গড়া মূর্তি। এ বস্তু তো আর যন্ত্রে গড়া যাবে না। শঙ্খের কাজ, শোলার কাজ, অলঙ্কার শিল্পের কোন কোন কাজ এবং এই ধরণের আরো কিছু ব্যক্তিস্পর্শের কারুশিল্প যন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে টিঁকে রইল।

এছাড়া কিছু কিছু হস্তশিল্পে আংশিক যন্ত্রায়িত হবার প্রবণতা এই সময় থেকে দেখা দিচ্ছিল। একটি কাজের অর্ধেক যন্ত্রে এবং বাকিটুকু কুটিরশিল্পে সাধিত হলে যে সুবিধা সেইদিকে উৎপাদকরা নজর দিল।

যন্ত্রায়িত হবার পর যে অংশটুকু কুটিরশিল্প হিসাবে কারুশিল্পীর হাতে এল তাকে অবলম্বন করে কলকাতার তৎকালীন নিম্নবিত্ত এলাকায় কৌলিকবৃত্তির কারিগর কোনক্রমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। এই মিশ্রিত শিল্পপ্রয়াসে কারুশিল্পীর ভূমিকা নায়কের নয়, পার্শ্ব চরিত্রের। এর ওপর আবার মানসিক চাপ এল উৎপাদনের মূল তত্ত্ব থেকে। একজন দক্ষ কারুশিল্পী যিনি কুলবৃত্তিতে আজীবন সম্পূর্ণ স্বাধীন উপায়ক্ষম ছিলেন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে রোজের মজুরে পরিণত হতে লাগলেন। এই পরিস্থিতি যাঁরা মেনে নেননি তাঁরা কাঁচামাল ক্রয় থেকে উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় পর্যন্ত পদে পদে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কাছে পরাজিত হতে লাগলেন। এই বিষম প্রতিযোগিতার চাপে আবার নতুন করে কিছু সংখ্যক কারুশিল্পী হয় চাষের টানে নিজের গ্রামে অথবা শিল্পোৎপাদনের আশায় নতুন সুবিধাযুক্ত কোন জনবসতির দিকে ধাবিত হলেন।

কলকাতার চিত্রোপজীবি

শহর কলকাতার বুকে তীর্থপণ্য সাজিয়ে কোনরকমে দিন কাটাচ্ছিল একদল চিত্রণশিল্পী। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে বাজার পাওয়ার আশায় এরা একসময়ে ছুটে এসেছিল এবং শেষপর্যন্ত নিজেদের চেষ্টায় মোটামুটি একটা বাজারও গড়ে তুলেছিল। কলকাতা এবং আসপাশের মেলাগুলিতে এদের শিল্পসম্ভারের কালানুপাতিক বিক্রয়-সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। এই চিত্রোপ-জীবিরা সকলেই যে পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এমন নয়, সর্ববর্ণের শিল্পী কালিঘাট কলমে হাতপাকিয়ে ঐ শৈলীর তৈরি বাজারকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। এঁদের এই নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় হঠাৎ গতিবেগের চাপ এসে হাজির হল—জার্মান লিথোগ্রাফ মেশিন। দেখতে দেখতে কয়েক দশকের মধ্যে কালিঘাট চৌকশ উধাও হল।

কালিঘাটের পটুয়ার আবার গোত্রান্তর ঘটল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইতিমধ্যে ধর্মান্তরকরণের প্রয়াস বেশ চালু হয়েছে। না হিন্দু না মুসলমান এই পটুয়া সম্প্রদায়কে গ্রামবাঙলায় ধর্মান্তরিত করে পুরোপুরি হিন্দু ছাপ দেওয়া সুরু হল। কালিঘাটের পটুয়ারা হিন্দুর খাতায় নাম লেখালেন। এবার তাদের সর্বশক্তি নিযুক্ত হল পুতুল ও প্রতিমা তৈরির কাজে। এর আগে অংশত গড়ার কাজে বিশেষ করে রঙের কাজে পুতুল ও প্রতিমায় তাঁরা অংশ নিয়েছেন কিন্তু এখন আর দুটি নামের আড়ালে

(একটি হিন্দু নাম, আরেকটি মুসলমানী) তাদের কাজ করতে হচ্ছে না। ক্রমে শুধুমাত্র দেবদেবীর মূর্তি গড়ার অঞ্চল হিসাবে কালিঘাট পোটোপাড়ার পরিচিতি দাঁড়ালো। সারা ভারতে যখন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হল তখনো কিন্তু কালিঘাট নিস্তরঙ্গ, নিঃঝুম। বিশ্ববিশ্রুত সেই চৌকশ আর দেখা দিল না।

শঙ্খশিল্পী

শঙ্খশিল্পের অস্তিত্ব প্রধানত হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে শঙ্খশিল্পের যেহেতু একটি বৃহৎ বাজার তৈরি আছে তাই এই শিল্পের কারুকৃৎ স্বাভাবিক কারণে এখানে উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। ১৮৮৮ সালের প্রদর্শনীতে যাওয়া সেই মকরমুখ, সাগরঢেউ কার্নিশদার, এবং কাঁটাবাহারের শাঁখা আজও কলকাতার কারুকৃৎ উৎপন্ন করেন। অবশ্য এই কারুশিল্পের কাজে প্রথমদিকে কারুকৃৎদের নিজেদের অঞ্চলবিশেষের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ছিল। পরে কলকাতার রুচির সঙ্গে সন্ধি করে তাঁরা ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরের বিশিষ্টতা বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেন।

উত্তর কলকাতার বাগবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রীট, দক্ষিণে ভবানীপুর-কালিঘাট নিয়ে শঙ্খশিল্পের উৎপাদন সুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে শহরের সর্বত্র এই শিল্পের কোন না কোন উৎপাদন কেন্দ্র বর্তমান। এই সমস্ত কর্মরত কারুকৃতের বক্তব্য এক করলে বোঝা যায়, কাঁচা মাল অর্থাৎ সামুদ্রিক শঙ্খের ক্রয়মূল্যের সঙ্গে সমগ্র শিল্পটির যাবতীয় সম্ভাবনা জড়িত। অথচ সেই কাঁচা মালের ব্যাপারে এমন কিছু স্থায়ী সুবন্দোবস্ত নেই যাতে নিশ্চিন্ত মনে শিল্পীরা উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারেন। সম্প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে অনেকে বিদ্যুৎচালিত করাত ব্যবহার করেছেন কিন্তু মূল কাঁচামালের কৃত্রিম অভাব বরাবর থাকলে হাজারো প্রযুক্তিবিজ্ঞান কোন সমাধান হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

কলকাতার চর্মকার

[illegible]দিকে দানবীর দীনু দাসের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক চর্মকার কলকাতায় বসতি করতে সাহসী হন। তালতলা ও ঠনঠনিয়া অঞ্চলে দাসেদের কারখানায় তখন বাঁকুড়া, হুগলী ও বর্ধমানের প্রচলিত চটির

উৎপাদন দিনেরাতে হত। ধনী ব্যবসায়ী দীনু দাস ট্যাংড়ার মূলকেন্দ্রেও যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বাঁকুড়া-হুগলীর চটি (এই বিশেষ চটিটি আবার উত্তর প্রদেশের দাতিয়া জেলার হিন্দু মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় পাদুকা) কলকাতায় বিদ্যাসাগরী ব্র্যাণ্ড নাম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বিদেশী মনোরঞ্জক জুতার জন্য বেশ কিছু চীনা পরিবার তখন উদ্যোগী ছিল। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন জুতা ব্যবসায়ী কলকাতায় আজও আছে। বারে বারে নতুন নতুন অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আমাদের দেশীয় চর্মকারসমাজ বায়েনী কারুকৃতে আত্মরক্ষা করতে ছুটেছেন। সম্প্রতি বায়েনী শিল্পটি তুলনামূলকভাবে উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রে উৎপাদিত জুতা দেশীয় চর্মকারকে যেমন একদিকে আঘাত দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাকে সমূলে নিঃশেষ করতে পারেনি, কোনদিন পারত না। কারণ, সবকিছুর শেষে ভোক্তা যখনি ব্যক্তিস্পর্শের কথা তুলবেন তখন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নির্বাক। এবং তখনি দেশীয় চর্মকারের সমাদর। কিন্তু কলকাতার ক্ষেত্রে অবাঙালী কারিগরের সংখ্যাধিক্য দেশীয় শিল্পীকে একেবারে শিল্প থেকে বিতাড়িত করে ছেড়েছে। অবশ্য বায়েনী কারুকর্মে অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত চর্মাংশের কাজে বর্ধমান ও বীরভূমের বেশকিছু কারিগর চিৎপুর, জোড়াসাঁকো, গোয়াবাগান ও অন্যান্য স্থানে রয়ে গেছেন।

মালাকার

শোলার কাজে বাঙালী শিল্পী বরাবর যে দক্ষতা দেখিয়েছেন কলকাতার কাজে সেই মান পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। বিবাহাদি সামাজিক কাজের টোপর, মুকুট ইত্যাদির কথা বাদ দিলে শিল্পটি যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এর অস্তিত্ব প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তাই প্রতিমাশিল্পের কারুকৃৎ শহরের যে যে অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত শোলার শিল্পে নিয়োজিত মালাকাররা তারই ধারপাশ দিয়ে রয়ে গেছেন। শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী মালাকার প্রতিষ্ঠান কলকাতার বুকে একাধিক রয়েছে। উত্তর কলকাতার সেই ঘোষ কোম্পানী যাঁরা রাণী রাসমণির ঠাকুরের ডাকসাজ, শোভাবাজার রাজবাড়ীর ঠাকুরের ডাকসাজ থেকে সাবর্ণ চৌধুরীদের ঠাকুরের শোলার কাজ করেছিলেন আজও তাঁরা সগৌরবে পুরনো ব্যবসায়ে রয়েছেন। কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা শিল্পী ৺ নীলমণি পালের ছেলে কৃষ্ণ পাল

সুনামের সঙ্গে পৈতৃক ব্যবসায়ে কাজ করছেন। যথেষ্ট খ্যাতি নিয়ে কাজ করেছেন হুগলীর ৺ ননী সরকারের ছেলে গোপাল সরকার। পূর্ববঙ্গীয় শোলার কাজে ঢাকার ৺ মাখন মালাকারের ছেলে পরেশ মালাকার পূর্বপুরুষের সুনাম রক্ষা করে চলেছেন। এছাড়া চুমকি, কিরণ, গোটা, গোখুরি, জামির, ভুরো এবং প্রতিমার সাজের অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে কুমারটুলির সুরেন দে এণ্ড কোং বা জোড়াসাঁকোর আঢ্য কোং এখনো টি'কে আছে।

অলঙ্কারশিল্পী

অলঙ্কারের কাজে মূলত ধাতুশিল্পীর প্রাধান্য শহরাঞ্চলে বরাবরই আছে। লোকসমাজ নগরসংস্কৃতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য কলকাতায় লৌকিক অলঙ্কারের কারিগর সংখ্যায় কম। তবে ধর্মের সংস্পর্শযুক্ত লৌকিক অলঙ্কার, যেমন, তুলসীর মালা, রুদ্রাক্ষ মালা এবং স্বল্পমূল্যের রত্নপ্রস্তরের মাল্যদানার কারুকৎ কিছু সংখ্যক আছেন। চিৎপুর, গরাণহাটা, বড়বাজার, বউবাজার, খিদিরপুর, তালতলা এবং ভবানীপুরের অলিগলিতে বহুসংখ্যক ধাতুকাজের অলঙ্কারশিল্পী রয়েছেন। এঁদের পূর্বপুরুষ যখন নতুন শহরে পা দিয়েছিলেন তখন কারুশিল্পের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর ও অন্যান্য স্থানের শিল্পীরা শহরে এসে রুজির আশায় ব্যাপক সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের কাজে অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস পেল। তন্তুবায়, বণিক এবং মুৎসুদ্দিশ্রেণীর বাবুসমাজের দাপটে দেশীয় অলঙ্কারের কারিগর বাঙালীয়ানা প্রায় ভুলতে বসল। অন্যদিকে কোন কোন দক্ষ কারিগর এবং সেটিংয়ের কারিগরদের ভরসাস্থল হল সাহেবপাড়ার বিদেশী বা বিদেশী ঢঙের প্রতিষ্ঠান।

শহরের এই বিচিত্র সমন্বয় ও সংমিশ্রণের ঢেউ দেখতে দেখতে গ্রাম বাঙলার বিত্তশালীর ঘাটে এসেও আছাড় খেয়ে পড়ল। মোটিফে, কারিগরী কৌশলে, হাল্কা ওজনের চোখ ঝলসানিতে সারা বাঙলা মেতে উঠল এবং এই মত্ততার মূলকেন্দ্র হল কলকাতা।

কংস বণিক

কংসবণিক এবং কুম্ভকার এ্যালুমিনিয়াম ও এনামেলের ধাক্কাতেই প্রায় শেষ হতে বসেছিল। অবস্থাটা কোনরকমে সামলে উঠতে না উঠতে এল স্টেনলেস স্টীল। দৈনিক ব্যবহারের কতকগুলি সামগ্রী এখনো কাঁসা বা

পিতলে তৈরি হয় বলে ধাতুশিল্পের এই কারিগররা আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তারক প্রামাণিক রোড ও সন্নিহিত অঞ্চল, নিমতলা অঞ্চল এবং ভবানীপুর অঞ্চলে এক সময়ে কংসবণিক সম্প্রদায় বেশ বড়রকমের উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমানে সমগ্র শিল্পটির অস্তিত্ব যেমন অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গেছে তেমনি কলকাতাবাসী এই শিল্পের কারুকৃতেরাও আর নতুন উদ্যমে এই শিল্পে আসতে চাইছেন না।

বেত ও বাঁশের কাজ

বেত ও বাঁশের কারুশিল্প প্রথম থেকে কলকাতার মানুষের মন জয় করেছে। বাবুদের আসবাবপত্র থেকে অন্যান্য সামগ্রী বেত ও চাঁচারি দিয়ে তৈরি করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ডোমপাড়া মোটামুটি কর্মব্যস্ত থেকেছে। পরবর্তীকালে ধাতুনির্মিত সামগ্রী এই শিল্পটির নাভিশ্বাস তুলিয়ে ছেড়েছিল। স্বাধীনোত্তরকালে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে রামবাগানের উৎপাদনকেন্দ্রটি রীতিমতো জীবন্ত হয়ে ওঠে। এদিকে পুজোৎসব ও বিবিধ সজ্জা-সংশ্লিষ্ট কাজে চাঁচারির কাঠামো জনপ্রিয় হওয়ায় বর্তমানে এই শিল্পের কারুকর্মী মোটামুটি কর্মব্যস্ততার মধ্যেই আছেন।

কুমারটুলি ও কলকাতা কলম

১৭৬৫ তে কোম্পানী বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পাওয়ার পর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে 'লিজ' প্রথা চালু করে। তৎকালীন কুখ্যাত ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারে নদীয়ার শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ এবং মেটেরি থেকে কিছুসংখ্যক কুম্ভকার প্রাচীন 'কলিকাতার' পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোবিন্দপুরের কাছে গন্ধবণিকের সঙ্গে বসতি গড়েন। পরবর্তীকালে কেল্লার কাছাকাছি এলাকা থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ এলে এই কুম্ভকার এবং গন্ধবণিকেরা সুতানুটি গ্রামে চলে আসেন। গন্ধবণিকেরা যেখানে বসতি করেন সেই অঞ্চলের নাম হয় বেনেটোলা আর কুম্ভকার পট্টির নাম কুমোরটুলি।

কলকাতার আর পাঁচটা কারুশিল্পের মতো কুম্ভকারের গড়া ও লেখা মৃৎশিল্প একসময়ে কলকাতার নব্যবাবুদের মনোহরণে সমর্থ হয়েছিল এবং সেই সূত্র ধরে কুমারটুলিতে কুম্ভকারদের বসতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছিল। চারু ও কারুকলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত কুমারটুলি ও কালিঘাট ছিল শিল্পী তৈরির পীঠস্থান। কালক্রমে গড়া ও লেখা দুই

কাজেই কুমারটুলির জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ ছিল। গড়ার কাজ অর্থাৎ প্রতিমা, দৈনন্দিন ব্যবহারের মৃৎপাত্র, ধর্মীয় পাত্রাদি তৈরি করা এবং লেখার কাজ অর্থাৎ রঙ-তুলির সাহায্যে সড়া, চালচিত্র, পিঁড়িকুলো চিত্রণ, দেবদেবী মূর্তির সর্বাঙ্গ চিত্রণ প্রভৃতিতে কুমারটুলি ছিল অদ্বিতীয় স্থান। গ্রামবাঙলার শিল্পীরা কলকাতায় আসার পরও প্রথম প্রথম তাঁদের অভ্যস্ত হাতের লেখাই-কাজ এখানে করেছেন কিন্তু কালক্রমে 'কলকাতা কলম' নামে একটি সংমিশ্রিত বিচিত্র কলমে তাঁদের মুক্তিস্নান করতে হয়েছে। চালচিত্র ও সরা লেখার সময় তাঁরা কথনো কথনো ফিরে গিয়েছেন সনাতন বাঙলা কলমে। বিশেষ করে চালচিত্র লেখার বৈশিষ্ট্যে কুমারটুলির কোন কোন শিল্পী অমর হয়ে আছেন। এখানকার চালে কৈলাসা, বৃন্দাবনী, রামচন্দ্রী, দশাবতারী, ইন্দ্রানী ও ব্রহ্মাণী মোটামুটি এই ছয়টি পর্যায়বিভাগ নজরে আসে। উপরোক্ত প্রতিটি পর্যায়ের আবার আকার ও প্রকারভেদে জাতিবিভাজন দেখা যায়। চালচিত্রের এই জাতিবিভাজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চিত্রণশিল্পের অধ্যায়ে রয়েছে। পুনরুক্তির আশঙ্কায় আমরা এখানে ঐ সম্পর্কে নীরব রইলাম।

সরা-কুলো-পিঁড়ি প্রভৃতি লেখার কাজে কুমারটুলি দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় পর্যন্ত সনাতন বাঙলাধারা অনুসরণ করেছে। অধুনা বাঙলাকলমের অভ্যস্ত হাত তেমন কোন না থাকায় বোলপুরী ও অন্যান্য জনপ্রিয় ধারা অনুসরণ করে ঐ লেখাই কাজ করা হয়। সরা লেখার যিনি প্রবীণ শিল্পী ছিলেন গত ১৯৭৪ সালে তিনি অবশ রোগে আক্রান্ত হন এবং এখনো সুস্থ হতে পারেন নি। কুমারটুলির সরার লেখায় কোনকালে পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের প্রভাব ছিলনা এবং সেইদিক থেকে একক বৈশিষ্ট্যে এই ধারাটি চিহ্নিত ছিল। তবে অস্বীকারের উপায় নেই, কুমারটুলির সরা লিখনধর্মে লৌকিক পর্যায়ভুক্ত নয়। সম্প্রতি এখানে যে লেখাই কাজ হয় তা মূলত শহররুচির সঙ্গে পুরোপুরি বোঝাসন্ধির লেখা। না বাঙলা-কলম না আধুনিক সংমিশ্রিত কলম, না অজন্তা জাতের প্রাচ্যধারা না রবি বর্মার ধারা — সবগুলি ধারার আসপাশ দিয়ে রাস্তা খুঁজেছে কলকাতার এই বিচিত্র কলম। কুমারটুলি দীর্ঘ দুশোবছর ধরে কলকাতার বুকে মৃৎশিল্পের চাষ করে নানা উল্টোপাল্টা স্রোতের মধ্য দিয়ে এসে আজ এই কলকাতা-কলম নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এ কলমের প্রভাবে প্রায় সমগ্র বাঙলাদেশ এখন আচ্ছন্ন। কুমারটুলির বাস্তু কারিগরদের কালক্রমিক

সৃষ্টিসত্তার বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায় কবে, কখন্ এবং কীভাবে কলকাতা-কলমের জন্ম হল।

দুশোবছরের কুমারটুলির ইতিহাস শহর কলকাতার সুখদুঃখের ইতিহাসের সঙ্গে জড়ানো। বর্তমান উপস্থাপনায় ৫০ বছর করে চারটি পর্বে কুমারটুলির যুগন্ধর শিল্পীদের কেবলমাত্র নামতালিকা এখানে দেওয়া হল।

১. প্র থ ম প র্ব —এই পর্বে যে কয়জন কারুকৃতের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে আছেন যদু পালের পূর্বপুরুষ, ফন্তে পাল (১), কম্লা পাল, বেঁটে পাল, হরে পাল, বঙ্কা, সদু, পরাণ পাল, কবিকৃষ্ণ, তারাচাঁদ, চণ্ডে এবং রামেশ্বর পাল।

২. দ্বি তী য় প র্ব— এই পর্বে প্রথমেই যার নাম স্মরণীয় তিনি হলেন হুগলি বাঁশবেড়িয়ার মধু পাল। পোড়ামাটির শিশিবোতল রপ্তানী করে তিনি যথেষ্ট যশ ও অর্থ পান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন মন্দির এখনো কুমারটুলিতে রয়েছে। এই পর্বের অন্যান্য কুম্ভকারদের মধ্যে রয়েছেন বঙ্কু পাল, লোহারাম কালীচরণ এবং কাশী পাল। লেখা ও গড়ার কাজে যুগন্ধর শিল্পী কাঙালী পালকেও এই পর্বে গণ্য করা কর্তব্য। স্বনামধন্য চৌকশ শিল্পী অন্নদা পাল, প্রিয়লাল এবং এ্যালবার্ট হরিপদ দ্বিতীয় পর্বের স্মরণীয় শিল্পীর নাম।

৩. তৃ তী য় প র্ব— এই পর্বে ছিলেন জিতু পাল, ফণিভূষণ, প্রমথ পাল, মন্মথ পাল, গোপেশ্বর পাল, জগদীশ পাল, ধর্মদাস পাল, হাবুল, মণি, ঘটেশ্বর পাল, বিষ্ণু পাল, মণিমোহন পাল, শিবু পাল, যতীন্দ্র পাল, সতীশ পাল, জয়ন্ত পাল, রামদাস, সতীশচন্দ্র, হরিজীবন পাল, নিতাইচরণ পাল, বৈদ্যনাথ পাল, হাবুল পাল (নবদ্বীপ), হরেন পাল, রাধানাথ পাল, নীলমণি পাল (শান্তিপুর), রাজেন পাল, পদ্ম পাল (নবদ্বীপ), তারাপদ পাল, দুলাল পাল (১)।

৪. চ তু র্থ প র্ব— এই পর্বে শিল্পীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের বিখ্যাত শিল্পীদের বংশধররা ছাড়াও নদীয়াচক্রের বাইরে থেকে বেশকিছু কারুকৃৎ এই পর্বে এসে কুমারটুলিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। চতুর্থ পর্বের নামতালিকায় আছেন কমল পাল, লক্ষ্মীকান্ত পাল, প্রদীপ, বেচারাম, কেনা পাল, কাশী, হারাধন, প্রসন্ন, জীতেন্দ্র, অধীর, কানাই, সিদ্ধেশ্বর পাল, যতীন্দ্রনাথ পাল, কৃষ্ণ পাল, বৈদ্যনাথ, নিশি, কাশী, নৃসিংহ, তারাপদ, অশোক, বিজয়, গোপাল, মণীন্দ্র, কার্তিক, শম্ভু, শান্তি, বিষ্ণু,

কালিদাস, ধর্মদাস, জীতেন পাল, কামাখ্যা, নারায়ণ পাল, সোমনাথ, মণি পাল (২), বৈদ্যনাথ পাল (২), শম্ভুচরণ পাল, শৈলেন পাল, নারায়ণ, পটল, নন্দ, মুরারি, দুলাল, নিরঞ্জন, রামচন্দ্র পাল, প্রতাপ, রাধানাথ, ভুবন পাল, হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্র, পরেশ, হরিপদ, ব্রজ, সুধা, হাবুলে, কানাই, কাশী পাল, রাজু, হারু, সুবল, শঙ্কর, তারাপদ পাল, ধীরেন, দুর্গা, মৃত্যুঞ্জয়, রামচন্দ্র পাল (২), শৈলেন, সাধুচরণ পাল, শেতল পাল, বেচারাম (২), রাধেশ্যাম, রমেশ পাল (২), এবং গগন পাল। এছাড়া পুজোর মরশুমে বাইরে থেকে প্রায় ৮০০ জনের মতো কারুকৃৎ এখানে কাজ করে যান। সম্প্রতি মৃৎশিল্প কারিগররা সন্তোষ পাল ও সুধীর পালের নেতৃত্বে যে সমিতি গড়ে তুলেছেন তার সদস্য সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে রয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে পূর্ব বাঙলার বেশকিছু রুদ্রপাল কুম্ভকার কুমারটুলিতে বসতি সুরু করেন। এঁদের প্রথম দিকের কাজে প্রধান ত্রুটি ছিল অত্যধিক ওজন এবং লেখাই কাজে পূর্ববঙ্গীয় আদোল ক্রমে এঁরা কলকাতার গড়ার ঢঙ এবং কলকাতা কলমের লেখাই ঢঙ আয়ত্ত করে নেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ঢাকা বিক্রমপুরের রাখাল পাল, ফরিদপুর ভোজেশ্বরের দ্বারিকা পালের ছেলে কার্তিক পাল, ঢাকা ভাড়াদিয়ার নীলকণ্ঠ পালের ছেলে গোরাচাঁদ পাল এবং ঢাকা গোবিন্দপুরের কালিপদ পালের নাম আজ কুমারটুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রস্তর ভাস্কর

মাঠগোদা, বিনপুর বা অগ্রদ্বীপের ভাস্কর-সম্প্রদায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই কলকাতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই কাজে একজনমাত্র বাঙালী কারুকৃৎকে মল্লিকবাড়ীর কাজে দেখা যায়। জোড়াসাঁকোকে কেন্দ্র করে প্রস্তর ভাস্কর্যের যে শিল্পসম্ভার তাতে লক্ষ্মৌর কারিগরদের আধিপত্য অনস্বীকার্য। বৃদ্ধ শিল্পী ফাগু, পুত্র মোহন ও ছোট্কা, দেওকীপ্রসাদ প্রভৃতি মূর্তি কাটার কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। ঝরোকা, চবুতরা, জালি, এবং সবরকমের মাঠাই কাজে মামা হলেন অদ্বিতীয় দক্ষ কারুকৃৎ।

কলকাতার সূত্রধর

দারুতক্ষণে ও আসবাবের সূক্ষ্ম কাজে বাঙালী সূত্রধর, কি হিন্দু কি মুসলমান, আজ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। ছাপার কাজের কাঠের

ব্লক, সন্দেশের ছাঁচ এবং কাপড়ছাপার ব্লক নির্মাণে এখনো কিছুটা আধিপত্য থাকলেও আমতার সেই বিখ্যাত বাটলিওয়ালারা পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ঘোষিত হয়েছেন। অথচ গতশতকের অসাধারণ শিল্পনমুনা যা এখনো কলকাতা ও শহরতলীর বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির গর্বের বস্তু তার অধিকাংশ কাজের জন্ম দাঁইহাটি এবং আমতার শিল্পীদের হাতে। আসলে শহরের রুচি বদলের সংবাদ সম্পর্কে ওঁরা ওয়াকবহাল ছিলেন না এবং পরিবর্তনের ঢেউ আসার বহু পরে জানতে পারেন যে পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেমন বোখরচা ও তিলি কাজের কদর যখন সুরু হয়েছিল তখন থেকে চেষ্টা করলে বা একটু তৎপর হলে স্থানীয় কারুকৃৎ নিশ্চিতভাবে তা আয়ত্ত করতে পারতেন। ল্যাটিস কাজ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। অথচ ঐ দুটি কাজে বর্তমানে পাঞ্জাবী ও চীনা কারুকৃৎ একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করছেন। কামানগিরি ও সাদেলী কাজে বাঙালী কারুকৃৎ কখনো তেমন উৎসাহ দেখান নি কাজেই ঐ ব্যাপারে বাইরের শিল্পীরা কলকাতায় এসে কাজ করেছেন এবং করছেন।

শহর কলকাতার সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও বিবিধ কারুশিল্প

গড়ে ওঠার পর থেকে কলকাতার বিবর্ধনে ইংরেজ, ইহুদী, চীনা আর্মেনিয়ানের সঙ্গেসঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষের অবদান তুচ্ছ করা যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রধান লক্ষণীয়, গ্রামসংস্কৃতির মতো করে বহিরাগতরা মিলেমিশে একটি সাংস্কৃতিক চক্রে পরিণত হয়ে যায়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে ক্রমে ভিন্ন রাজ্যের মানুষ অধিকসংখ্যায় কলকাতায় এসেছেন এবং পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক চক্র গড়ে তুলেছেন। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক চক্রের পরিমণ্ডলে দেশীয় কারুশিল্পী সবসময় নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারেননি এবং মাঝে মাঝেই মাটির টানে গ্রামে ফিরে গেছেন। কলকাতাও সেই অবস্থায় বঙ্গ সাংস্কৃতিক চক্রের প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত থেকেছে এবং ক্রমে কলকাতার কারুকর্মে সর্বভারতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ছাপ এসেছে।

ধাতুপাত্রের ওপর ভিন্নধাতুর কাজ যা সাধারণত কোফৎগারী কাজ নামে পরিচিত সেই কাজে কলুটোলার খ্যাতি বহুদিনের। এখনো ইমান নামের বয়োবৃদ্ধ কারুকৃৎ সর্বভারতীয় যশ নিয়ে এই কাজ করে চলেছেন। সাঁই খয়ানার কয়েকজন শিল্পী বড়তলা অঞ্চলে পাতের শিল্পে লাসাই ও

ইয়ারকানী শৈলীর যে কাজ করেন তারও আন্তর্জাতিক বাজারে যথেষ্ট কদর আছে। ফিলিগ্রির কিছু ঝানু কারিগর এঁদের সঙ্গে আছেন যাঁরা নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের কাজের অনুকরণ করে সর্বভারতীয় এবং কখনো কখনো আন্তর্জাতিক বাজার পেয়েছেন।

কলুটোলায় হাতির দাঁতের পাত, রূপোর পাত এবং বিবিধ নকশা আঁঠা দিয়ে বসানোর যে গৃহশিল্প গড়ে উঠেছে তাকে সাদেলী শিল্প বলে। এই মাধ্যমটির সঙ্গে বাঙালী কারুকৃতের সরাসরি কোন সংযোগ না থাকলেও প্রায় শতাধিক বছর ধরে শিল্পটি কলকাতায় রয়েছে এবং বহু শিল্পীর উদরান্নের একৈব অবলম্বন।

সূচীশিল্পের কেন্দ্র কলকাতার সর্বত্র থাকলেও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের আম্লি শিল্পীর ফুলকারি, চিকনী এবং হেরিং কাজ বিশ্বের বহু অংশে প্রবল চাহিদা সৃষ্টি করেছে।

কসমোপলিটান কলকাতা

সাতগাঁর সেই বসাক ও শেঠেরা কাপড়ের হাট বসিয়ে প্রথমে পর্তুগীজ এবং পরে ইংরেজদের জন্য তৈরি হয়েই ছিল। চার্ন্‌ক ১৬৯৮ তে সুতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম তখনকার জমিদারদের কাছ থেকে ১৩০০ টাকায় কিনেছিলেন। ক্রমে কলকাতা বড়ো হয়েছে। ১৭১৭ এর কাছাকাছি কোন সময়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করা হল। গোবিন্দপুর এবং চৌরঙ্গীর বসবাসকারীরা অন্যত্র সরে গেলেন। মাঝের কলকাতা সম্পূর্ণ ভিনদেশীদের কবলিত হল। ১৬৯০তে চার্নক ঘোষণা করেছিলেন 'ইংরেজ টাউন'-এর বাইরে যে যতো খুশি জমি নিয়ে বাড়ি তুলতে পারেন। এর ফলে আকৃতি-প্রকৃতিতে কলকাতার চেহারার আর কোন চরিত্র রইলনা। ১৯১১তে এসে শহরের এই কিম্ভুত চেহারা পরিবর্তনের জন্য সি. আই. টি. প্রতিষ্ঠিত হল। গ্রামীণ কারুকর্মী শহরের এই উন্নয়নের ধাপে ধাপে উদ্বৃত্ত ঘোষিত হতে লাগল। কলকাতার কসমোপলিটান চরিত্র প্রকট হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রাগাধুনিক যাবতীয় শুদ্ধ কারুশিল্প চিরকালের জন্য নির্বাসিত হল, এল নতুন সংমিশ্রণের পালা। কেবল সগৌরব অস্তিত্ব রইল সেই শিল্পের—আধুনিক যন্ত্রকৌশল যেখানে কোন ভাবেই কার্যকর নয়।